শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সরস গল্প

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—দাম চার টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
প্রভু প্রেস ৩০ কর্নওআলিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

সূচী

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা কথাসাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। সাধারণ গতানুগতিক পথে তিনি চলেননি—কতকগুলি বিশেষ পথ বেছে নিয়েছিলেন বলে তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যরসিক সমালোচকরাও তাঁকে সেদিন জয়মাল্য পরাতে ইতস্তত করেননি। ঐতি-হাসিক গল্প বঙ্কিম-যুগের পর প্রায় যখন সেকেলে বলে গণ্য হচ্ছিল এবং গোয়েন্দাকাহিনীকে লোকে ইতরসাধারণের পাঠ্য বলে একটু অনুকম্পার চোখে দেখতে শুরু করেছিল, তখন সাহিত্যরচনার এই দুটি পদ্ধতিকেই বেছে নিয়ে তিনি তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন। এতদ্দ্বারা এ-ও প্রমাণ করে দিলেন যে, লেখকের যথার্থ শক্তি থাকলে এবং নূতন আঙ্গিকে অধিকার থাকলে যে-কোনো বিষয়বস্তু নিয়েই সৎসাহিত্য রচিত হতে পারে।

শরদিন্দুবাবুর রচনার আর একটি বিশিষ্ট দিক হল হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকরসের দিক। বাংলাদেশে অল্প যে-ক'জন শক্তিমান্ ও কীর্তিমান্ লেখক সাহিত্যের এই দিকটি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। এ দিকেও তাঁর প্রতিভা অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং তাঁর মত লেখকের প্রতিভার সব দিকের নমুনা কোনো একটি শ্রেষ্ঠগল্প-সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে দেওয়া যায় না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সেইজন্যই তাঁর সরস গল্পের একটি বিশেষ সঙ্কলন প্রকাশ করে পাঠকদের উপহার দেবার চেষ্টা করেছি এই বইটিতে। সে চেষ্টা কতদূর সার্থক হয়েছে তা পাঠকেরাই বিচার করবেন। ইতি।

কর্তার কীর্তি

বর্ধমান জেলার ধনী ও বনিয়াদী জমিদার বাবু হৃষীকেশ রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমন্তকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কারণ, সে তাঁহার মনোনীতা পাত্রীকে উপেক্ষা করিয়া একটি আই-এ পাস করা মেয়েকে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল।

ভয় নাই, ইহা পিতৃরোষপীড়িত হেমন্তের দুর্দশায় করুণ কাহিনী নয়। হেমন্তকে শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই। বিবাহের পূর্বেই সে কলিকাতার একটা বড় কলেজে অধ্যাপনার কাজ পাইয়াছিল; তাহা ছাড়া পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া ও ঘরে বসিয়া শিক্ষকতা করিয়াও যথেষ্ট উপার্জন করিত। সুতরাং পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেও, অর্থের দিক দিয়া অন্তত তাহার কোন ক্লেশ হয় নাই।

হৃষীকেশবাবুর মতো বদরাগী অগ্নিশর্মা লোক আজকালকার দিনে বড়-একটা দেখা যায় না। পুরাকালে বদ্-মেজাজী বলিয়া দুর্বাসা মুনির একটা অপবাদ ছিল বটে, কিন্তু তিনিও অকারণে কাহাকেও অভিসম্পাত দিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। হৃষীকেশবাবুর কারণ-অকারণের বালাই ছিল না, তিনি সর্বদাই চটিয়া থাকিতেন। শুনা যায়, সতের বৎসর বয়সে তাঁহার একবার টাইফয়েড হয়, সারিয়া উঠিয়া তিনি তেঁতুলের অম্বল দিয়া ভাত খাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ডাক্তারের আদেশে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, ফলে সেই যে তিনি চটিয়া গিয়াছিলেন সে রাগ তাঁহার এখনও পড়ে নাই। একাদিক্রমে এত বৎসর রাগিয়া থাকার ফলে তাঁহার গোঁপ সমস্ত পাকিয়া গিয়াছিল এবং মাথার সম্মুখ দিকে চুল উঠিয়া পরিষ্কার ও চিক্কণ হইয়া গিয়াছিল। চক্ষু দুটি সর্বদাই কষায়িত হইয়া থাকিত।

রাগের মাত্রা বাড়িয়া গেলে তিনি ঘরের আসবাব-পত্র ভাঙিতে আরম্ভ করিতেন। বাড়ির ভঙ্গপ্রবণ জিনিসগুলি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, এমন সময় একদিন দৈবক্রমে হাতের কাছে একটা কাচের গ্লাস পাইয়া প্রথমেই সেটা ভাঙিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ইন্দ্রজালের মতো কাজ হইল। কাচ ভাঙার শব্দে কর্তার অর্ধেক রাগ পড়িয়া গেল—সেদিন আর তিনি অন্য

কিছু ভাঙিলেন না। অতঃপর তাঁহার রাগের মাত্রা চড়িয়া গেলেই বাড়ির যে-কেহ একটা কাচের গেলাস তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিয়া সবেগে প্রস্থান করিত। তিনি সেটা মেঝেয় আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিতেন। এই অভিনব উপায়ে বাড়ির টেবিল, চেয়ার, আয়না, ঝাড় ইত্যাদি দামী আসবাব অনেকগুলি রক্ষা পাইয়াছিল।

দুই মাস অন্তর কলিকাতা হইতে এক গ্রোস করিয়া নূতন কাচের গেলাস আনানো হইত। তাহাতেই কোন রকমে কাজ চলিয়া যাইত।

রাগ যখন কম থাকিত, তখন তিনি তাঁহার খাস্‌বেয়ারা গয়ারামকে 'শূয়ারকা বাচ্চা' না বলিয়া স্রেফ্ 'হারামজাদা' বলিয়া ডাকিতেন। তখন বাহিরের গোমস্তা হইতে ভিতরে গৃহিণী পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন।

দুই বৎসর পূর্বে হেমন্ত যখন জানাইল যে, সে পিতৃনির্বাচিতা কলাবতী নাম্নী একাদশবর্ষীয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিবে না, পরন্তু বেথুন কলেজের একটি অষ্টাদশী মাতৃহীনা কুমারীকে বধূরূপে মনোনীত করিয়াছে তখন কর্তা দ্রুতপরম্পরায় তেইশটা গেলাস ভাঙিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন ক্রোধ প্রশমিত হইল না, তখন তিনি হেমন্তর ঘরে ঢুকিয়া একখানা ছয় ফুট লম্বা ভিনিসীয় আয়না পদাঘাতে ভাঙিয়া ফেলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশপূর্বক ঘোর গর্জনে কহিলেন, "বেরিয়ে যা এখনি আমার বাড়ি থেকে, এক কাপড়ে বেরিয়ে যা! তোর মতো শূয়ারের মুখ দেখতে চাই না।"—বলিয়া হ্রেষাধ্বনির মতো একটা শব্দ করিলেন।

হেমন্ত সেই যে এক কাপড়ে বাহির হইয়া গেল, তাহার পর আজ পর্যন্ত পিতৃভবনে পদার্পণ করে নাই।

হেমন্তর বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়াই ছিল,—তাহার মাসির বাড়ি হইতে বিবাহ হইবে। বিবাহের দিন-দুই পূর্বে গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে কর্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি কালীঘাট যাব—মানত আছে। শিশিরের সঙ্গে আমায় পাঠিয়ে দাও।"

রাগী হইলেও হৃষীকেশবাবু অত্যন্ত কূটবুদ্ধি; গৃহিণীর আর্জি শুনিয়া তিনি হ্রেষাধ্বনিবৎ শব্দ করিলেন, কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "মানত আছে, শিশিরের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও! চালাকি? আচ্ছা আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি কেমন কালীঘাটের মানত!—গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল?"

গৃহিণী চক্ষে অঞ্চল দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। গয়া দ্বারের বাহিরে এক গেলাস সরবৎ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরে ঢুকিয়া কর্তার হাতে দিতেই তিনি সেটা দেয়ালে মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন, স-গর্জনে বলিলেন, "ম্যানেজারকে ডাক্।"

ম্যানেজার আসিলে তাহাকে হুকুম দিলেন, "খিড়কি আর সদর দেউড়িতে চারটে করে খোট্টা দারোয়ান বসাও। বুড়ী না পালায়!—আর গয়া হারামজাদা তামাক দিয়ে যাক্।"

'হারামজাদা' শুনিয়া সকলে বুঝিল গৃহিণীর চক্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া কর্তা মনে মনে খুশি হইয়া উঠিয়াছেন।

গৃহিণীর কালীঘাটে পূজা দিতে যাওয়া হইল না। ওদিকে হেমন্তর বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার পর দুই বৎসর কাটিয়াছে। গৃহিণী বাড়ির মধ্যে কর্তার নজরবন্দি আছেন, একদিনের জন্যও কোথাও যাইতে পান নাই। এমন কি ভগ্নীপতির অতবড় অসুখেও তাঁহাকে বোনের বাড়ি যাইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু শিশিরকে বাড়ির মধ্যে অন্তরীণ রাখা শক্ত। সে কলেজে পড়ে, তাই বাধ্য হইয়া তাহাকে কলিকাতায় মাসির বাড়ি থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। যা হোক্, হৃষীকেশবাবু তাহাকে ডাকিয়া শাসাইয়া দিয়াছেন যে, কোনদিন যদি সে হেমন্তর বাড়িতে যায় কিংবা তাহার সহিত বাক্যালাপ করে তাহা হইলে তাহাকেও তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিয়া বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিবেন।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েকদিন হইতে বাড়ির মধ্যে ভিতরে ভিতরে কি-একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কর্তা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। গত শনিবার শিশির আসিয়াছিল, সে মার কানে ফুস্‌ফুস্ করিয়া কি বলিয়া গেল, সেই অবধি গৃহিণী অতিশয় চঞ্চল ও বিমনা হইয়া বেড়াইতেছেন। গৃহকর্মে তাঁহার মন নাই; একদিন ক্রন্দনরত অবস্থায় কর্তার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু বহু উৎপীড়ন ও তর্জন করিয়াও কর্তা ভিতরের কথা কিছুই বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সকল প্রশ্নই গৃহিণী উদাস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া সহ্য করিয়াছেন। তাহাতে আর কিছু না হোক্, বাড়িতে কাচের গেলাসের সংখ্যা ভয়ানক দ্রুত কমিয়া আসিতেছে।

একে তো এইরূপ অবস্থা, তাহার উপর আজ সকালে উঠিয়াই কর্তা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গিয়াছেন। হতভাগ্য সরকার সকালবেলা হুকুম

লইতে আসিয়া কর্তার সম্মুখেই হাঁচিয়া ফেলিয়াছিল। আর যায় কোথা? কর্তা একেবারে হুংকার দিয়া উঠিলেন, "বেয়াদব, উল্লুক কোথাকার! এত বড় আস্পর্ধা! গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল?"

সরকার তো প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু কর্তার সে রাগ সমস্ত দিনে পড়িল না। আজ কিনা সন্ধ্যার সময় আবার শিশির আসিল! নিজের বসিবার ঘর হইতে তাহার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কর্তা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিশির ঘরে ঢুকিতেই তিনি আরম্ভ করিলেন, "তুই হেমন্তর বাড়িতে যাস্? সত্যি কথা বল্ হতভাগা, নইলে আজ তোকে মেরেই খুন করব।"

কুড়ি বছরের ছেলে শিশির পিতার মুখের পানে হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিল, তাঁহার প্রশ্নের হাঁ-না কোন উত্তরই দিতে পারিল না।

হৃষীকেশবাবু তাঁহার কণ্ঠস্বর তারা গ্রামের ধৈবতে তুলিয়া বলিলেন, "কার হুকুমে তুই সেখানে গিয়েছিলি রে পাজি, নচ্ছার! কি বলেছিলাম তোকে আমি! আমার হুকুম হুকুম নয়, বটে?"

শিশির গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃষীকেশবাবু এক পদাঘাতে জ্বলন্ত কলিকাসুদ্ধ গড়গড়াটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কি করতে তুই গিয়েছিলি সেখানে, বল্ আমাকে! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! নিজের মার কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে কি বলেছিস? বল্ শীগগির হতভাগা, নইলে গাছে বেঁধে তোর গায়ে জলবিছুটি দেওয়াব।"

শিশির ভিতরে ভিতরে মরীয়া হইয়া উঠিল। সে দু-হাত শক্তভাবে মুঠি করিয়া বলিল, "আমি এখন থেকে দাদা-বৌদির কাছেই থাকব ঠিক করেছি। আর—আর মাকেও তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।"

হৃষীকেশবাবু একেবারে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, "কী, এতবড় আস্পর্ধা!"

শিশির গোঁ-ভরে বলিয়া চলিল, "আমাকে থাকতেই হবে,—বৌদির শরীর খারাপ, তাঁর—তাঁর—ছেলে হবে—"

হৃষীকেশ আবার চিৎকার করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। সংবাদটা পরিপাক করিতে মিনিটখানেক সময় লাগিল তারপর পুনশ্চ গর্জন ছাড়িলেন, "ছেলে হবে তো তোর কি রে শূয়ার?"

শিশির বলিল, "দাদা সমস্ত দিন বাড়ি থাকেন না, বৌদি একলা তাই আমাকে থাকতে হবে। আর মাকেও—"

"বেরোও! বেরোও! এই দণ্ডে আমার বাড়ি থেকে দূর হ—নইলে চাবকে লাল করে দেব। শূয়ার, পাজি, বোম্বেটে কোথাকার! যাবিনে? গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল, নিয়ে আয় আমার হাণ্টার—"

শিশির আর অপেক্ষা করিল না, যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। মার সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত করা হইল না।

সমস্ত রাত্রি হৃষীকেশ বাড়িময় দাপাইয়া বেড়াইলেন। সেদিন আর ভয়ে কেহ তাঁহার কাছে গেলাস লইয়াও অগ্রসর হইতে পারিল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় স্নানাহার করিয়া তিনি ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, "আমি কলকাতা যাচ্ছি, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব। তুমি সাবধানে থেকো—গিন্নী না পালায়। আর শিশির লক্ষ্মীছাড়া যদি বাড়ি ঢুকতে চায়, মেরে তাড়াবে।—গাড়ি যুততে বলো।"

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "মোটর-কোম্পানির এজেন্টকে আজ ডেকেছিলেন, সে এসেছে। তাকে—"

হৃষীকেশবাবু বলিলেন, "তাকে চুলোয় যেতে বলো। আমি কলকাতায় যাচ্ছি, নিজে দেখে মোটর কিনব। গাড়ি যুততে বলো।"—বলিয়া চেকবহি-খানা পকেটে পুরিলেন।

ম্যানেজার "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

গাড়িতে স্টেশনে যাইতে যাইতে হৃষীকেশ নিজের মনে গর্জিতে লাগিলেন, "কি আস্পর্ধা! আমার সঙ্গে চালাকি! দেখে নেব। আমার বৌ—আমার নাতি! আমি হৃষীকেশ রায়—দেখে নেব কে কি করতে পারে।"

বেলা প্রায় দেড়টার সময় একখানা ঝক্‌ঝকে নূতন ফিয়াট্ গাড়ি কলিকাতায় প্রোফেসার হেমন্ত রায়ের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ির আরোহী গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ছোট্ট সুদৃশ্য বাড়িখানি, চারি ধারে একটুখানি সংকীর্ণ ঘাসের বেষ্টনী; সামনে লোহার ফটক বন্ধ।

হ্রেষাধ্বনি করিয়া হৃষীকেশবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। ফটক খুলিয়া সম্মুখের বন্ধ দরজায় সজোরে কড়া নাড়িলেন। একটা ছোকরা গোছের চাকর দ্বার খুলিয়া সম্মুখে কষায়িত-নেত্র বৃদ্ধ ও তাঁহার পিছনে একখানি দামী নূতন মোটরকার দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই বাবু?"

লইতে আসিয়া কর্তার সম্মুখেই হাঁচিয়া ফেলিয়াছিল। আর যায় কোথা? কর্তা একেবারে হুংকার দিয়া উঠিলেন, "বেয়াদব, উল্লুক কোথাকার! এত বড় আস্পর্ধা! গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল?"

সরকার তো প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু কর্তার সে রাগ সমস্ত দিনে পড়িল না। আজ কিনা সন্ধ্যার সময় আবার শিশির আসিল! নিজের বসিবার ঘর হইতে তাহার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কর্তা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিশির ঘরে ঢুকিতেই তিনি আরম্ভ করিলেন, "তুই হেমন্তর বাড়িতে যাস্? সত্যি কথা বল্ হতভাগা, নইলে আজ তোকে মেরেই খুন করব।"

কুড়ি বছরের ছেলে শিশির পিতার মুখের পানে হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিল, তাঁহার প্রশ্নের হাঁ-না কোন উত্তরই দিতে পারিল না।

হৃষীকেশবাবু তাঁহার কণ্ঠস্বর তারা গ্রামের ধৈবতে তুলিয়া বলিলেন, "কার হুকুমে তুই সেখানে গিয়েছিলি রে পাজি, নচ্ছার! কি বলেছিলাম তোকে আমি! আমার হুকুম হুকুম নয়, বটে?"

শিশির গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃষীকেশবাবু এক পদাঘাতে জলন্ত কলিকাসুদ্ধ গড়গড়াটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কি করতে তুই গিয়েছিলি সেখানে, বল্ আমাকে! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! নিজের মার কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে কি বলেছিস? বল্ শীগগির হতভাগা, নইলে গাছে বেঁধে তোর গায়ে জলবিছুটি দেওয়াব।"

শিশির ভিতরে ভিতরে মরীয়া হইয়া উঠিল। সে দু-হাত শক্তভাবে মুঠি করিয়া বলিল, "আমি এখন থেকে দাদা-বৌদির কাছেই থাকব ঠিক করেছি। আর—আর মাকেও তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।"

হৃষীকেশবাবু একেবারে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, "কী, এতবড় আস্পর্ধা!"

শিশির গোঁ-ভরে বলিয়া চলিল, "আমাকে থাকতেই হবে,—বৌদির শরীর খারাপ, তাঁর—তাঁর—ছেলে হবে—"

হৃষীকেশ আবার চিৎকার করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। সংবাদটা পরিপাক করিতে মিনিটখানেক সময় লাগিল, তারপর পুনশ্চ গর্জন ছাড়িলেন, "ছেলে হবে তো তোর কি রে শূয়ার?"

শিশির বলিল, "দাদা সমস্ত দিন বাড়ি থাকেন না, বৌদি একলা, তাই আমাকে থাকতে হবে। আর মাকেও—"

"বেরোও! বেরোও! এই দণ্ডে আমার বাড়ি থেকে দূর হ—নইলে চাবকে দাল করে দেব। শূয়ার, পাজি, বোম্বেটে কোথাকার! যাবিনে? গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল, নিয়ে আয় আমার হাণ্টার—"

শিশির আর অপেক্ষা করিল না, যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। মার সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত করা হইল না।

সমস্ত রাত্রি হৃষীকেশ বাড়িময় দাপাইয়া বেড়াইলেন। সেদিন আর ভয়ে কেহ তাঁহার কাছে গেলাস লইয়াও অগ্রসর হইতে পারিল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় স্নানাহার করিয়া তিনি ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, "আমি কলকাতা যাচ্ছি, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব। তুমি সাবধানে থেকো—গিন্নী না পালায়। আর শিশির লক্ষ্মীছাড়া যদি বাড়ি ঢুকতে চায়, মেরে তাড়াবে।—গাড়ি যুততে বলো।"

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "মোটর-কোম্পানির এজেণ্টকে আজ ডেকেছিলেন, সে এসেছে। তাকে—"

হৃষীকেশবাবু বলিলেন, "তাকে চুলোয় যেতে বলো। আমি কলকাতায় যাচ্ছি, নিজে দেখে মোটর কিনব। গাড়ি যুততে বলো।"—বলিয়া চেকবহি-খানা পকেটে পুরিলেন।

ম্যানেজার "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

গাড়িতে স্টেশনে যাইতে যাইতে হৃষীকেশ নিজের মনে গর্জিতে লাগিলেন, "কি আস্পর্ধা! আমার সঙ্গে চালাকি! দেখে নেব। আমার বৌ—আমার নাতি! আমি হৃষীকেশ রায়—দেখে নেব কে কি করতে পারে।"

বেলা প্রায় দেড়টার সময় একখানা ঝকঝকে নূতন ফিয়াট্ গাড়ি কলিকাতায় প্রোফেসার হেমন্ত রায়ের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ির আরোহী গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ছোট্ট সুদৃশ্য বাড়িখানি, চারি ধারে একটুখানি সংকীর্ণ ঘাসের বেষ্টনী; সামনে লোহার ফটক বন্ধ।

হ্রেষাধ্বনি করিয়া হৃষীকেশবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। ফটক খুলিয়া সম্মুখের বন্ধ দরজায় সজোরে কড়া নাড়িলেন। একটা ছোকরা গোছের চাকর দ্বার খুলিয়া সম্মুখে কষায়িত-নেত্র বৃদ্ধ ও তাঁহার পিছনে একখানি দামী নূতন মোটরকার দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই বাবু?"

হৃষীকেশবাবু উত্তর না দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চাকরটা বলিল, "বাবু বাড়ি নেই, কলেজে গেছেন। তাঁর ফিরতে দেরি আছে।"

হৃষীকেশ কর্ণপাত না করিয়া ভিতরের দিকে চলিলেন। চাকরটা এই অদ্ভুত বৃদ্ধের আচরণ দেখিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের পথ আগলাইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "ওদিকে কোথায় চলেছেন? ওটা অন্দরমহল। বাবু বাড়ি নেই, এ-সময় আপনি কি চান? আপনার নাম কি?"

হৃষীকেশ শুধু একটি হ্রেষাধ্বনি করিয়া চাকরটার কর্ণধারণপূর্বক এক ধারে সরাইয়া দিলেন। তারপর সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া গট্ গট্ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

উপরের একটা ঘরে তখন মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রতিমা ভেল্‌ভেটের জুতার কাপড়ে রেশমের ফুল তুলিতেছিল। কৃশাঙ্গী সুন্দরী, বুদ্ধির বিভায় মুখখানি জ্বলজ্বল, চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো, নূতন সৌভাগ্যের কোন লক্ষণই এখনও দেহে প্রকাশ পায় নাই; তাহাকে দেখিলেই মন খুশি হইয়া উঠে। তাহার হাঁটুর কাছে মাথা রাখিয়া শিশির কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া লম্বা ভাবে শুইয়া ছিল। গতকল্য বাবার সহিত যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বৌদিদিকে বলা যাইতে পারে কি না, সে মনে মনে তাহাই গবেষণা করিতেছিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—না, বলিয়া কাজ নাই। বৌদিদি দুঃখ পাইবেন মাত্র, আর কোন ফল হইবে না। দাদাকে চুপি চুপি এক সময় বলিলেই হইবে।

বৌদিদির সন্তান-সম্ভাবনার কথা গত সপ্তাহে দাদার মুখে শুনিয়া শিশির আপনা হইতে ছুটিয়া মার কাছে গিয়াছিল। মাও শুনিয়া আনন্দে ও আশঙ্কায় অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কর্তার রোষ-বহ্নি ডিঙাইয়া কিছু করিতে সাহস করেন নাই। গতকল্য শিশির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আবার বাড়ি গিয়াছিল—যেমন করিয়াই হউক মাকে লইয়া আসিবে। তারপরেই সেই বিভ্রাট! মার সঙ্গে শিশির দেখা পর্যন্ত করিতে পাইল না।

এই কথাটাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে শিশির বলিল, "আচ্ছা বৌদি, মা যদি এখন কোন রকমে হঠাৎ এসে পড়েন?"

সম্মুখের দেয়ালে শ্বশুর ও শাশুড়ীর এন্‌লার্জ্‌ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল। সেই দিকে চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ শাশুড়ীর ছবির দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতিমা বলিল, "তা যদি হত, ঠাকুরপো—"

শিশির সহসা কনুইয়ে ভর দিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, মাকে যদি চুরি করে নিয়ে আসি—বাবা কিছু টের না পান ?"

জিভ কাটিয়া প্রতিমা বলিল, "বাপ রে! তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে ? বাবা তাহলে কাউকে আস্ত রাখবেন না।"

বস্তুত, চোখে না দেখিলেও শ্বশুরের মেজাজ সম্বন্ধে কোন কথাই প্রতিমার অজ্ঞাত ছিল না। তাহাকে বিবাহ করার ফলেই যে স্বামীর সহিত শ্বশুরের এমন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহা সে বিবাহের সময় হইতেই জানে। হেমন্ত অবশ্য কোনদিন এ-সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথা বলে নাই, কিন্তু শ্বশুরঘরের জন্য সর্বদাই প্রতিমার প্রাণ কাঁদিতে থাকিত। রাগী হউন, কিন্তু শ্বশুর যে কখনই মন্দ লোক নহেন ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরে বঞ্চিত হইয়া এই মেয়েটি যে মনের মধ্যে কতখানি বেদনা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামীও কোনদিন জানিতে পারে নাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলিয়া সে ও-ভাব কখনও ইঙ্গিতেও প্রকাশ করে নাই, পাছে স্বামী উদ্বিগ্ন হন।

শিশির আবার কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া শুইয়া ছিল, প্রতিমা ছলছল চক্ষে বলিল, "আমার ভাগ্যে সে কি আর হবে, ঠাকুরপো ? বাবা-মাকে আমি এজন্মে চোখে দেখতে পাব না।"—বলিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

এমন সময় নিচে হ্রেষাধ্বনির মতো শব্দ শুনিয়া শিশির তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। এ শব্দ তো ভুল হইবার নয়! সে প্রতিমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "বাবা! বাবা এসেছেন!"—বলিয়াই এক লাফে পাশের ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

প্রতিমার মুখ সাদা হইয়া গেল, বুক ঢিবঢিব করিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় আঁচল টানিয়া দিতেই হৃষীকেশবাবু ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম শ্রীহৃষীকেশ রায়। আমি বর্ধমান থেকে আসছি।"—বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন।

এইখানে প্রতিমা একটু অভিনয় করিল। মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা জোর করিয়া চাপিয়া সে সচকিতে ফিরিয়া মুখের ঘোমটা সরাইয়া দিল। বিস্ময়-আনন্দ-ভক্তি-লজ্জা-মিশ্রিত চক্ষে হৃষীকেশবাবুর মুখের দিকে এক মুহূর্তে

চাহিয়া থাকিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—"বাবা!" তারপর গলায় আঁচল দিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

অগ্ন্যুদ্গারী ভিস্থভিয়াসের মাথার উপর উত্তর-মেরুর সমস্ত বরফ চাপাইয়া দিলে কি ফল হয় বলিতে পারি না, হৃষীকেশবাবুরও মুখের কোন ভাব-পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি ক্ষীণভাবে একটু হ্রেষাধ্বনি করিয়া বলিলেন, "তুমিই আমার পুত্রবধূ? তোমার নাম কি?"

"আমার নাম প্রতিমা"—বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছেই বসিয়া পড়িল। এইটুকু অভিনয় করিয়াই তাহার উরু দুটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

হৃষীকেশবাবু চাহিয়া দেখিলেন—হুঁ, নাম সার্থক বটে। বধূর মুখ দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। শুনিয়াছিলেন বধূ আই-এ পাস, কিন্তু কৈ তাহার আচরণে বিদ্যাভিমানের কোন চিহ্নই তো নাই। তিনি এক দর্পিতা তীক্ষ্ণভাষিণী যুবতী মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি? হৃষীকেশবাবু মনে মনে একবার হ্রেষাধ্বনি করিলেন, কিন্তু তাহা পুত্রদের উদ্দেশে। হতভাগারা তাঁহাকে বলে নাই কেন!

প্রতিমা শ্বশুরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি বড্ড ঘেমেছেন, জামাটা খুলে ফেললে হত না, বাবা?"

হাতপাখা আনিয়া সে বাতাস করিবার উপক্রম করিতেই হৃষীকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "থাক্ থাক্, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না, মা। আমি নিজেই বাতাস খাচ্ছি।"—বলিয়া ফেলিয়া হৃষীকেশবাবু একেবার স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ ধরনের কথা গত তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মুখ দিয়া একবারও বাহির হয় নাই।

পাশের ঘরের দরজায় কান লাগাইয়া শিশির নিস্পন্দ বক্ষে এতক্ষণ শুনিতেছিল; এবার সে পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গিয়া দেয়ালে-টাঙানো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল।

হৃষীকেশবাবু গায়ের জামা খুলিয়া মাদুরের উপর বসিলেন, পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে শয়তানটা ফিরবে কখন? তোমাকে বুঝি এই রকম একলা ফেলে রেখে যায়?"

চোখের জল ও মুখের হাসি একসঙ্গে নিরুদ্ধ করিয়া প্রতিমা নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

হৃষীকেশবাবু গলা এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "স্টুপিড, বদমায়েস সব।

শিশিরটাকেও বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছি। এমন বৌ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল! আজই আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, দেখি কোন্ ব্যাটা কি করতে পারে।”

শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিমা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, ঝর্ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হৃষীকেশবাবু তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া নিজের থানের খুঁট দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া সগর্জনে কহিলেন, “কেঁদো না। আমি ঐই হেমন্তটাকে দেখে নেব। সব ঐ ছোঁড়ার শয়তানি—আমি বুঝেছি। গিন্নীও এর মধ্যে আছেন। আমাকে এতদিন বলেনি কেন? ষড়যন্ত্র! যত সব চোর-বোম্বেটের দল, নইলে এই বৌকে আমি দু-বচ্ছর বাইরে ফেলে রাখি?”

প্রতিমা শ্বশুরের কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, “বাবা, আমাকে বাড়িতে মার কাছে নিয়ে চলুন।”

“যাবই তো। এখুনি নিয়ে যাব। আমি হৃষীকেশ রায়, আমি কি কারু তোয়াক্কা রাখি?” জামাটা গায়ে দিতে দিতে পুনরায় বলিলেন, “তোমায় নিয়ে যাব বলে নতুন মোটর কিনে নিয়ে একেবারে এসেছি। ট্রেনে তো আর তোমার যাওয়া হতে পারে না।”

হৃষীকেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমা থতমত ভাবে একবার ঢোক গিলিয়া বলিল, “এক্ষুনি? কিন্তু বাবা—”

হৃষীকেশবাবু চড়া স্বরে বলিলেন, “কিন্তু কি? সেই রাস্কেলটার অনুমতি নিয়ে তবে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে? (হ্রেষাধ্বনি করিলেন) আমি এই তোমাকে নিয়ে চললাম, ওদের যদি ক্ষমতা থাকে মোকদ্দমা করুক গিয়ে।”

প্রতিমা আর দ্বিরুক্তি করিল না, যেমন ছিল তেমনি বেশে শ্বশুরের সঙ্গে নামিয়া চলিল।

সদর দরজা পর্যন্ত গিয়া হৃষীকেশবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উদ্বিগ্ন-ভাবে পুত্রবধূর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “কিন্তু শুনেছিলাম—ঐ শিশির হতভাগা বলছিল যে, তুমি নাকি—তোমার নাকি—? কোন ভয়ের কারণ নেই তো মা? মোটরে প্রায় ষাট মাইল যেতে হবে। যদি কষ্ট হয়—যদি কোন রকম—”

আরক্ত মুখ কোনমতে ঘোমটায় ঢাকিয়া প্রতিমা তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়া উঠিল।

তিনটার সময় হেমন্ত বাড়ি ফিরিতেই শিশির ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দাদা! বাবা এসেছিলেন, বৌদিকে বাড়ি নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আমাদের ক্ষমতা থাকে তো যেন মোকদ্দমা করি!"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ভাইয়ের কাছে সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া হেমন্ত স্মিতমুখে বলিল, "সব তো তুই-ই করলি। এখন আমি কি করব উপদেশ দে।"

অতঃপর দুই ভায়ে আধঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ করিয়া বিকাল পাঁচটার গাড়িতে বর্ধমান রওনা হইল।

রাত্রি আটটার সময় বৌমার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিয়া কর্তা দেখিলেন দুই ভাই হেমন্ত ও শিশির মায়ের ঘরের মেঝেয় আহারে বসিয়াছে। গৃহিণী সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেছেন এবং নববধূ একখানা রেকাবি হস্তে মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। হৃষীকেশবাবু ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "এ দুটোকে কে বাড়ি ঢুকতে দিলে? নিশ্চয় খিড়কি দিয়ে ঢুকেছে! হুঁ—আস্পর্ধা! এখনি ওদের বেরিয়ে যেতে বলো।"

হেমন্ত ও শিশির কথা কহিল না, হেঁটমুখে আহার করিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "কেন যাবে?—যাবে না। আর যায় যদি, বৌমাকে নিয়ে যাবে। আমিও যাব। দেখি তুমি কি করে আটকাও!"

হৃষীকেশবাবু কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "হুঁ! ভারি আস্পর্ধা হয়েছে। আচ্ছা, এখন কিছু বলছি না, বৌমার শরীর খারাপ, কিন্তু এর পরে—। বৌমা, তুমি শোও গে যাও, হতভাগাদের আর পরিবেষণ করতে হবে না।" বলিয়া মধ্যম রকমের একটা হ্রেষাধ্বনি করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানা হইতে কর্তার গলা শুনা গেল, "গয়া হতভাগা কোথায় গেল, তামাক দিয়ে যাক্।"

গয়ারামের এতবড় সৌভাগ্য জীবনে কখনও হয় নাই। সে নববধূ ঠাকুরাণীর পায়ের কাছে ঢিব করিয়া একটা গড় করিয়া বাহিরে ছুটিল।

হেমন্ত ও শিশির মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া ভাঙা গলায় বলিলেন, "যাও বৌমা, তোমার শ্বশুর হুকুম দিয়ে গেলেন, আজকের মতো শুয়ে পড়োগে মা, কাল ওঁদের পরিবেষণ করে খাইও।"

তিমিঙ্গিল

তিমি মৎস্যই যে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব, এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা একমত। আমি কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বলিতে পারি যে, তিমিঙ্গিল নামধারী আর একটি অতি বৃহদায়তন জীব আছে যাহারা তিমি মৎস্যকে গিলিয়া খায়। বিশ্বাস না হয়, অভিধান দেখুন।

অপিচ, তিমিঙ্গিল যদি থাকিতে পারে, তবে তিমিঙ্গিল-গিল (যাহারা তিমিঙ্গিলকে গিলিয়া খায়) থাকিবে না কেন? এবং তিমিঙ্গিল-গিল থাকা যদি সম্ভবপর হয় তবে তিমিঙ্গিল-গিল-গিল থাকিতেই বা বাধা কি?

এইভাবে প্রশ্নটাকে অনন্তের পথে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অনর্থক কতকগুলা গিল-গিল-গিল বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনই লাভ হইবে না। আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, জগতে সর্বত্রই বৃহৎকে বৃহত্তর গ্রাস করিয়া থাকে। অর্থাৎ—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত গুপ্ত মহাশয় বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। রাত্রি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিট সময়ে তিনি হঠাৎ তড়াক্ করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ঘরে আর কেহ থাকিলে মনে করিত, নিশিকান্তবাবু বুঝি বৈদ্যুতিক 'শক্' খাইয়াছেন। হইয়াছিলও তাই। তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চল্লিশ হাজার ভোল্টের প্রচণ্ড একটি আইডীয়া খেলিয়া গিয়াছিল।

নিশিকান্তবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দালাল; ব্যবসা-সম্পর্কীয় সকল বিদ্যার হুনরী। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ক্রয়-বিক্রয় তেজী-মন্দা বাজার-জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সমকক্ষ কলিকাতা শহরে বড় কেহ ছিল না। এই সূক্ষ্ম বাজার-জ্ঞানের ফলে গত পঁচিশ বৎসরে তিনি কত লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কেহ জানিত না। যাহারা কর্নওআলিস স্ট্রীটে তাঁহার চমৎকার সুসজ্জিত দোতালা বাড়িখানা দেখিত, তাহারা সহিংসভাবে অনুমান করিত মাত্র।

কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাজারের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, নিশিকান্ত বাবুর চিত্তে সুখ নাই। কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ আছে। কারণ কাজ করিতে গেলেও লাভের মাত্রা এত কম হস্তগত হয় যে খরচা পোষায় না। ব্যবসার জগৎটা যেন ধীরে ধীরে প্রলয়পয়োধিজলে ডুবিয়া যাইতেছে।

নিশিকান্তবাবুর অবশ্য অর্থোপার্জনের কোনও প্রয়োজন নাই; ব্যাঙ্ক হইতে ছয় মাস অন্তর যে সুদ বাহির করেন তাহাতে তাঁহার পাঁচটা হাতী পুষিলেও ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হয় না। কিন্তু নিশিকান্ত কর্মী পুরুষ, অর্থোপার্জনের নেশা তিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অভ্যাস করিয়াছেন। তাই, আফিমের মৌতাতের মত উপার্জনের মোহই তাঁহাকে বেশি করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। অথচ দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান মন্দার বাজারে উপার্জন একেবারেই নাই।

নিশিকান্ত জগদ্ব্যাপী অবসাদের মধ্যে কোথাও একটু আশার আলো দেখিতে পাইতেছিলেন না, এমন সময়ে রাত্রি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিটে তাঁহার মাথায় চল্লিশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

আলোক-বিভ্রান্তের মত নিশিকান্ত কিছুক্ষণ বিছানায় জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল,—মোমবাতি! হ্যারিকেন লণ্ঠন!!

হাত বাড়াইয়া তিনি বেড্-সুইচ্ টিপিলেন; রক্তবর্ণ নৈশ দীপ মাথার উপর জ্বলিয়া উঠিল। নিশিকান্ত প্রায় দশ মিনিট মুগ্ধ তন্ময় ভাবে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

বালিশের পাশে তাঁহার নোটবুক ও পেন্সিল থাকিত। নিশিকান্ত বুকের তলায় বালিশ নিয়া উপুড় হইয়া শুইলেন, তারপর নোটবুকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। নোটবুকের অবোধ্য ইঙ্গিতে তাঁহার ব্যবসা-সংক্রান্ত যাবতীয় গুপ্ত কথা লেখা ছিল, তিনি সেইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন। প্রথমে হিসাব করিলেন, কত টাকা তিনি ইচ্ছা করিলেই ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্থান হইতে বাহির করিতে পারেন। হিসাব বোধ করি বেশ মনোমত হইল, কারণ তিনি পরিতোষের নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর তিনি নোটবুকের পাতায় পেন্সিল দিয়া আর এক-জাতীয় অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় এটা খরচের হিসাব। সমস্ত যোগ করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকার কিছু বেশি হইল। নিশিকান্ত খাতা হইতে মুখ তুলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন, তারপর নোটবহি বন্ধ করিয়া বালিশের পাশে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুণ্ডিত মুখে দশ হাজার দীপশক্তির যে হাসিটি ফুটিয়া উঠিল তাহার কাছে রক্তবর্ণ নৈশ দীপের প্রভা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

তিনি মনে মনে বলিলেন,—'তিন দিনে বাহাত্তর হাজার টাকা! মানে—রোজ চব্বিশ হাজার।'

নিশিকান্তবাবুর স্ত্রী পাশের ঘরে শয়ন করিতেন, মাঝের দরজায় পর্দার ব্যবধান। নিশিকান্তবাবুর দ্বিতীয় পক্ষ—তবে ভার্যাটি নেহাৎ তরুণী নয়, বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। তিনি অত্যন্ত সৌখিন এবং বন্ধ্যা, এই জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ। প্রায়ই মাসিক পত্রিকায় কবিতা লেখেন।

নিশিকান্তবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, পর্দার নিচে দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। বুঝিলেন, গৃহিণী এখনও মাসিক পত্র শেষ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হ্যাঁগা, জেগে আছ?'

পাশের ঘর হইতে হ্যাঁগা উত্তর দিলেন,—'হুঁ।'

আলুথালু বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া নিশিকান্ত স্ত্রীর ঘরে গেলেন। স্ত্রী পিঠে বালিশ দিয়া অর্ধশয়ান অবস্থায় শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া ছিলেন, মাথার শিয়রে একটা ত্রিপদের শীর্ষে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। স্ত্রী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া নিশিকান্তবাবুর চেহারা দেখিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিলেন।

নিশিকান্ত আলোর নিকটে গিয়া সুইচ টিপিয়া আলো নিভাইয়া দিলেন, আবার জ্বালিলেন, আবার নিভাইয়া দিলেন।

বিরক্তভাবে গৃহিণী বলিলেন,—'ও কি হচ্ছে?'

নিশিকান্ত বলিলেন,—'বেশ—না? এই ইলেকট্রিক বাতি। সুইচ টিপলেই নিবে যায় আবার সুইচ টিপলেই জ্বলে ওঠে।'

স্ত্রী ধমক দিয়া বলিলেন,—'এত রাত্রে হল কি তোমার?'

নিশিকান্ত স্ত্রীর শয্যার এক পাশে আসিয়া বসিলেন; একটু যেন অন্যমনস্ক-ভাবে বলিলেন,—'আমি ভাবছি একটা ছাপাখানা করতে কত খরচ লাগে।'

স্ত্রীর হাত হইতে মাসিক পত্র পড়িয়া গেল। তিনি সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। বহুদিন হইতে তাঁহার বাসনা নিজের ছাপাখানা করিয়া একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন; মাসিক পত্রে কেবল কবিতা ছাপা হইবে। পত্রিকার নাম হইবে—'মন-কুসুম'—সম্পাদিকা হইবেন স্বয়ং শ্রীমাধুরী দেবী।

স্বামীকে এই সুন্দর পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। কবিতার মাসিক পত্র কিরূপ চলিবে সে-বিষয়ে নিশিকান্তবাবুর মনে কোনও মোহ ছিল না। অথচ স্ত্রীর একটা সখ মিটাইবার ইচ্ছা তাঁহার যে একেবারেই ছিল না তাহা নয়। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া নিশিকান্ত গা করেন নাই।

মাধুরী দেবী এক নিশ্বাসে বলিলেন,—'সত্যি কিনবে?—আমার কতদিনের যে সখ! 'মন-কুসুম'—কেমন নামটি হবে বল ত? নিচে লেখা থাকবে—

সম্পাদিকা শ্রীমাধুরী দেবী! খরচ এমন কিছু নয়; সেদিন নীলকান্ত-প্রেসের মালিক আমার কাছে এসেছিল। তারা প্রেস বিক্রি করতে চায়, কোথা থেকে শুনেছে আমি কিনতে পারি। খুব বড় প্রেস—ইংরেজী বাংলা সব আছে; নতুন দাম সাতাশ হাজার টাকা। বলছিল আঠার হাজার পেলেই বিক্রি করবে। তা—কষাঁমাজা করলে হয়ত কিছু কমেও দিতে পারে।'

নিশিকান্ত ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'খবর নিও যদি বারো হাজারে ছাড়ে তো নিতে পারি।'

মাধুরী দেবী বলিলেন,—'অত কমে দেবে কি? আচ্ছা—'

নিশিকান্ত শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিলেন। মাধুরী দেবী তাঁহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলেন,—'এখনি শুতে চললে?'

নিশিকান্ত আলস্য ভাঙিয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ আর ছাখ, কাল দুই টিন ভাল কেরোঁসিন তেল আর গোটা দশেক হ্যারিকেন লণ্ঠন কিনে আনিও। আর পাঁচ বাণ্ডিল মোমবাতি।' বলিয়া নিগূঢ় ভাবে হাস্য করিতে করিতে তিনি নিজের শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

অতঃপর সাতদিন ধরিয়া নিশিকান্তবাবুর ভোমরা রঙের সিডান-বডির গাড়িখানি মধু-সঞ্চয়ী মৌমাছির মত কলিকাতার পথে পথে গুঞ্জন করিয়া উড়িয়া বেড়াইল। নিশিকান্তবাবু কোথায় কোথায় গেলেন ও কাহার সহিত নিভৃতে কি কথা বলিলেন তাহা ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্য নয়—সাধ্য হইলেও বলিতাম না। পরের গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া দিতে আমরা ভালবাসি না। এই সব যাতায়াতের ফলে নিশিকান্তবাবুর ব্যাঙ্ক হইতে লক্ষাধিক টাকা অপসৃত হইয়া কোন্ মৌচাকে সঞ্চিত হইল তাহাও বলিব না। ঘুষির পুংলিঙ্গে যে-শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা অত্যন্ত ঘৃণা করি।

'তারপর মাল খরিদ আরম্ভ হইল। নিশিকান্তবাবু যে যে মাল খরিদ করিয়া বাজার কোণঠাসা করিলেন তাহার ফিরিস্তি দিবার প্রয়োজন নাই; তিনি বাজার উজাড় করিয়া গুদামজাত করিলেন। বড় বড় দেশী বিলাতী ব্যবসায়ীরা ভ্রূ তুলিল, মনে মনে হাসিল—কিন্তু অকপট আনন্দে হাত ঘসিতে ঘসিতে মাল সরবরাহ করিল। কেবল নিশিকান্তবাবু কেরোসিন তেলের দিকে গেলেন না; অনেক মূলধন চাই, লাখে কুলাইবে না। অপ্রসন্ন চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন,—'করে নিক্ ব্যাটারা কিছু লাভ।'

দশদিনের দিন নিশিকান্তবাবুর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। তিনি গুদামে গিয়া মাল পরিদর্শন করিলেন, অফিসে বসিয়া খাতাপত্র তদারক করিলেন; তার-পর চেয়ারে ঠেসান দিয়া একটি স্থূলকায় সিগার ধরাইয়া বলিলেন,—'এইবার।'

সেইদিন রাত্রি সাতটার সময় কলিকাতা শহরের সমস্ত বিদ্যুৎবাতি নিবিয়া গেল। রাত্রি দশটার সময় রাস্তার গ্যাস বাতিও হঠাৎ দপদপ করিয়া চক্ষু মুদিল—তিনদিনের মধ্যে আর জ্বলিল না!

আলোকহীন মহানগরীর বর্ণনা আমরা করিব না। অন্ধকারের যে একটা রূপ আছে—কালিমা লইয়া যাঁহাদের কারবার তাঁহারা সে রূপ নয়ন ভরিয়া দেখুন এবং বর্ণনা করুন। নিশিকান্তবাবুর মত আমরা আলোর কারবারী। রাস্তা এবং ঘর অন্ধকার; ট্রাম বন্ধ। হ্যারিকেন লণ্ঠন ও মোমবাতির দর ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চড়িতে লাগিল। অথচ ঐ দুইটি দ্রব্য নিশিকান্তবাবুর গুদামে বন্ধ। তিনি অল্পে অল্পে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় রাত্রেও যখন আলো জ্বলিল না, তখন চারিদিকে বিরাট হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আশ্চর্য দৈব দুর্ঘটনায় গ্যাস ও ইলেকট্রিক যন্ত্র এমন খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, কিছুতেই মেরামত হইতেছে না। কিন্তু গৃহস্থের আলো চাই। লণ্ঠন ও মোমবাতির দাম এমন একটা কোঠায় গিয়া উঠিল যে, কল্পনা করাও কঠিন। নিশিকান্তবাবু মাল ছাড়িতে লাগিলেন, এবং ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। যে সব বড় বড় ব্যবসাদার একগাল হাসিয়া নিশিকান্তকে মাল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারা হাত কামড়াইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মূলধন উঠিয়া বারো হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তাছাড়া এখনো ষাট হাজার টাকার মাল গুদামে মজুত।

বারো হাজার টাকা পকেটে লইয়া নিশিকান্তবাবু অফিস হইতে বাড়ি ফিরিলেন। স্ত্রী তিনটা লণ্ঠন জ্বালিয়া স্বামীর জন্য স্বহস্তে চা তৈয়ার করিতেছিলেন, তাঁহার কোলে নোটের তাড়া ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'এই নাও।'

মাধুরী দেবী একমুখ হাসিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিলেন,—'আজ সরকারকে বাজারে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলুম, একটা হ্যারিকেনের দাম পাঁচটাকা! —হ্যাঁগা, আর ক'দিন?'

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবুর গুদাম খালি হইয়া গেল!

শেষ কিস্তির ষাট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইবার সময় ছিল না।

এই টাকাটাই নিশিকান্তবাবুর মূল লভ্যাংশ। এত টাকা এখন কোথায় রাখিবেন—নিশিকান্ত একটু চিন্তা করিলেন। চেক নয়, নগদ টাকা। অফিসের লোহার সিন্দুকে রাখিয়া গেলেও চলে, কিন্তু—দু'একটা সংবাদ নিশিকান্তর স্মরণ হইল। অন্ধকারের সুযোগ লইয়া চোর গুণ্ডার দল খালি অফিস-বাড়ি ইত্যাদি ভাঙিয়া লুট করিতেছে—বড় বড় দুই তিনটা অফিসে এইরূপ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। নিশিকান্ত নোটের গোছা পকেটে পুরিয়া লইলেন। বাড়িতে রাখিলে সব চেয়ে নিরাপদ হইবে। বাড়িতে পাঁচটা গুর্খা দরোয়ান, দশটা চাকর আছে, ; তাহার উপর আবার দু'জন কন্‌স্টেবল্‌কে খরচা দিয়া পাহারা দিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে!

নিশিকান্ত অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন মোটরে চড়িলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; মোটরের কাচের ভিতর দিয়া দুধারি রাস্তার চেহারা সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কলিকাতা যেন রাত্রিযোগে ভৌতিক শহরে পরিণত হইয়াছে। বড় বড় দোকানের বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত হাসি আর নাই, অধিকাংশই বন্ধ। যেগুলি খোলা আছে তাহাতে মোমবাতি ও লণ্ঠন জ্বলিতেছে। পথে গাড়ি মোটরের চলাচলও কম। মানুষ যাহারা যাতায়াত করিতেছে তাহাদের নিশাচর প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়।

কলেজ-স্ট্রিট বাজারের নিকটে পৌঁছিয়া নিশিকান্তবাবুর ভারি কৌতূহল হইল। কোনও একটা বড় কাজ করিয়া সাধারণের মতামত জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তিনি মোটর হইতে নামিলেন। একটা ক্ষুদ্র দোকানে আলো জ্বলিতেছিল, তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মোমবাতি আছে?'

দোকানদার বলিল,—'আজ্ঞে আছে, তিনটাকা বাণ্ডিল।'

নিশিকান্ত পকেট হইতে তিনটাকা বাহির করিয়া দিয়া ছদ্ম বিরক্তির কণ্ঠে বলিলেন, 'দিন্ এক বাণ্ডিল। যত সব চোরের পাল্লায় পড়া গেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'শার্ক' এই ব্যবসাদারগুলো হচ্ছে তাই!'

দোকানদার নেহাৎ অশিক্ষিত নয়, একটু রসিক; বলিল, 'শার্ক তো পদে আছে মশাই, ব্যবসাদারেরা যাকে বলে তিমি মাছ—তাই! আস্ত গিলে খায়। নিন এক বাণ্ডিল।'

নিশিকান্ত দোকানদারের কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিলেন;

নীরেন ও মিলু। নৃসিংহবাবু অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ঝগড়া আরম্ভ করিত।

ঝগড়ার কোন হেতু ছিল না, নিতান্ত অকারণেই পরস্পরের ছুতা ধরিয়া ইহারা ঝগড়া করিত। নীরেন মিলু অপেক্ষা ছয় সাত বৎসরের বড়, কিন্তু সেজন্য তাহাদের বাধিত না। বছর আষ্টেক আগে যখন এই বাড়িতে তাহাদের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তখনই এই কলহের সূত্রপাত হইয়াছিল। নবাগত নীরেন মিলুকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিল—এই ছুঁড়ি, তুই বুঝি এ বাড়ির ঝি? আমার জুতো ভাল করে বুরুশ করে রেখে দে তো।

দশবর্ষীয়া মিলু কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল,—মামা একটা বাঁদর পুঁষবেন বলেছিলেন; তুমি বুঝি সেই বাঁদরটা?

আড়াল হইতে নৃসিংহবাবু এই কথোপকথন শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তদ্দণ্ডেই তাঁহার মনে একটা কুটিল অভিসন্ধি জাগিয়াছিল।

অতঃপর নীরেন ও মিলু একত্র বড় হইয়াছে; দুজনেই এখন কলেজে পড়ে। কিন্তু তাহাদের বিরোধ কিছুমাত্র কমে নাই। চোখোচোখি হইলেই তাহারা ঝগড়া করে; এমন কি বেশিক্ষণ চোখোচোখি না হইলে দুজনেরই মন ছটফট করিতে থাকে। তখন একজন আর একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাড়ম্বরে কলহ আরম্ভ করিয়া দেয়।

তাহাদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বাড়ির ঝি অন্নদা ছড়া কাটিয়া মন্তব্য করিয়াছিল—

"মরি কি ভাবের হুলোহুলি
না দেখলে প্রাণে মরি, দেখলে চুলোচুলি।"

নৃসিংহবাবু অবশ্য বিজ্ঞানে মগ্ন আছেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি এসব কিছু লক্ষ্য করেন। পায়রা ও খরগোসের মত ইহারা দুজনেও যেন তাঁহার জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নীরেন ও মিলুর কলহের ক্রমবিকাশ আনুপূর্বিক বর্ণনা করা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। প্রথম কিছুদিন তাহারা নির্লজ্জভাবে মারামারি করিয়াছিল। একবার নীরেন মিলুর উরুতে ছুরির এক কোপ বসাইয়া দিয়াছিল; পরিবর্তে মিলু নীরেনের হাত কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়া দেয়; দুজনের দেহেই সে ক্ষতচিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু যতই তাহাদের বয়স বাড়িতে লাগিল, যুদ্ধের রীতিতেও ক্রমশ পরিবর্তন দেখা দিল। এখন আর কেহ কাহাকেও

দৈহিক আক্রমণ করে না, যুদ্ধের অস্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে। মনের প্রগতির ইহাই ইতিহাস।

সেদিন সকালে নৃসিংহবাবু তাঁহার একটিমাত্র কোট যথারীতি প্রসাধন-পূর্বক ল্যাবরেটারিতে প্রস্থান করিবার পর, মিলু নীরেনের ঘরে গিয়া দেখিল নীরেন তখনও ঘুমাইতেছে। মিলু কিয়ৎকাল চিন্তিত ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা খরগোস আনিয়া তাহার বিছানায় ছাড়িয়া দিবে? না, সেটা নূতন কিছু হইবে না, কারণ কিছুদিন পূর্বে নীরেনই ঐ কার্যটি করিয়াছিল। তাহার অনুকরণ করিলে নীরেন খুশিই হইবে।

সহসা মাথায় কোন বুদ্ধি গজাইল না। তখন মিলু নীরেনের নাকে একটি খড়কে কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল,—কুম্ভকর্ণ, ওঠ—আটটা বেজে গেছে। —বলিয়া প্রস্থান করিল।

নীরেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল,—বাঁদুরী—বলিয়াই প্রচণ্ড বেগে হাঁচিয়া ফেলিল।

মুখ-হাত ধুইয়া সে টেবিলের সম্মুখে বসিল এবং গভীর মনঃসংযোগে কি লিখিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক মিনিট পরে মিলু আসিয়া জলখাবারের রেকাবি টেবিলের উপর রাখিতেই নীরেন অসম্পূর্ণ লেখাটা লুকাইয়া ফেলিল। মিলু কিন্তু এক নজর লেখাটা দেখিয়া লইয়াছিল, বলিল,—কি লেখা হচ্ছিল? পদ্য? আ মরে যাই! কার নামে পদ্য লেখা হচ্ছে?

নীরেন বলিল, যার নামেই লিখি না—

মিলু ফস্ করিয়া কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া পড়িল—

"একটি বালিকা—নামটি তাহার মিলু,
মস্তকে তার নাই একফোঁটা ঘিলু—"

নীরেনের নাকে কাঠি দিয়া মিলু যে বিজয়গর্ব অনুভব করিতেছিল তাহা লুপ্ত হইয়া গেল, সে দুহাতে কাগজখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ক্রোধ-অবরুদ্ধ স্বরে বলিল,—আচ্ছা আমিও জানি। মাথায় ঘিলু আছে কি না দেখিয়ে দেব।

তখনকার মত বিজয়ী নীরেন দন্ত বাহির করিয়া হাসিল এবং পরম পরিতৃপ্তি সহকারে জলযোগ আরম্ভ করিল।

দুজনেই যথাসময়ে কলেজে গেল; নীরেন যাইবার সময় মিলুর দিকে

চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল। মিলু নিদ্রালু বিড়ালীর মত কেবল চক্ষু কুঞ্চিত করিল।

নীরেন বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিল তাহার টেবিলের উপর একটি ছয়-পংক্তির কবিতা শোভা পাইতেছে।—

"একটি যুবক—নামটি তাহার নীরু,
ক্যাবলার রাজা, চাষা, অসভ্য, ভীরু,
মহিলাগণের সম্মান নাহি জানে;
বুদ্ধি এবং শিক্ষার দোষ—মানে—
মানুষ না হয়ে ভাল্লুক হত যদি
নাচ দেখিতাম আনন্দে নিরবধি।"

নীরেন কবিতা-পাঠ শেষ করিয়াছে, এমন সময় মিলু প্রবেশ করিয়া বলিল,—কেমন কবিতা?

নীরেন দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল,—আমার ছন্দ চুরি করেছিস।

মিলু বিদ্রূপপূর্ণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—ইঃ—ওঁর ছন্দ! বাজার থেকে উনি কিনে এনেছেন!

নীরেন উত্তপ্ত স্বরে বলিল,—তুই একটা চোর।

মিলু ততোধিক উত্তপ্ত স্বরে বলিল,—তুমি একটি ডাকাত।

নীরেন চেয়ারে বসিয়া বলিল,—তুই প্যাঁচা।

মিলু তাহার সম্মুখে আর একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল,—তুমি হাঁড়িচাঁচা।

দুজনেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিল।

—তুই ইঁদুর।

—তুমি টিকটিকি।

—তুই ক্যাঙারু।

—তুমি গণ্ডার।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলিল। ক্রমে পশুপক্ষীর নাম ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তখন মিলু জিভ বাহির করিয়া নীরেনকে ভ্যাংচাইয়া দিল। নীরেন প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তারপর সেও দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। বিরোধ এতটা চরমে অনেক দিন উঠে নাই।

এই সময় নৃসিংহবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মিলু ও নীরেন চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধ এবং জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত করিয়া মুখোমুখি বসিয়া আছে! তিনি

ধূর্ত বৈজ্ঞানিক, চট করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। আনন্দে তাঁহার মস্তকের একটিমাত্র কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

তিনি হর্ষোৎফুল্লস্বরে ডাকিলেন, মিলু, নীরেন!

উভয়ে জিহ্বা সম্বরণ করিয়া চক্ষু মেলিল।

নৃসিংহবাবু বলিলেন, বড় খুশি হয়েছি। তোমরাই আমার থিয়োরি প্রমাণ করতে পারবে। আমি তোমাদের দুজনের বিয়ে দেব—পরস্পরের সঙ্গে। হাঃ হাঃ হাঃ!—তিনি প্রস্থান করিলেন।

মিলু ও নীরেন পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তাবটা আকস্মিক বটে, কিন্তু সেজন্য কেহ বিস্মিত হইল না। নৃসিংহবাবুর সকল কার্যই অপ্রত্যাশিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অমান্য করিবার কল্পনাও কখনো ইহাদের মাথায় আসে নাই। তিনি ইচ্ছামত পায়রা ও খরগোসের বিবাহ দিতেন, কেহ আপত্তি করে নাই; এক্ষেত্রেও কেহ আপত্তি করিল না। বরং সারাজীবন ধরিয়া দুজনকে জ্বালাতন করিতে পারিবে এই আনন্দেই আত্মহারা হইয়া পড়িল। উভয়েই একই সঙ্গে বলিয়া উঠিল, এবার মজা টের পাবে।

ফুলশয্যার রাত্রে নীরেন খাটে বসিয়া পা দুলাইতেছিল, মিলু প্রবেশ করিতেই গম্ভীর স্বরে বলিল, আমি হচ্ছি তোমার স্বামী, শীগগির প্রণাম কর।—বলিয়া নিজের পায়ের দিকে আঙুল নির্দেশ করিল।

মিলু তৎক্ষণাৎ ভালমানুষের মত গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল; তারপর উঠিবার সময় নীরেনের পায়ে চিমটি কাটিয়া দিল। নীরেন লাফাইয়া উঠিল,—উঃ! তারপর দুই বাহুর দ্বারা পলায়নপরা মিলুকে চাপিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, তবে রে—

দুজনের দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়া গেল।

আশা করিতেছি ইহাদের দাম্পত্যজীবন অন্যান্য সাধারণ দাম্পত্যজীবন হইতে পৃথক হইবে না। কারণ নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন যাহাই হোক—সার্বজনিক; মিলু ও নীরেন সাধারণ পাঁচজনের মতই ঝগড়া করিয়া, ভালবাসিয়া পরস্পরকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়া জৈব ধর্ম পালন করিবে।

আমরা অবশ্য বিবাহ দিয়াই সরিয়া পড়িলাম।

আদিম নৃত্য

পুরুষ-মাকড়সা প্রেমে পাড়লে প্রেয়সীর সম্মুখে নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। কিন্তু মিলন ঘটিবার পর নৃত্য করিবার মত মনোভাব আর তাহার থাকে না। প্রেমমুগ্ধা স্ত্রী-মাকড়সা তাহাকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিয়া ফেলে।

যাহার আটটা পা এবং ষোলটা হাঁটু আছে, সে যে সুযোগ পাইলেই নৃত্য করিবে তাহাতে বিস্ময়কর কিছু নাই। পরন্তু অতগুলা পা ও হাঁটু না থাকা সত্ত্বেও মানুষ অনুরূপ অবস্থায় ঠিক অনুরূপ কার্যই করিয়া থাকে। ডারুইন মহাশয়ের কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, মাকড়সার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে; হয়ত নারীজাতির সম্মুখে নৃত্য করিবার স্পৃহা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি; এবং নারীজাতিও যখন আমাদের সঙের মত নৃত্য দেখিয়া বেবাক গ্রাস করিয়া ফেলে তখন তাহারা তাহাদের আদিম অতিবৃদ্ধ-পিতামহীর মৌলিক প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।

কিন্তু এ-সব বাজে কথা। কাজের কথা এই যে, আমরা অহরহ নানা কলাকৌশল দেখাইয়া নারীকে ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ধাপ্পা টিকিতেছে না, নারীর মোহমুক্ত চোখে বারম্বার ধরা পড়িয়া যাইতেছে। উদয়শঙ্করের গলায় যিনি মাল্য দিবেন তিনি জানিয়া বুঝিয়াই দিবেন।

শ্রীমতী লুতারাণী ও শ্রীমান্ বীরেশ্বরের মধ্যে প্রণয়ঘটিত একটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রেমের প্রতিবন্ধক—আর্থিক সামাজিক ঐহিক দৈহিক পৈতৃক বা পারত্রিক—কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু প্রতিবন্ধক না থাকিলেই যদি মিলন ঘটিত, তবে আর ভাবনা ছিল কি?

যা হোক, কবির ভাষায়—

> খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
> বনের পাখী ছিল বনে।

লুতা কলিকাতায় পিতৃভবনরূপ স্বর্ণপিঞ্জরে কাল্‌চারের ঝাললঙ্কা লালঠোঁটে ধরিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার করিত, এবং জমিদারের ছেলে বীরেশ্বর বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইত। সহসা কি করিয়া দুজনের দেখাশুনা হইয়া গেল।

তারপরই উক্ত প্রণয়ঘটিত জটিলতা। এবং তারপরেই বীরেশ্বর লূতার সম্মুখে—মেটাফরিক্যালি—নাচিতে সুরু করিয়া দিল।

লূতার ঠোঁটে হাসি, চোখে কৌতুক ; সে এই নৃত্য উপভোগ করিতেছে, কদাচিৎ হাততালি দিয়া তাহা জানাইয়া দেয়। উৎসাহিত বীরেশ্বর আরও বেগে নৃত্য করে। নাচিতে নাচিতে লূতার কাছে ঘেঁসিয়া আসে কিন্তু লূতা মৃদু হাসিয়া অলক্ষিতে সরিয়া যায়। নর্তক ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান পূর্ববৎ থাকিয়া যায়—কমে না।

কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমে মেটারলিঙ্কীয় রূপকের মত দুর্বোধ হইয়া দাঁড়াইতেছে! স্পষ্টভাষায় না বলিলে চশমাপরা অস্পষ্টদর্শী পাঠক বুঝিবেন না।

একদিন সন্ধ্যার পর লূতাদের ড্রইংরুমে লূতা ও বীরেশ্বর বসিয়া ছিল; লূতার ডাক্তার বাবাও এতক্ষণ ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ফোনে রোগীর আহ্বান পাইয়া তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বীরেশ্বর উঠিয়া আসিয়া লূতার পাশের চেয়ারে বসিল। তাহার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, ঢিলা আস্তিনের ভিতর হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া কব্জি সমেত বাহুর খানিকটা দেখা যাইতেছে। সে ঈষৎ হস্তসঞ্চালনে বাহুর আরও খানিকটা মুক্ত করিয়া দিয়া অলসকণ্ঠে বলিল,—'আজ ব্যায়াম সঙ্ঘের মিটিঙে বক্তৃতা দিতে হল।'

বিস্ময়-প্রশংসা-তরলিত স্বরে লূতা বলিল,—'আপনি বক্তৃতা দিতেও পারেন?'

একটু হাসিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'পারি যে তা নিজেই জানতুম না; কিন্তু বলতে উঠে দেখলুম, পারি।'

'কি বক্তৃতা দিলেন?'

'এই—স্বাস্থ্য, ব্যায়াম, শিকার সম্বন্ধে দু-চার কথা। সকলেই বেশ মন দিয়ে শুনলে।'

লূতা বলিল, 'আপনি শুনেছি একজন মস্ত শিকারী। কি শিকার করেন?'

বীরেশ্বর তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'বাঘ ভালুক—তা ছাড়া আর কি শিকার করব! সিংহ তো আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।'

উৎসুকভাবে লূতা জিজ্ঞাসা করিল, 'কটা বাঘ মেরেছেন?'

'গোটা আষ্টেক হবে।—আমার বাড়িতে যদি কখনও যাও, দেখবে তাদের মুণ্ডুসুদ্ধ চামড়া আমার ঘরে সাজানো আছে। যাবে লূতা? একদিন চল না।'

লূতা হাসিল। প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিল, 'আপনার খুব সাহস—না?'

ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'সাহস! কি জানি! আছে বোধ হয়। কখনও ভয় পেয়েছি বলে তো স্মরণ হয় না।' তারপর লূতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'এবার তোমার জন্যে একটা বাঘ মেরে নিয়ে আসব, কি বল?'

লূতা আবার হাসিল; উজ্জ্বল চপল হাসি। বলিল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'—লূতার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বীরেশ্বর বলিল,—'বাঘের বদলে তুমি আমায় কি দেবে বল?'

আস্তে আস্তে হাত ছাড়াইয়া লূতা বলিল, 'কি দেব? বাঘের বদলে কি দেওয়া যেতে পারে? আচ্ছা আপনাকে ভাল একটা প্রশংসাপত্র দেব।'

'তার বেশি আর কিছু নয়?'

লূতা মুখটি ভালমানুষের মত করিয়া বলিল, 'প্রশংসাপত্রের চেয়ে বেশি আর আপনার কি চাই? ওর চেয়ে বড় আর কি আছে!'

বীরেশ্বর ক্ষুণ্ণ হইল, ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আজ উঠতে হল, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। পঞ্চাশ মাইল স্পীডে মোটর চালিয়ে যদি যাই, তবু বাড়ি পৌঁছতে দুঘণ্টা লাগবে।'

গাড়িবারান্দার সম্মুখে আয়নার মত ঝকঝকে দীর্ঘাকৃতি একখানা মোটর দাঁড়াইয়া ছিল, লূতা বীরেশ্বরকে বিদায় দিতে আসিয়া বলিল, 'কি চমৎকার গাড়ি! নতুন কিনলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। বারো হাজার টাকা দাম নিলে। মন্দ নয় জিনিসটা।'

তারপর বীরেশ্বর বোধ হয় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে বাড়ির দিকে রওনা হইল।

লূতা ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার মুখে মনালিসার গূঢ় রহস্যময় হাসি। ও হাসিটা কিন্তু মনালিসার নিজস্ব নয়; সকল নারীই সময় বুঝিয়া ঐরকম হাসিয়া থাকে।

লূতার বাবা ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বীরেশ্বর চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'—হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া লূতা বলিল, 'বীরেশ্বরবাবুর মতন এমন সর্বগুণমণ্ডিত লোক দেখা যায় না। তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন, বাঘ মারতে পারেন, পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাতে পারেন, শুধু নাচতে পারেন কি না এ খবরটা এখনও পাইনি। বাবা, বীরেশ্বরবাবুর ভেতরের সত্যিকার মানুষটি কেমন?'

বাবা চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'জানি না।'

লুতার চোখদুটি এবার ক্রুদ্ধ ও সজল হইয়া উঠিল—কেন ওরা কেবলি অভিনয় করে! কেন এত যত্ন করিয়া সত্যকার মানুষটিকে লুকাইয়া রাখে? ছদ্মবেশের এই ভাঁড়ামি দেখিয়া লুতার লজ্জা করে, আর তাহাদের নিজের লজ্জা নাই?

কিন্তু লুতা মুখে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

দিন সাতেক পরে বীরেশ্বর ফিরিল। তাহার মোটরের পিছনে একটা প্রকাণ্ড বাঘের মৃতদেহ বাঁধা।

লুতা দ্বিতলের জানালা হইতে দেখিয়াছিল, কিন্তু নামিয়া আসিতে বিলম্ব করিল। যখন নামিল তখন বীরেশ্বর তাহার বাবার কাছে বাঘশিকারের গল্প করিতেছে।

লুতাকে দেখিয়া বীরেশ্বর বলিল,—'তোমার বাঘ এনেছি।'

লুতা স্ত্রীজাতি, সে বিস্ময় প্রকাশ করিল। তারপর কৌতূহল, ও শেষে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া বীরেশ্বরের বীরত্বের মূল্য অযথা বাড়াইয়া দিল। বাঘ পরিদর্শন হইল। তারপর বীরেশ্বর আবার বাঘশিকারের গল্প আরম্ভ করিল।

লুতার বাবা কাজের লোক, ক্রমাগত বাঘশিকারের গল্প শুনিবার তাঁহার অবকাশ নাই। তিনি এক ফাঁকে অপসৃত হইয়া পড়িলেন।

কাহিনী শেষ করিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'এবার তোমার বাঘ তুমি নাও।'

লুতা বলিল, 'আমার বাঘ! বাঘের গায়ে কি আমার নাম লেখা আছে?'

'নাম লিখতে আর কতক্ষণ লাগে। বল তো এখনি—'

'তার দরকার নেই।—লাকি-বোন্‌টা আমায় দেবেন।'

বীরেশ্বর লুতার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'লুতা, এবার তোমার পালা। তুমি আমায় কি দেবে?'

হাত টানিয়া লইয়া লুতা বলিল,—'ও—ভুলে গিয়েছিলুম। দাঁড়ান, প্রশংসাপত্রটা লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলিয়া সহাস্য মুখে উপরে চলিয়া গেল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐহিক এবং দৈহিক, পৈতৃক এবং পারত্রিক প্রতিবন্ধক না থাকিলেও প্রণয়ের পথ কণ্টকাকীর্ণ। ক্রুদ্ধ বীরেশ্বর বাঘ লইয়া

ফিরিয়া গেল এবং দশদিন ধরিয়া মেজাজ এমন তিরিক্ষি করিয়া রাখিল যে আত্মীয় পরিজন সকলেই সন্দেহ করিল মৃত বাঘের প্রেতাত্মা তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে।

কিন্তু এগারো দিনের দিন হঠাৎ তাহার রাগ পড়িয়া গিয়া আবার নৃত্যলিপ্সা জাগিয়া উঠিল।

সে টেলিফোনে লূতাকে ট্রাঙ্ক-কল দিল। ওদিকে এই দশ দিনে লূতাও কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। নৃত্য দেখিলে রাগ হয়, আবার না দেখিলেও মন খারাপ হইয়া যায়—ইহাই নারীজাতির স্বভাব।

বীরেশ্বর টেলিফোনে বলিল, 'তোমার লাকি-বোন্ তৈরী হয়ে এসেছে।'

উদ্‌গ্রীব স্বরে লূতা বলিল, 'তৈরী হয়ে এসেছে! কোথা থেকে?'

'স্যাকরা-বাড়ি থেকে। একটা ব্রোচ। পাঠিয়ে দিতে পারি?'

লূতার কণ্ঠ মধুর হইয়া উঠিল,—'আপনার বুঝি কাজ আছে? নিজে আসতে পারবেন না?'

'কাজ!' বীরেশ্বর লাফাইয়া উঠিল, 'তোমার ঘড়িতে কটা বেজেছে?'

'তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। কেন?'

'আচ্ছা, চারটে বেজে পাঁচ মিনিটে আমি গিয়ে পৌঁছুব।'

'অ্যাঁ! এক ঘণ্টায় সত্তর মাইল! না—না—'

কিন্তু বীরেশ্বর আর কিছু শুনিল না, টেলিফোন ফেলিয়া গ্যারাজের দিকে ছুটিল।

ঠিক চারটে বাজিয়া তিন মিনিটে লূতাদের বাড়ির সম্মুখে একটা বিরাট শব্দ হইল। লোমহর্ষণ কাণ্ড! সত্তর মাইল নিরাপদে আসিয়া বীরেশ্বরের মোটর লূতার দ্বারের কাছে চিৎ হইয়া পড়িয়াছে! একটা লোহাবোঝাই তিন-টন্ লরী যাইতেছিল, তাহারই সহিত ঠোকাঠুকি।

মোটরের তলা হইতে বীরেশ্বরের সংজ্ঞাহীন দেহ বাহির করা হইল, তারপর ধরাধরি করিয়া লূতাদের বাড়িতে তোলা হইল। বাড়িতেই ডাক্তার। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই। মুখের আঁচড়গুলো মারাত্মক নয়; তবে বাঁ পায়ের টিবিয়া ভেঙে গেছে।' বলিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ইন্‌জেকশন্ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

লূতা জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রাণের ভয় নেই?'

'নাঃ। কিছুদিন বাবাজীকে একটু খুঁড়িয়ে চলতে হবে—এই পর্যন্ত।'

বীরেশ্বরের নৃত্য-জীবনের যে এই সঙ্গে অবসান হইয়াছে তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না।

এক ঘণ্টা পরে বীরেশ্বরের জ্ঞান হইল। তখন সে সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ লইয়া বিছানায় শুইয়া আছে। লূতা তাহার পাশে একটি টুলের উপর উপবিষ্ট।

লূতা জলভরা চোখে বলিল, 'কেন এত জোরে গাড়ি চালিয়ে এলেন? না হয় দুঘণ্টা দেরি হত?'

চিরন্তন প্রথামত বীরেশ্বর 'আমি কোথায়' বলিল না। বলিল, 'আমার সারা গা এত জ্বালা করছে কেন?'

লূতার বুক দুলিয়া উঠিল, সে বলিল,—'টিঞ্চার আয়োডিন।'

বীরেশ্বর বলিল, 'আমার মুখখানা কি কেটেকুটে একেবারে বিশ্রী হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ—কিন্তু ও কিছু নয়। বাবা বললেন সেরে যাবে।'

বীরেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, 'আর কি হয়েছে?'

'আর বাঁ পায়ে ফ্র্যাক্‌চার হয়েছে।'

মর্মভেদী স্বরে বীরেশ্বর বলিল, 'টিংটিংয়ের জন্যে খোঁড়া হয়ে গেলুম!'

লূতা উদ্বেলিত হৃদয়ে চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বীরেশ্বরও চুপ করিয়া রহিল; তারপর তাহার মুদিত চোখে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সে চোখ বুজিয়াই বলিল,—'লূতা, আমরা ভারি বোকা।'

লূতা জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

বীরেশ্বর বলিতে লাগিল, 'কেন? আমরা যাকে ভালবাসি তাকে ভালবাসার কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার মনে করি না—কেবল নিজের যোগ্যতাই প্রমাণ করতে চাই। তাই, আজ বলবার অবকাশ যখন হল তখন আর সে-কথা মুখ থেকে বার করবার উপায় নেই।'

মৃদুস্বরে লূতা বলিল,—'কেন উপায় নেই?'

অধীর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বীরেশ্বর বলিল, 'বোকার মত কথা ব'লো না লূতা। কি হবে বলে? বললেই বা শুনবে কে? ভাঙা বাঁশির বেসুরো আওয়াজ কার শুনতে ভাল লাগে!'

লূতা বলিয়া উঠিল, 'আমার ভাল লাগে—তুমি বল।'

'লূতা!' বীরেশ্বর প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

বাঁশি ভাঙিয়াই যে তাহার বেসুরা আওয়াজ সুরে ফিরিয়া আসিয়াছে,

লুতা তাহা বলিল না। সে উঠিয়া বীরেশ্বরের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মস্তকটি বুকের মধ্যে জড়াইয়া লইল, বলিল, 'অত চেঁচিও না—পাশের ঘরে বাবা আছেন। এতদিন খালি ছেলেমানুষি করলে কেন? কেন নিজের সত্যিকার পরিচয় দিতে এত দেরি করলে?'

কিন্তু বীরেশ্বরের সত্যিকার পরিচয় দেওয়া তখনও শেষ হয় নাই। সে কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর চাপা যন্ত্রণার স্বরে বলিয়া উঠিল, 'লুতা, মাথা ছেড়ে দাও—উঃ—উঃ—অত জোরে চেপো না—বড্ড লাগছে—'

লুতারাণী দুর্বল অসহায় পুরুষকে তাহার বুভুক্ষু বক্ষে গ্রাস করিয়া লইল। এইরূপে প্রকৃতির আদিমতম বিধান সার্থক হইল এবং প্রত্যহ হইতেছে।

ভেন্‌ডেটা

১

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

ওলংগোবিন্দ ঘোষ ও কুঞ্জকুঞ্জর কর পাশাপাশি জমিদার ছিলেন। উভয়ের নামই বিস্ময়-উৎপাদক। আসল কথা, ওলংগোবিন্দবাবু ছিলেন ওলাই চণ্ডীর বরপুত্র; এবং কুঞ্জকুঞ্জরবাবু শাক্তভাবাপন্ন বৈষ্ণববংশের সন্তান।

চারপুরুষ ধরিয়া দুই বংশে কলহ চলিতেছিল। শতাধিক বর্ষ পূর্বে কুঞ্জকুঞ্জরের বৃদ্ধপিতামহ ওলংগোবিন্দের বৃদ্ধপিতামহের পুত্রের (অর্থাৎ পিতামহের) বিবাহের বৌভাত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া নববধূ দেখিয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—'ছেলের কথা কিছু বলব না, বাপকা বেটা; কিন্তু ভায়া, বৌ হয়েছে যেন মুক্তোর মালা।'

রসিকতাটি বুঝিতে বরপক্ষের একটু দেরি হইয়াছিল, সেই অবকাশে রসিক ব্যক্তিটি নিজের জমিদারীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

তার পর হইতেই পুরুষ-পরম্পরায় কলহ চলিয়া আসিতেছে।

বর্তমানে ওলংগোবিন্দের সহিত আদালতে ছাড়া কুঞ্জকুঞ্জরের সাক্ষাৎ হইত না—তাহাও কালেভদ্রে। কিন্তু দেখা হইলে, যুযুধান ষণ্ডের মত উভয়ে ঘোর গর্জন করিতেন।

পার্ষদ ও শুভানুধ্যায়িগণ উভয়কে দূরে দূরে রাখিত।

কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে?

ওলগোবিন্দ একদা দেওঘরে এক বাড়ি খরিদ করিলেন। বাড়ির চারিধারে প্রকাণ্ড বাগান—পাঁচিলে ঘেরা। বাগানে ইউকালিপ্টাস, ঝাউ পেঁপে কলা—নানাবিধ গাছ।

ওলগোবিন্দ সপরিবারে একদিন হেমন্তকালে নব-ক্রীত বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভারি বাগানের সখ—বাগান দেখিয়া অত্যন্ত হ্রেষিত হইলেন।

পাঁচিলের পরপারে আর একটা বাড়ি; অনুরূপ বাগানযুক্ত। সন্ধ্যাকালে ওলগোবিন্দ দারোয়ান সঙ্গে সেই পাঁচিলের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে পাঁচিলের ওপারে আর একটি মূর্তি দেখিয়া স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

তারপর ওলগোবিন্দ ঘোর গর্জন করিলেন।

প্রত্যুত্তরে কুঞ্জকুঞ্জর ঘোরতর গর্জন করিলেন।

কিন্তু মধ্যে পাঁচিলের ব্যবধান—তাই সেযাত্রা শান্তিরক্ষা হইল।

ওলগোবিন্দ নিজের দারোয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'ভেঁপু সিং, এই বুড্‌ঢাকো রাস্তামে পাওগে তো টাক ফাটা দেওগে।' বলিয়া ভেঁপু সিং-এর হাতে একটি কোদালের বাঁট ধরাইয়া দিলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর নিজের দারোয়ানকে বলিলেন,—'মৃদং সিং, ঐ বুড্‌ঢাকো রাস্তামে দেখোগে তো ভুঁড়ি ফাঁসা দেওগে।' বলিয়া মৃদং সিং-এর হাতে একটি ভোঁতা খুরপি ধরাইয়া দিলেন।

এইরূপে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়া উভয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন। ওলগোবিন্দ নিজের পুত্র প্রিয়গোবিন্দকে বলিলেন—'কুঞ্জ শালা পাশের বাড়িতে উঠেছে।' কুঞ্জকুঞ্জর নিজ কন্যা সুধামুখীকে বলিলেন,—'ওলা শালা পাশের বাড়িতে আড্ডা গেড়েছে।'

২

স্ত্রীজাতির কৌতূহলের ফলে জগতে অসংখ্য অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ি সম্বন্ধে মেয়েদের কৌতূহল আজ পর্যন্ত কেহ রোধ করিতে পারে নাই; বৃথাই অবরোধ-প্রথা, হারেম, ঘোমটা, বোরখার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ওলগোবিন্দের বাড়িতে তিনটি স্ত্রীলোক;—ওলগোবিন্দের স্ত্রী ভামিনী ও

দুই কন্যা। কন্যা দুইটি বিবাহিতা—গিন্নিবান্নী-জাতীয়া। প্রিয়গোবিন্দ তাহাদের কনিষ্ঠ।

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহে তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা। তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা সুধামুখীই কেবল অনূঢ়া।

দুই পরিবারের একুনে নয়টি স্ত্রীলোকের কৌতূহল একসঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিল। পাঁচিলের আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি আরম্ভ হইল।

ক্রমে মুখ-চেনাচেনি হইল।

ভামিনী অন্যপক্ষের কর্তা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন,—'মিন্‌ষের ঝ্যাঁটার মত গোঁপ দেখলেই ইচ্ছে করে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিই!'

গৃহিণী সম্বন্ধে বলিলেন,—'মরণ আর কি!'

সুধামুখী সম্বন্ধে বলিলেন,—'বেশ মেয়েটি!'

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণীও মত প্রকাশ করিলেন; ওলগোবিন্দ সম্বন্ধে বলিলেন,—'মিন্‌ষের পেট দেখনা—যেন দশমাস!'

গৃহিণী সম্বন্ধে—'মরণ আর কি!'

প্রিয়গোবিন্দ সম্বন্ধে—'বেশ ছেলেটি!

তারপর সুগোপনে রমণীদের মধ্যে আলাপ হইয়া গেল। কর্তারা কিছুই জানিলেন না।

কেহ যদি মনে করে, নারীরা স্বামীর শত্রুকে নিজের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে—তবে তাহারা কিছুই জানে না। হিন্দুনারী স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু শত্রুপক্ষের নারীদের সঙ্গে গোপনে ভাব করিবার বেলা তাহাদের নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক। এই জন্যই কবি ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—কি বলিয়াছেন এখন মনে পড়িতেছে না। তবে প্রশংসাসূচক কিছু নয়।

৩

ওদিকে কর্তারা পরস্পরকে জব্দ করিবার মৎলব আঁটিতেছেন।

উকিল মোক্তার হাতের কাছে নাই, তাই মোকদ্দমা বাধাইবার সুবিধা হইল না। উভয়ে অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জগতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়, শত্রুর কথা অহর্নিশি চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার ধারাও একই প্রকার হইয়া যায়। তাই পরস্পরের

অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতে ওলগোবিন্দ ও কুঞ্জকুঞ্জর একই কালে একই সঙ্কল্পে উপনীত হইলেন।

গাছ!

ঝাগান নির্মূল করিয়া দাও!

চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিবার সময় কিন্তু দেখা গেল ওলগোবিন্দই অগ্রণী! ইহার গুটিকয় কারণ ছিল। প্রথমত—ওলগোবিন্দ পুত্রবান্—সুতরাং তাঁহার তেজ বেশি। কুঞ্জকুঞ্জর উপর্যুপরি পাঁচটি কন্যার পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, ক্রমাগত কন্যা জন্মিতে থাকিলে উৎসাহী ব্যক্তিরও কর্মপ্রেরণা কমিয়া যায়। দ্বিতীয় কথা—ওলগোবিন্দকে শত্রুদলন কার্যে সহায়তা করিবার জন্য সাবালক পুত্র ছিল—কুঞ্জকুঞ্জরের তাঁহা ছিল না।

ফলে, একদিন গভীররাত্রে ওলগোবিন্দ সাবালক পুত্রের হাতে একটি কাটারি দিয়া বলিলেন,—'ঝাউগাছগুলো!—একেবারে সাবাড় করে দিবি—একটাও রাখবি না।'

কর্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কাটারি হস্তে প্রস্থান করিল। প্রিয়গোবিন্দকে দেখিলে কাসাবিয়ান্‌কার কথা মনে পড়ে। কর্তব্যে কঠোর! The boy stood on the burning deck.

৪

পরদিন প্রাতঃকালে কুঞ্জকুঞ্জর দেখিলেন, তাঁহার ঝাউগাছগুলি করুণভাবে কাৎ হইয়া শুইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ ঝাউয়ের মতই কণ্টকিত হইয়া উঠিল; মাথায় চুল ছিল না বলিয়াই কিছু কণ্টকিত হইতে পাইল না।

তিনি চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিতে লাগিলেন।

তারপর দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,—'মৃদং সিং, দেখ্‌তা হ্যায়?'

মৃদং সিং বলিল,—'হজুর!'

কুঞ্জকুঞ্জর বলিলেন,—'ঐ বুড ঢা কিয়া।'

'আলবাৎ। বে-শক্!'

'হাম্‌ভি বুড ঢাকো দেখ্ লেঙ্গে!'

মৃদং সিং বলিল,—'তাঁবেদার মোজুদ হ্যায়।'

কুঞ্জকুঞ্জর ভাবিলেন, মৃদং সিংকে দিয়াই প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বিবেচনার পর দেখিলেন তাহা উচিত হইবে না। চাকরকে দিয়া

বে-আইনী কাজ করানো মানেই সাক্ষীর সৃষ্টি করা। তাহাতে কাজ নাই। যাহা করিবার তিনি নিজেই করিবেন।

ওলগোবিন্দ সে রাত্রি সুখনিদ্রায় যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার কদলীকুঞ্জে কুঞ্জকুঞ্জর প্রবেশ করিয়া একেবারে তচ্‌নচ্‌ করিয়া গিয়াছে। কলাগাছগুলি নিতম্বিনীর উরুস্তম্ভের মত পাশাপাশি পড়িয়া আছে।

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী শ্রীজয়দেব কবি এ দৃশ্য দেখিলে হয়ত একটা নূতন কাব্য লিখিয়া ফেলিতেন। কিন্তু ওলগোবিন্দের চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

তিনিও চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিলেন।

তারপর বাড়ির ভিতর হইতে বন্দুক আনিয়া দমাদম্‌ আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে লাগিলেন!

কুঞ্জকুঞ্জর হটিবার পাত্র নয়। তিনিও বন্দুক আনিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল কিন্তু হতাহতের সংখ্যা শূন্যই রহিল।

বিক্রম প্রকাশ শেষ করিয়া দুইজনে আবার চিন্তা করিতে বসিলেন। ওদিকে স্ত্রীমহলে কি ব্যাপার চলিতেছে কেহই লক্ষ্য করিলেন না।

৫

যুদ্ধ-বিগ্রহ একটু ঠাণ্ডা আছে।

কারণ, দুই পক্ষই বন্দুক লইয়া সারারাত বারান্দায় বসিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে আকাশ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়েন।

কিন্তু দুইপক্ষই সুযোগ খুঁজিতেছেন।

ওলগোবিন্দের লক্ষ্য কুঞ্জকুঞ্জরের পুষ্পবর্ষী শিউলিগাছটির উপর।

কুঞ্জকুঞ্জরের নজর ওলগোবিন্দের সুন্দর কৃশাঙ্গী তরুণীর মত ইউকালিপ্টাস গাছের উপর।

একদিন ওলগোবিন্দের স্ত্রী আসিয়া বলিলেন,—'কী ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করছ—মিটিয়ে ফেল। সুধা মেয়েটি চমৎকার—প্রিয়র সঙ্গে—'

ওলগোবিন্দ চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—'খবরদার!'

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণী বলিলেন,—'বুড়োয় বুড়োয় ঝগড়া করতে লজ্জা করে না—মিটিয়ে ফেল। প্রিয় ছেলেটি চমৎকার—সুধার সঙ্গে—'

কুঞ্জকুঞ্জর গুম্ফ কণ্টকিত করিয়া বলিলেন,—'চোপরও!'

কিন্তু প্রিয়গোবিন্দ এসব কিছুই জানে না (সুধা জানে)। প্রিয়গোবিন্দ পিতৃভক্ত যুবক, তার উপর কর্মকুশল। ওলগোবিন্দ যখন কেবল শূন্যে বন্দুক ছুঁড়িতে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রিয়গোবিন্দ সেই অবকাশে শিউলিগাছ কাটিবার উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রিয়গোবিন্দ লক্ষ্য করিয়াছিল যে রাত্রি তিনটার পর কুঞ্জকুঞ্জর আর বন্দুক ছোঁড়েন না। অতএব তিনটার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। প্রিয়গোবিন্দ স্থির করিল, পিতাকে না বলিয়া শেষরাত্রে অভিযান করিবে। পিতাকে বলিলে তিনি হয়ত তাহাকে বন্দুকের মুখে যাইতে দিবেন না।

সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী। ভোর রাত্রে উঠিয়া প্রিয়গোবিন্দ করাত হাতে লইল; তারপর নিঃশব্দে পাঁচিল ডিঙাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের বাগানে প্রবেশ করিল।

জ্যোৎস্না ফিন্ ফুটিতেছে; কেহ কোথাও নাই। প্রিয়গোবিন্দ পা টিপিয়া টিপিয়া শিউলিগাছের দিকে অগ্রসর হইল।

শিউলিগাছের তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিল—

৬

একটি মেয়ে ফুল কুড়াইতেছে!

প্রিয়গোবিন্দ পলাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পলাইবার সুবিধা হইল না। সুধাও তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। এবং চিনিতে পারিয়াছিল। প্রিয়গোবিন্দ সুধাকে আগে দেখে নাই

আমাদের দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোক দেখিলে উঁকিঝুঁকি মারে এরূপ একটা অপবাদ আছে; মেয়েদের সম্বন্ধে কোন অপবাদ নাই, অথচ—

ত্রস্ত সুধা জিজ্ঞাসা করিল,—'কি চাই?'

প্রিয়গোবিন্দ করাত পিছনে লুকাইল; বলিল,—'কিছু না।'

সুধা,—'তুমি আমার শিউলিগাছ কাটতে এসেছ!' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রিয়গোবিন্দ স্তম্ভিত হইয়া বলিল,—'মানে—এ গাছ কার?'

'আমার!'

'মানে—তুমি কে? এ গাছ তো কুঞ্জরবাবুর!'

'আমি তাঁর ছোট মেয়ে। আমার নাম সুধা।'

'ও—মানে, তা বেশ তো।'

সুধা চক্ষু মুছিয়া বলিল,—'তোমরা কেন আমাদের ঝাউগাছ কেটে দিয়েছ ?'

প্রিয়গোবিন্দ ক্ষীণস্বরে বলিল,—'আমাদের কলা গাছ—'

'তোমরা তো আগে কেটেছ !'

প্রিয়গোবিন্দ নীরব। সুধার মুখে একটু মেয়েলী চাপা হাসি দেখা দিল। বিজয়িনী ! পুরুষ ও-হাসি হাসিতে পারে না।

সুধা আবার আঁচলে ফুল কুড়াইয়া রাখিতে লাগিল; যেন প্রিয়গোবিন্দ নামক পরাভূত যুবক সেখানে নাই !

প্রিয়গোবিন্দ বোকার মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার করাত দিয়া পিঠ চুলকাইল।

শেষে ঢোক গিলিয়া বলিল,—'তুমি রোজ এই সময় ফুল কুড়োতে আসো ?'

সুধা মুখ তুলিয়া বলিল,—'হাঁ—কেন ?'

প্রিয়গোবিন্দর কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল; সে তোৎলাইয়া বলিল,—'তবে আ-আমিও রোজ এ-ই সময় গাছ কাটতে আসব।' বলিয়া এক লাফে পাঁচিল ডিঙাইয়া পলায়ন করিল।

সুধা আবার হাসিল। বিজয়িনী !

৭

অন্দরমহলের ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে জটিল হইয়া উঠিতেছে। The plot thickens !

একদিন কুঞ্জকুঞ্জরের কুলপুরোহিত হাওয়া বদলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হঠাৎ ডিস্‌পেপসিয়া হইয়াছে।

ওদিকে কর্তারা রাত্রি জাগিয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাতদিন পরে দুজনেই ঘুমাইতে গেলেন। মৃদং সিং ও ভেঁপু সিং বাগান পাহারা দিতে লাগিল।

তিন দিন ঘুমাইবার পর দুই কর্তা আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। তখন আবার তাঁহাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চাগাড় দিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়গোবিন্দ রোজ শেষরাত্রে শিউলিগাছ কাটিতে যাইতেছিল। ওলগোবিন্দ তাহা জানিতেন না; তাই তিনি তাহাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। প্রিয়গোবিন্দ শিউলিগাছের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ জ্ঞাপন করিয়া

জানাইল, ওদিকে তাহার নজর আছে; সুবিধা পাইলেই সে শিউলিগাছের মূলে কুঠারাঘাত করিবে।

ওলগোবিন্দ হৃষ্ট হইলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর একজন মন্ত্রী পাইয়াছেন—পুরোহিত মহাশয়। তিনি ইউক্যালিপ্টাস্ গাছ সম্বন্ধে নিজের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন।

পুরোহিত মহাশয় অত্যন্ত সাদাসিধা লোক, তার উপর ডিস্‌পেপসিয়া-রোগী; তিনি বলিলেন,—'এর আর বেশি কথা কি! ভাল দিন দেখে কেটে ফেল্লেই হল। দাঁড়াও আমি পাঁজি দেখি।'

পাঁজি দেখিয়া পুরোহিত বৃক্ষচ্ছেদনের উৎকৃষ্ট দিন দেখিয়া দিলেন; এমন সহৃদয় অথচ ধর্মপ্রাণ সহায়ক পাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া গেল।

স্থির হইল সোমবার রাত্রি একটার সময় শুভকর্ম সম্পন্ন হইবে। গুলিগোলা বন্ধ আছে, ওলগোবিন্দটা নিশ্চয়ই এখনও ঘুমাইতেছে; সুতরাং নির্বিঘ্নে কার্য সম্পন্ন করিবার এই সময়।

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

বিশেষত নারীজাতি একজোট হইয়া যাহাদের পিছনে লাগিয়াছে তাহাদের জয়ের আশা কোথায়?

রাত্রি একটার সময় কুঞ্জকুঞ্জর করাত লইয়া নির্বিঘ্নে পাঁচিল পার হইলেন। কিন্তু ইউকালিপ্টাস গাছের কাছে যেমনি দাঁড়াইয়াছেন, অমনি ওলগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। কুঞ্জকুঞ্জর করাত দিয়া তাঁহার কান কাটিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। ভেঁপু সিং দারোয়ান তাঁহাকে পিছন হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

এই ভাবে বুকে-পিঠে আলিঙ্গিত হইয়া কুঞ্জকুঞ্জর বাড়ির মধ্যে নীত হইলেন। তাঁহাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া, তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অন্য প্রান্ত নিজ হস্তে লইয়া ওলগোবিন্দ আর একটি চেয়ারে বসিলেন। বন্দুক তাঁহার কোলের উপর রহিল।

দুইজনে পরস্পরের মুখ অবলোকন করিলেন।

চারি চক্ষুর ঠোকাঠুকিতে একটা বিস্ফোরক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেল না, ইহাই আশ্চর্য। ওলগোবিন্দ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন—'বুদ্দিনানা অফ্ দি

ব্রঙ্কাইটিস্ ইণ্টু দি ঘুলঘুলি অফ্ চাট্‌নি কাবাব। ভেরে কেটে গদি ঘেনে ধা—! গিজিতাক্‌শিন্!' —তাঁহার উদর জীবন্ত ফুটবলের মত লাফাইতে লাগিল।

কুঞ্জকুঞ্জর কিছুই বলিলেন না।

ওলগোবিন্দ তখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভেঁপু সিংকে বলিলেন,—'প্রিয়কে ডাক্!'

প্রিয় আসিল।

ওলগোবিন্দ গর্জন করিয়া বলিলেন,—'শিউলিগাছ।'

কাসাবিয়ান্‌কা তৎক্ষণাৎ পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে ছুটিল।

৯

পনের মিনিট কাটিয়া গেল। ওলগোবিন্দ দুই মিনিট অন্তর ফুটবল নাচাইয়া হাসিতে লাগিলেন,—'হিঃ! হিঃ! হিঃ।'

তারপর ওলগোবিন্দ বলিলেন,—'ভেঁপু সিং, থানামে খবর দেও! এই চোট্টাকো জেলমে ভেজেঙ্গে!'

'যো হুকুম' বলিয়া ভেঁপু সিং প্রস্থান করিল।

আরও পনের মিনিট অতীত হইল। ওলগোবিন্দ পূর্ববৎ দু-মিনিট অন্তর হাসিতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জর কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ উভয়ের কর্ণে দূর হইতে একটা শব্দ প্রবেশ করিল—'লু—লু—লু—'

দু-জনে শিকারী কুকুরের মত কান খাড়া করিলেন। শব্দটা যেন কুঞ্জ-কুঞ্জরের বাড়ি হইতে আসিতেছে।

ওলগোবিন্দ একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। দুপুর রাত্রে ও আবার কিসের শব্দ! শেয়াল নাকি? প্রিয় এতক্ষণ ওখানে কি করিতেছে?

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে যাইবারও উপায় নাই—কুঞ্জকুঞ্জর পলাইবে।

এমন সময় ভেঁপু সিং হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল; বলিল, 'আয় হুজুর, আপ বৈঠা হ্যায়?'

ওলগোবিন্দ রাগিয়া বলিলেন,—'বৈঠা রহেঙ্গে নেইত কি লাফাঙ্গে? ক্যা হুয়া?'

ভেঁপু সিং জানাইল ও-বাড়ির মাইজীলোগ দাদাবাবুকে পাকড়িয়া লইয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়াছে!

দুই কর্তা একসঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন। ওলগোবিন্দের কোল হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল।

ভেঁপু সিং তখনও বার্তা শেষ করে নাই, সক্ষোভে বলিল, উক্ত মাইজীলোগ কেবল দাদাবাবুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে 'উল্লু উল্লু' বলিয়া গালি দিতেছে।

এই সময় কর্তারা স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন—'উলু—উলু—উলু—'

দু-জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর, যেন একই যন্ত্রের দ্বারা চালিত হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কুঞ্জকুঞ্জরের পায়ের দড়ি অজ্ঞাতসারেই ওলগোবিন্দের হাতে ধরা রহিল।

তাঁহারা যখন কর্মস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন ডিস্‌পেপসিয়া-রোগাক্রান্ত পুরোহিত মহাশয় শুভকর্ম শেষ করিয়াছেন।

দুই বাড়ির গৃহিণীই উপস্থিত ছিলেন। কর্তাদের মূর্তি দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—'আ মরে যাই! বুড়ো মিন্‌ষেদের রকম ত্যাখ না! যেন সঙ্‌!'

মনে মনে

দ্বিজেনের কথা

আজ অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গেল।

মীনা দেরি হওয়া ভালবাসে না—তার মুখ একটু ভার হয়, চোখে গাম্ভীর্য ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটে ত কিছু বলবে না—কেবল ভেতরে ভেতরে জট পাকাবে। আশ্চর্য মেয়েমানুষের স্বভাব। এই পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে একদিনও মীনা ঝগড়া করলে না; রাগ হলেই মুখ টিপে থাকে, শুধু আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে, রাগ হয়েছে। কোপো যত্র ভ্রুকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনম্—

কিন্তু আজ আর রাগ হতে দিচ্ছি না। দেরি হবার কারণটা পকেট থেকে বার করে অন্যমনস্কভাবে টেবলের ওপর রাখলেই রাগ গলে জল হয়ে যাবে!

আজ অফিসে মাইনে পেলুম। পথে আসতে আসতে ভাবলুম, টাকা বাড়ি নিয়ে গেলে ত কিছুই থাকবে না, তার চেয়ে এই বেলা মীনার জন্যে একটা কিছু সৌখীন জিনিস কিনে নিয়ে যাই। সামনেই হীরালাল মতিলালের দোকানটা পড়ল—সেখানেই ঢুকে পড়লুম। বেশি কিনিনি, সামান্য ১৫৲ টাকা দামের একটি ব্রুচ—কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে। মীনা খুশি হবে।

বাড়িতে ঢুকে দেখলুম, মীনা একটা ডেক-চেয়ারে বসে নভেল পড়ছে। আমাকে দেখে ঘড়ির দিকে তীক্ষ্ণভাবে একবার তাকিয়ে বই নামিয়ে রেখে বললে,—"এলে ?"

এই ধরনের কথা আমার ভাল লাগে না। এলে? তার মানে কি? আমার আসাটা কি অভূতপূর্ব ব্যাপার, না আমার আজ ফেরবার কথাই ছিল না? আসলে খোঁচা দিয়ে কথা কওয়া মীনার একটা স্বভাব। আর দেরি হয়েছে ত হয়েছে কি? ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরব এমন লেখাপড়া ত কিছু করিনি।

একটা কোঁচানো কাপড় হাতের কাছে রেখে—'কাপড় ছাড়ো'—বলে মীনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অর্থাৎ আমার ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন সেটা জানিয়ে দিয়ে যাওয়া হল। বেশ, বিরক্ত হয়েছেন তা আর কি করব! তাই বলে আমি ত ঘড়ির কাঁটার মত চলতে পারি না। কলের পুতুল ত নই!

জামা কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে বসেছি, মীনা খাবার আর চা নিয়ে এসে সামনে রাখলে। আজ দেখছি আবার মোহনভোগ তৈরী হয়েছে। মনে আছে তা হলে। যাক ক্ষিদেটাও খুব পেয়েছে······

ও—তাই বলি! খাবার ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। বোধ হয় দুপুর বেলা কোনও সময় অবসর মত তৈরি করে রাখা হয়েছিল। তা ত হবেই, আমি মুটে-মজুর লোক, খেটে-খুটে এসে ঠাণ্ডা বাসি যা পাব তাই দিয়ে পেটের গর্ত বুজিয়ে ফেলব, খাবার একটা কিছু পেলেই হল, এর বেশি প্রত্যাশা করাই অন্যায়······যাক তবু চা-টা একটু গরম আছে। কি দরকার ছিল? ওটাও দুপুরবেলা তৈরি করে রাখলেই হত।

"আজ তোমার মাইনে পাবার দিন না?"

হুঁ—সে কথাটি ঠিক মনে আছে! পকেট থেকে বার করে দিয়ে বললুম,—"এই নাও।"

টাকা গুনে ভুরু তুলে বললে,—"পনেরো টাকা কম যে?"

কৈফিয়ৎ চাই! নিজের টাকা যদি খরচ করি, তাও পাই-পয়সার হিসেব দিতে হবে। দূর কর ছাই, সংসার করাই একটা ঝকমারি

বললুম,—"খরচ করেছি।"

সপ্রশ্নভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইল—অর্থাৎ এখনও কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হয় নি; কিসে খরচ করেছি, তা বলতে হবে! মীনার কি বিশ্বাস, আমি মদ খেয়ে টাকা উড়িয়ে দিয়েছি? না তার চেয়েও সাংঘাতিক আরও কিছু?

উঃ! মেয়েমানুষের মতন সন্দিগ্ধ মন পৃথিবীতে আর নেই। না, আমি বলব-না, কিছুতেই বলব না,—দেখি, ও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে কি না। যদিও জানি, তা কখনই করবে না; মনে মনে গেরো দেওয়া যে ওর স্বভাব।

জিজ্ঞাসা করলে কি অপমান হত, না আমি মিথ্যে কথা বলতুম? জিজ্ঞাসা করলেই ত আমায় বলতে হত যে, তোমার জন্যে গহনা কিনেছি।—বেশ, ভালই হল। কাল ঐ লক্ষ্মীছাড়া ব্রুচটা ফেরৎ দিয়ে আসব—বলব, পছন্দ হল না। মন্দ কি, ক-টা টাকা বেঁচে গেল।

টাকা নিয়ে দুপ দুপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দমাস করে আলমারির দরজা বন্ধ করা হল; মানে, আমি কি রকম চটেছি, তুমি দেখ!

ফিরে এসে আবার দূরের একটা চেয়ারে বসল। মুখে কথা নেই, আমাকে দেখেই বোধ হয় সব কথা ফুরিয়ে গেছে। পাঁচ মিনিট দুজনে চুপচাপ [illegible]ছি। ওঁর বোধ হয় আশা যে আমিই আগে কথা কইব। কিন্তু—কে[illegible] কইব? আমাকে চিরদিন আগে কথা কইতে হবে, তার কি মানে?

অনেকক্ষণ পরে কথা কইলেন,—"খবরের কাগজ পড়বে?"

হুঁ—খবরের কাগজ পড়ব! সোজা কথায় বললেই হয়, তোমার সংসর্গ আমার ভাল লাগছে না, তুমি যা হয় কর, আমি উঠে যাই। সমস্ত দিনের পর বাড়ি আসার কি চমৎকার সম্বর্ধনা! বোধ হয় নভেলটা শেষ হয় নি, তাই প্রাণ ছটফট করছে। তা আমি ত ধরে রাখিনি; 'ওগো, তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না' বলে কাঁদিও নি। গেলেই পারেন, ছুতো খোঁজবার দরকার কি?

মেয়েমানুষ জাতটার মত এমন কপট আর—; দূর হোক গে, এই জন্যেই লোকে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আমারও আর ভাল লাগছে না, অরুচি ধরে গেছে।

যাই, খানিকটা বেড়িয়ে আসি। বাড়ি ত নয়—সাহারা। এরই জন্যে মানুষ পাগল!

উঠে জামা পরতে পরতে বললুম,—"বেড়াতে যাচ্ছি।"

কোনও জবাব নেই। বহুত আচ্ছা, তাই সই। যখন জুতো পরে ছড়ি নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, তখন,—"বামুন ঠাকুরের আজ দুপুর থেকে জর—"

বামুন ঠাকুরের জর, তা আমি কি করব? আমি ধন্বন্তরি না কি? আসলে তা নয়, কথার তাৎপর্যটা গভীর—অনেক দূর থেকে আসছে। কোনও কোনও দিন বেড়িয়ে বাড়ি ফিরতে রাত্রি ন-টা বেজে যায়—আড্ডায় বসলে সহজে ওঠা যায় না—তাই চেতিয়ে দেওয়া হল। আজ উনি নিজে রাঁধবেন, আজ যেন ফিরতে দেরি না করি। আমার যেন নারী-শাসন তন্ত্রে বাস হয়েছে—সব সময় কড়া শাসন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেশবারও হুকুম নেই। বেশ, তাই হবে। সন্ধ্যে থেকেই ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে থাকব।

"বুঝেছি"—বলে বেরিয়ে পড়লুম।

... ...

ঠিক ন-টার সময় বাড়ি ফিরলুম। দেখি, গিন্নী রান্নাবান্না শেষ করে বসে আছেন। তখনই খেতে বসে গেলুম। কি জানি, যদি দেরি করি, আবার গোসা হতে কতক্ষণ!

গিন্নীটি আমার রাঁধেন ভাল। এই রান্নাই ত বামুনঠাকুর রাঁধে,—কিন্তু যেন যাচ্ছেতাই।

আমি ত কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, তবে মীনা একটুতেই অমন মুখ অন্ধকার করে কেন? যেন কত বকেছি। আচ্ছা, আমারই না হয় ঘাট হয়েছে, আমিই যেচে ভাব করছি।

খেয়ে উঠে মীনার হাত থেকে পান নিতে নিতে বললুম,—"উঃ—আজ কি গরম! রাত্রে ঘুম হলে হয়।"

মীনা মুখ টিপে বললে,—"বেশ, আমি না হয় মেঝেয় মাদুর পেতে শোব।"

কি কথার কি উত্তর!

নাঃ—এদের মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ—এরা সোজা কথা বলতে জানে না। উনি আমার পাশে শোন্, তাই আমার গরম লাগে, অতএব মেঝেয় মাদুর পেতে শোবেন! এত দিন যেন—কিন্তু কুছ পরোয়া নেই, সেই ভাল। একলা শুতে চান, আমার আপত্তি কি। আমিই না হয় নিচে বসবার ঘরে

তক্তপোশের ওপর শোব। কারুর কোনও অসুবিধে নেই—সব দিক দিয়েই ভাল। উনি সমস্ত ওপরতলাটা নিয়ে থাকুন।

বললুম,—"আমিই নিচে তক্তপোশে শোব। তোমার কষ্ট করবার দরকার নেই।"

তক্তপোশের ওপর নিজেই চাদর পেতে শুয়ে পড়লুম—কারুর সাহায্যের তোয়াক্কা রাখি না। উনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলবার ভান করে ওপরে চলে গেলেন।

দুনিয়াটাই ফাঁকি। এই যে দশটা-পাঁচটা অফিস করি,—কিসের জন্যে? এই ঘর-দোর, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পরিবার—সব মিথ্যে! মায়া! বেদান্ত ঠিক বলেছে—মায়া—

ঘুম আসছে, রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। ঘুমুই—দুত্তোর, কি হবে ও কথা ভেবে! যত সব······

অ্যাঁ!—কে—?

মিনতির কথা

সত্যি বাপু, এত দেরিই বা হয় কেন? পাঁচটার সময় ত অফিসের ছুটি হয়, তবে এতক্ষণ কি করেন? সারা দিনের পর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছেও হয় না?

আমরাই শুধু ভেবে মরি। মেয়েমানুষ কিনা! পুরুষমানুষের ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই। আমি যে সারাদিন একলা পড়ে থাকি, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। থাকবে কেন? দাসীবাঁদীকে কে কবে ভ্রূক্ষেপ করে!

আচ্ছা, এতক্ষণ কি করেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান? বিশ্বাস হয় না। তবে? কি জানি, বুঝতেও পারি না; ভাবতেও ভাল লাগে না।

আজ সকাল সকাল খাবার তৈরি করে চায়ের জল চড়িয়ে রেখেছি—ঠাণ্ডা খাবার খেতে পারেন না, আবার খাবার দিতে দেরি হলেও বিরক্ত হন—কিন্তু বুঝে বুঝে আজই দেরি করছেন। জানি ত ওঁকে—মাথার টনক নড়ে। আজ আমি ঠিক পাঁচটার সময় গরম খাবার তৈরি করে রেখেছি কিনা—আজ বোধ হয় ছ-টার আগে বাড়ি ঢোকাই হবে না।

কিছু বলতেও ভয় করে—এমন মুখ ভারী করে থাকবেন, যেন কি ভয়ানক অন্যায় কথাই বলেছি। কিচ্ছুটি বলবার জো নেই, অমনি পুরুষমানুষের পৌরুষে

ঘা লাগবে। মুখ এতখানি হয়ে উঠবে। ও রকম মুখ অন্ধকার করে থাকার চেয়ে বকাও ভাল। কেন বকেন না? বকলেই পারেন, ওরকম মুখ বুজে শাস্তি দেওয়া আমি সইতে পারি না।

ছ-টা বাজল, এখনও দেখা নেই। খাবারগুলো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কেন যে এত করে মরি, তাও জানি না। স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া, মনে দুঃখ দেওয়া ওদের স্বভাব। যাই, খাবারগুলো ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তৈরি করি গে। ও পান্তাভাত খেতে পারবেন কেন।

না, আজ সত্যি বকব। কেন উনি এত দোর করবেন? আমি কি কেউ নই? সমস্ত দিন পরে বাড়ি আসবেন, তাও দু'ঘণ্টা দেরি করে? কেন, বাড়িতে বাঘ আছে না ভালুক আছে? দিনান্তেও দেখতে ইচ্ছে করে না? আমার ত—, না পুরুষমানুষের সে সব বালাই নেই। সে শুধু এই পোড়া মেয়েমানুষের।

এই পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে, এক দিনের জন্যে কখনও বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছেও হয়নি। আর উনি? বোধ হয় আমি বাপের বাড়ি গেলেই খুশি হন। বেশ, তাই যাব। আমাকে যখন ভালই লাগে না তখন থেকেই কি আর না থেকেই কি?

ঐ যে আসা হচ্ছে। মুখ হাসি-হাসি। তা ত হবেই—কত ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে চেড়িয়ে আসা হল—মুখ হাসি-হাসি হবে না। আমাকে দেখলেই আবার মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে।

না, মনের ভাব প্রকাশ করব না, প্রকাশ করেই বা লাভ কি? আমার রাগ-অভিমান কে গ্রাহ্য করে? তার চেয়ে একখানা বই নিয়ে বসি—যেন কিছুই হয়নি।

উনি এসে বাড়ি ঢুকলেন। মুখে অনুতাপ বা লজ্জার চিহ্নমাত্র নেই, যেন দেরি করে এসে ভারি বাহাদুরি করেছেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সওয়া ছটা। বই মুড়ে রেখে খুব ঠাণ্ডা ভাবেই জিজ্ঞাসা করলুম—"এলে?"

অমনি মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, যেন কে সুইচ্ টিপে বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে দিলে।

কি বলেছি আমি? 'এলে' বলাতেই এত দোষ হল? তা ছাড়া আর কি বলতুম? যদি বলতুম, 'এত দেরি করে এলে কেন' তা হলেই কি ভাল হত?

তা নয়—আমাকে দেখেই মুখ অমন হয়ে গেল। আমি বাড়িতে না থাকলেই বোধ হয় খুশি হতেন।

কিন্তু তাই বলে আমি ত চুপ করে থাকতে পারি না। তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে খাবার আনতে গেলুম। খাবার ত যা হবার তাই হয়ে আছে, চায়ের জলও উনুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আমার যেমন কপাল, তেমনই ত হবে।

তাই এনে মুখের সামনে ধরে দিলুম। চোখ ফেটে জল আসতে লাগল। কি করব? এখন ত আর নতুন তৈরি করে দেবারও সময় নেই। খাবার মুখে দিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন। আমি কি করব—ওগো, আমি কি করব? কেন তুমি এত দেরি করে এলে? আমারই খালি দোষ?

আচ্ছা, আমারি দোষ, ঘাট হয়েছে। কিন্তু বকৃছ না কেন? অমন মুখ বুজে শাস্তি দেবার কি দরকার?

যাক, তবু চা-টা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। এবার অন্য কথা বলি, তবু যদি মনটা অন্য দিকে যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম—"আজ তোমার মাইনে পাবার দিন না?"

কথার জবাব দিলেন না, উঠে গিয়ে পকেট থেকে টাকা বার করে হাতে দেওয়া হল। যেন টাকার জন্যেই আমি মরে যাচ্ছিলুম, আমি খালি টাকাই চিনি। এ ত অপমান করা! টাকাগুলো জানালা গলিয়ে দূর করে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। উঃ—আমার মরণও হয় না!

টাকা গুনে দেখলুম—পনেরো টাকা কম। এই এক ঘণ্টার মধ্যে পনেরো টাকা কি করলেন? হাতে টাকা এলে আর রক্ষে নেই, অমনি নয়-ছয় করবেন। না বাপু, আমি আর পারি না। হয় ত কতকগুলো বই কিনে বসে আছেন কিম্বা কোনও বন্ধুকে ধার দেওয়া হয়েছে! বন্ধুকে ধার দেওয়া মানেই—

বললুম,—"পনেরো টাকা কম যে?"

উত্তর হল,—"খরচ করেছি"!

আমি যেন তা জানি না। খরচ না করলে টাকাগুলো কি পকেট থেকে ডানা মেলে উড়ে যাবে? মানে, কিসে খরচ করেছেন তা বলা হবে না।—সত্যিই ত, আমাকে বলতে যাবেন কেন? ওঁর নিজের টাকা নিজে খরচ করেছেন—আমাকে তার হিসেব দিলে যে অপমান হবে! আমি ত ওঁর কেউ নই—জানবার অধিকারও নেই।

যাই, টাকাগুলো ওপরে বন্ধ করে রেখে আস, নইলে এখনই হয় ত মনে করবেন—কি মনে করবেন উনিই জানেন। মনের মধ্যে গিঁট দেওয়া স্বভাব ত।

ফিরে এসে বসলুম। তবু মুখে কথা নেই। আচ্ছা, চুপ করে দুজন মুখোমুখি কতক্ষণ বসে থাকা যায়? আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন বললেই ত পারেন। আর, কথা কইতে ইচ্ছে না হয়, তাও খুলে বললেই হয়। না বাপু, মিছিমিছি অমন মুখ ভার করে থাকা আমার ভাল লাগে না।

খবরের কাগজটা টেবলের ওপর রাখা রয়েছে—বোধ হয় ঐটে পড়বার জন্যেই মন ছট্‌ফট্ করছে। তা পড়লেই ত পারেন। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবারই বা কি দরকার?

বললুম,—"খবরের কাগজ পড়বে?"

মুখখানা আরও অন্ধকার হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে পড়লেন—কাপড়-জামা পরতে লাগলেন। তার পর মুখ কালো করে বললেন,—"বেড়াতে যাচ্ছি।"

আবার কি অপরাধ করলুম?

বেশ, বেড়াতে যাচ্ছেন যান—আমার সঙ্গ এক মিনিটও ভাল লাগে না, সে ত আমি জানি—কিন্তু এ দিকে যে বামুন ঠাকুরটা দুপুর থেকে জ্বরে পড়েছে, কখন উনি এসে একফোঁটা ওষুধ দেবেন, এই পিত্যেশ করে রয়েছে। আর উনি ওষুধ না দিলে এ বাড়ির কারুর সারেও না অসুখ। এখন কি করি? উনি ত আড্ডায় চললেন, সেই সাড়ে ন-টার সময় ফেরা হবে। ততক্ষণ বামুনটা এক ফোঁটা ওষুধ পাবে না?

ভয়ে ভয়ে বললুম,—"বামুন ঠাকুরের আজ দুপুর থেকে জ্বর—"

'বুঝেছি' বলে বেরিয়ে গেলেন।

বুঝেছি মানে কি? বামুন ঠাকুরের জ্বর হয়েছে, এতে বোঝাবুঝির কি আছে? সব কথাই যেন হেঁয়ালি। পাঁচ বছর ঘর করছি বয়সও কম হল না, কিন্তু মনের অন্ত পেলুম না। না—আমার আর ভাল লাগে না, ইচ্ছে করে কোথাও চলে যাই।

কিন্তু যাবার কি উপায় আছে? চিরদিন ঘরে বন্ধ থাকবার জন্যে জন্মেছি, শেষ পর্যন্ত ঘরেই বন্ধ থাকব। বাইরের সমস্ত পৃথিবী ওঁদের, ঘরটি খালি আমাদের! তা আমি ত ঘরের বার হতে চাই না, কিন্তু উনি কেন

একদণ্ড ঘরে থাকবেন না? উনি থাকলে ত আমার আর কিছু দরকার হয় না।

বেশ, যেখানে ইচ্ছে থাকুন, যেখানে ভাল লাগে থাকুন। আমি একলাটি ঘর শুধুরে থাকলে ওঁর কি? পুরুষ মানুষ যে—পাথর দিয়ে তৈরী।

না, আর ভাবব না। যাই কাপড় ছেড়ে রান্না চড়াই গে। আচ্ছা, সারাদিন একলাটি থাকি—একটু দয়াও হয় না?

সেই ন-টা বাজল, তবে ফিরলেন। এক মিনিট আগে হবার যো নেই। সেখানে যে প্রাণের বন্ধুরা আছেন!

এসেই খেতে বসলেন—কথাবার্তা কিছু নেই। তবু দেখতে পাই, বাইরে থেকে ফিরলেই মুখখানা প্রফুল্ল হয়। হবেই তো। বাইরে কত মজা—কত বন্ধু, হবে না? আমার সঙ্গে হেসে কথা কইতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বেশ, আমিও কথা কইব না, শুনতে যখন ভালবাসেন না, তখন কাজ কি!

পান নিতে নিতে প্রথম কথা কইলেন। বললেন—"উঃ! আজ কি গরম! রাত্রে ঘুম হ'লে হয়।"

এ কথার মানে আমি আর বুঝতে পারি না? গরম এমন কিছু নয়—আমি পাশে শুই বলেই ঘুম হয় না! বেশ, তাই সই। আমি না হয় আলাদাই শোব—তাতে কি? এক বিছানায় শুতে যখন কষ্ট হয়, তখন আমি মেঝেতেই শোব।

বললুম—"আমি না হয় মেঝেয় মাদুর পেতে শোব।"

না, তাও হবে না। আমার সঙ্গে একঘরে শুতেও কষ্ট হবে! বললেন, —"আমিই নিচে তক্তপোশে শোব। তোমার কষ্ট করবার দরকার নেই।"

নিজে বিছানা পেতে শোওয়া হল। বেশ! বেশ!

আমার চোখের জল না দেখলে ওঁর যে প্রাণে শান্তি হয় না। একলা ঘরময় ঘুরে বেড়াই—আর কি করব! ঘুম ত চোখে আসবে না।

শোব? উনি নিচে তক্তপোশে পড়ে রইলেন—আর আমি—

এগারোটা বাজল; এতক্ষণে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারা দিন খেটে—

না, আমি পারব না—পারব না! কেন আমি দূরে দূরে থাকব? এই পাঁচ বছরের মধ্যে এক দিনও আলাদা শুয়েছি?…যাই, দেখি—

ঘুমিয়ে পড়েছেন। তক্তপোশের বিছানা—একটা তোশকও নেই, শুধু

সতরঞ্চি আর চাদর। শক্ত কাঠ গায়ে ফুটছে, তবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আচ্ছা, এ কেন? আমার ওপর রাগ করে নিজেকে শাস্তি দেওয়া—কি জন্যে?

পাশে শুতেই "অ্যাঁ, কে?"—বলে চমকে উঠলেন। তারপর তন্দ্রার ঘোরেই জড়িয়ে ধরে বললেন, "মীনা।"

এই ত রাগের বহর—ঘুমুলেই ভুলে যান!

আমি বললুম,—"চল, ঘরে শোবে চল।"

এইবার ভাল করে ঘুম ভাঙল, বললেন,—"না, আজ এইখানেই শুই এস। আর ওপরে উঠতে পারি না।"

সেই ভাল।

কিন্তু একটি বৈ মাথার বালিস যে নেই? তা—

আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না।

কুতুব-শীর্ষে

দুইজনে লুকাইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম যে সন্ধ্যার সময় কুতুব-মিনারের ডগায় উঠিয়া নিরালায় দেখা-সাক্ষাৎ করিব। প্রণয়ী-যুগলের নিভৃত মিলনের পক্ষে এমন উচ্চস্থান আর কোথায় আছে? এখান হইতে নিচের দিকে তাকাইলে মানুষগুলাকে পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর দেখায়।

তা ছাড়া, অন্য একটা কারণও ছিল। কুমারী বিন্ধ্যেশ্বরীর অর্থাৎ আমার বিন্দুর পিতা মহামহোপাধ্যায় জটাধর শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে পছন্দ করিতেন না। বিন্দুর সহিত বিন্দুর পূজ্যপাদ পিতার এই মতভেদের কারণ—আমি নাকি পরিপূর্ণভাবে সাহেব বনিয়া গিয়াছি; মনুষ্যত্ব এবং আরও কয়েকটা ষত্বণত্ব আমার একেবারেই লোপ পাইয়াছে। তাই আমাকে বিন্দুর সান্নিধ্যে দেখিলেই মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের শুঁয়াপোকার মত ভ্রূযুগল কপালের উপর কিলবিল করিয়া উঠিত। এবং তিনি গলার মধ্যে অস্ফুটস্বরে যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করিতেন তাহা দেবভাষা হইলেও সম্পূর্ণ প্রসাদগুণবর্জিত বলিয়াই আমার সন্দেহ হইত। শাস্ত্রী মহাশয় গোঁড়া হিন্দু, সুতরাং জবরদস্ত লোক—সম্প্রতি একটা প্রকাণ্ড কলেজের প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর লইয়া একান্তমনে কেবল কন্যাকে আগলাইতেছেন।

বিন্দুর বয়স আঠারো বৎসর; গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রী মহাশয় ইহা কিরূপে সহ্য করিতেছেন, প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার সহজ উত্তর আছে—ফলিত জ্যোতিষ মতে উনিশ বছর বয়সে বিন্দুর একটি প্রচণ্ড ফাঁড়া আছে, সেই ফাঁড়া উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জটাধর শাস্ত্রী কন্যার বিবাহ দিবেন না। তিনি কেবল তাহাকে হবিষ্য আহার করাইয়া বেদান্ত পড়াইতেছেন।

গতিক বুঝিয়া আমরা লুকাইয়া দেখা-শুনা আরম্ভ করিয়াছিলাম—কিন্তু তাহা এতই ক্ষণস্থায়ী যে তৃপ্তি হইত না। শেষে বিন্দুই এই মতলবটি বাহির করিয়াছিল। হবিষ্যান্ন ও বেদান্তের দ্বারা বুদ্ধি সম্ভবত মার্জিত হয়; কুতুব মিনারের শীর্ষে দেখা করিবার চাতুরী তাহার মস্তিষ্কেই উৎপন্ন হয়। ইহার পরম সুবিধা এই যে, জটাধর শাস্ত্রী কন্যাকে লইয়া সান্ধ্য ভ্রমণ উপলক্ষে কুতুব মিনারের মূল পর্যন্ত পৌঁছিবেন; কিন্তু তিনি বিপুলকায় ও বৃদ্ধ—কুতুব মিনারের ডগায় ওঠা তাঁহার কর্ম নয়; কন্যাটি তন্বী ও নবযৌবনা—সে পিতাকে নিচে ফেলিয়া ক্রীড়াচ্ছলে হাসিতে হাসিতে চক্রায়িত সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিয়া যাইবে। আর আমি পূর্ব হইতেই উপরে অপেক্ষা করিয়া থাকিব—

কৌশলটা বুঝিতে পারিয়াছেন?

কিন্তু এ কৌশলটাই এই কাহিনীর চরম প্রতিপাদ্য নয়—মুখবন্ধ মাত্র। কুতুব শীর্ষে যাহা ঘটিয়াছিল (রোমাঞ্চকর কিছু নয়; পাঠকপাঠিকা অযথা উৎসাহিত হইয়া উঠিবেন না) তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য। অবশ্য ঘটনার অকুস্থল যে দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠস্থিত স্বনামখ্যাত স্তম্ভ তাহা বোধ করি এতক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

যথাকালে দুই পকেটে নানাবিধ বিজাতীয় মিষ্টান্ন ভরিয়া লইয়া কুতুব-শীর্ষে আরোহণ করিলাম। একটু আগে আগে আসাই সমীচীন; ভাবী শ্বশুরমহাশয়ের সহিত মুখোমুখি দেখা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

উপরে উঠিয়া কিন্তু দেখিলাম, আমারও আগে আর একজন এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে! অপরিচিত একজন ছোকরা সাহেব। আমাকে দেখিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল।

ছোকরা আমারই সমবয়স্ক হইবে। সাধারণত ইংরেজদের চেহারা যেমন হয়—নাক মুখ ভাল নয়, অথচ বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ। অন্য সময় হইলে অবিলম্বে তাহার সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলিতাম; কিন্তু এ সময়ে

তাহাকে দেখিয়া মনটা খিঁচড়াইয়া গেল। তুমি বাপু কিজন্য এখানে আসিয়া উঠিলে? ভারতবাসীর সুখে বিঘ্ন করা ছাড়া আর কি তোমাদের অন্য কাজ নাই?

আকাশের মাঝখানে গোলাকৃতি চত্বর, কোমর পর্যন্ত পাঁচিল দিয়া ঘেরা—যেন প্রণয়-পাখীর নিভৃত একটি নীড়। এখানে ঐ বস্তুতান্ত্রিক ইংরেজ পাষণ্ড কী করিতেছে? বিন্দুর জন্য যে চকোলেট আনিয়াছিলাম, বিমর্ষভাবে তাহাই কয়েকটা খাইয়া ফেলিলাম। লোকটা চলিয়াও ত যায় না! একটু বুদ্ধি থাকিলে আমার অবস্থা বুঝিয়া নিজেই ভদ্রভাবে নামিয়া যাইত। কিন্তু কেবল ষাঁড়ের ডালনা খাইলে বুদ্ধি আসিবে কোথা হইতে?

লক্ষ্য করিলাম, সে ঘাড় ফিরাইয়া মাঝে মাঝে দেখিতেছে আমি চলিয়া গিয়াছি কি না। বোধ হয় কালা আদমি কাছে থাকার জন্য সাহেবের কষ্ট হইতেছে। উঃ! এই পাপেই ত আর্যাবর্ত ইহাদের হাত হইতে যাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু আমি যে রাগ করিয়া নামিয়া যাইব তাহারও উপায় নাই—বিন্দু আসিবে। নিচে—স্তম্ভের কটি বেষ্টন করিয়া আরও কয়েকটি রেলিং ঘেরা ব্যাল্‌কনি আছে বটে, কিন্তু সেখানে বিন্দুর সহিত একত্র দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বড় বেশি। শাস্ত্রী মহাশয় চক্ষুতে নিয়মিত সর্ষপ তৈল প্রয়োগ করিয়া দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অনাবশ্যক বজায় রাখিয়াছেন।

সিঁড়ির উপর দ্রুত লঘু পায়ের শব্দ! পরক্ষণেই কৌতুক-হাসি-ভরা মুখ। তারপরই বিন্দুর হাসি মিলাইয়া গেল। সে থমকিয়া সাহেবের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "এ আবার কে?"

বলিলাম, "একটা নৃশংস ইংরেজ। ইচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে সটান রেলিং ডিঙিয়ে ওকে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিই।"

বিষণ্ণভাবে বিন্দু আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজনে শূন্যের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছি। পকেট হইতে সমস্ত টফী, চকোলেট ও ক্যারামেল্‌ বাহির করিয়া বিন্দুকে দিলাম। তাহার মুখে হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু ম্রিয়মাণ হাসি। ক্ষুব্ধ মুখে সে টফী চিবাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "আজকের দিনটাই বৃথা গেল।"

বিন্দু বলিল, "বাবাকে এদিকে আনতে যে কত কষ্ট পেতে হয়েছে!—"

বুঝিতে পারিলাম, পিতৃদেবতাকে কুতুব মিনারের সন্নিকটে আসিতে রাজি করা বিন্দুর পক্ষে সহজ হয় নাই। এত আয়োজন, এত কৌশল—সব ব্যর্থ! আমি কটমট করিয়া সাহেবের দিকে তাকাইলাম।

এই সময় সাহেব একবার ঘাড় বাঁকাইয়া আমাদের দিকে চাহিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। বিন্দু এতক্ষণ তাহার মুখ দেখে নাই, এখন ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি। মনে পড়েছে—এই ছোঁড়াই ফ্যানির পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ফ্যানি কে?"

"আমাদের বাগানের পাঁচিলের ওপারে একজন ফৌজী সাহেব থাকে দেখনি? ফ্যানি তারই মেয়ে। এর সঙ্গে তার—"

"তা এখানে কেন? ফ্যানির কাছে গেলেই ত পারে।"

ফ্যানির কাছে কেন যাইতেছে না এই সমস্যা লইয়া কিছুক্ষণ তিক্ত মনে গবেষণা করিলাম।—ফ্যানি সম্ভবত উহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ঠিকই করিয়াছে—

বিন্দু নিচের দিকে একবার উঁকি মারিয়া হতাশ স্বরে বলিল, "বাবা ওপর দিকে চেয়ে আছেন; এবার নেমে যেতে হবে, নয় ত সন্দেহ করবেন—"

বিন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "বিন্দু—"

"আঃ—ও কি করছ! এখনি দেখতে পাবে লোকটা।"

মরীয়া হইয়া বলিলাম, "দেখুক গে। কোথাকার একটা বেআক্কেলে সায়েব রয়েছে বলে আমরা প্রাণ খুলে কথা কইতে পাব না! রইল ত রয়েই গেল। আমাদের কথা ত আর বুঝতে পারবে না।"

"না না—আজ না—সব মাটি হয়ে গেল! আমি যাই।" বিন্দু ছলছলে চোখে তাহার আশাহত হৃদয়টিকে আমার দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

"মুখপোড়া ড্যাকরা!"—সাহেবটার দিকে বারি-বিদ্যুৎ-ভরা একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দু নামিয়া গেল। আমি বজ্রগর্ভ অন্তর লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ক্রমে দেখিতে পাইলাম, বহুদূর নিম্নে বিন্দু ও তাহার পিতাকে লইয়া মোটর চলিয়া গেল। তখন আমিও শেষবার সাহেবকে রোষকটাক্ষে ভস্মীভূত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নামিবার উপক্রম করিলাম। সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত গিয়াছি—

"মশায়, শুনুন—"

পশ্চাতে শূলবিদ্ধবৎ ফিরিলাম।

সাহেব হাতজোড় করিয়া সলজ্জ স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরিষ্কার বাংলায় বলিল, "আমাকে মাপ করতে হবে।"

কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া বলিলাম, "কি ভয়ানক! অর্থাৎ—আপনি বাংলা বলছেন যে! মানে—তবে কি আপনি ইংরেজ নয়?" বিন্দুর সহিত সায়েব সম্বন্ধে কি কি কথা হইয়াছিল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

সায়েব বলিল, "ইংরেজ বটে, কিন্তু বাংলা জানি।—পাঁচ বছর বয়স থেকে শান্তিনিকেতনে পড়েছি।…কিন্তু সে যাক। আপনারা নিশ্চয় ভেবেছেন আমি একটা অসভ্য বর্বর, কিন্তু মাইরি বলছি—আমার চলে যাবার উপায় ছিল না।" বলিয়া সায়েব সলজ্জে মাথা নিচু করিল।

বিস্মিতভাবে বলিলাম, "ব্যাপার কি?"

"আমিও—" সাহেব হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল,—"আপনার উনি—অর্থাৎ যে মহিলাটি এসেছিলেন তিনি ঠিক ধরেছেন—ফ্যানির সঙ্গে আমার—"

"এইখানে দেখা করবার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ।—আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম!"

ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি ফ্যানি বেদান্ত এবং হবিষ্যান্নের ভক্ত কি না। কিন্তু বলিলাম, "আপনাদের এত দূরে আসার কি দরকার? বাড়িতেই তো—"

ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িয়া সায়েব বলিল, "আপনি ফ্যানির বাবাকে জানেন না—একটি আস্ত কাট-গোঁয়ার। একেবারে পাকা সায়েব। তাঁর বিশ্বাস আমি একেবারে নেটিভ্ হিন্দু হয়ে গেছি, ফ্যানিকে আমার সঙ্গে মিশতে দিতে চান না। তাই আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে—"

মহানন্দে সায়েবের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, "বন্ধু, এসো শেক্‌হ্যাণ্ড করি। আর যদি দেশী মতে কোলাকুলি করতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই।"

কোলাকুলি শেষ হইলে সায়েব বলিল, "কেন যে ফ্যানি এলো না—হয়ত বুড়োটা…।"

এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত লঘু জুতার খুটখুট শব্দ! পরক্ষণেই একটি তরুণী ইংরেজ মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া প্রায় সায়েবের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "ও জিমি, অ্যাম্ আই ভেরি লেট্? বাট্ ড্যাডি—ওঃ!"

আমাকে দেখিয়া মেয়েটির মুখের হাসি নিবিয়া গেল; জিমির বুকের নিকট হইতে ইঞ্চিখানেক সরিয়া খাটো গলায় বলিল, "হোয়াট্‌স্ হি ডুয়িং হিয়ার?"

জিমি অপ্রস্তুতভাবে আমার পানে চাহিয়া হাসিল। আমি বলিলাম, "জিমি, চললুম ভাই, আর থাকছি না—তোমাদের মিলন মধুময় হোক্।"

কুতুবশীর্ষ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া গেলাম।

ঝি

বংশে সাত পুরুষে কেহ চাকরি করে নাই; তাই প্রথম চাকরি পাইয়া ভয় হইয়াছিল, না জানি কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ভাগ্যে আছে।

মার্চেণ্ট আফিসে কেরানির চাকরি। যাঁহার চেষ্টায় ও সুপারিশে চাকরি পাইয়াছিলাম তিনি আফিসের বড়বাবু, আমার পিতৃবন্ধু—নাম গণপতি সরকার। ভেল্‌কি-টেল্‌কি দেখাইতে পারিতেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় সহজেই চাকরি জুটিয়াছিল। এমন কি আমাকে কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও করিতে হয় নাই।

গণপতিবাবুর চেহারাটি ছিল তাঁহার পাকানো উড়ানি চাদরের মতই ধোপদুরস্ত এবং শীর্ণ নমনীয়তায় বঙ্কিম; তাঁহাকে নিংড়াইলে এক বিন্দু রস বাহির হইবে এমন সন্দেহ কাহারও হইত না। ক্রমশ জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি বিলক্ষণ রসিক লোক, কিন্তু তাঁহার সরসতা ছিঁচকে চোরের মত এমন অলক্ষ্যে যাতায়াত করিত যে সহসা ধরা পড়িত না।

তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলিবার পর তিনি মাঝে মাঝে মুখের বামভাগে একপ্রকার ভঙ্গী করিতেন; তাহাতে তাঁহার অধরোষ্ঠের প্রান্ত হইতে চোখের কোণ পর্যন্ত গালের উপর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাঁজ পড়িয়া যাইত। এই ভঙ্গীটাকে হাসিও বলা যায় না, মুখ-বিকৃতি বলিলেও ঠিক হয় না—

যেদিন প্রথম আফিস করিতে গেলাম, গণপতিবাবু আমার সাজপোশাক পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আর সব ঠিক আছে, কিন্তু লপেটা চলবে না; কাল থেকে শু পরে আসবে। চলো, তোমাকে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে

আনি। সাহেবের সামনে বেশি কথা কইবে না; তিনি যদি রসিকতা করেন, বিনীতভাবে মুচকি হাসবে।”

বলিয়া তিনি গালের ভঙ্গী করিলেন।

বেশ ভয়ে ভয়েই সাহেবের সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া কিন্তু একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। সায়েব মোটেই নয়—ঘোরতর কালা আদমি। চণ্ডীর মহিষাসুরকে জলজ্যান্ত নরমূর্তিতে কল্পনা করিলে ইহার চেহারাখানা অনেকটা আন্দাজ করা যায়; বেঁটে, মোটা, গজস্কন্ধ, চক্ষু দুটি কুঁচের মত লাল, তাহার উপর বিলাতী পোশাক পরিয়া অপূর্ব খোলতাই হইয়াছে! বয়স অনুমান করা কঠিন, তবে চল্লিশের নিচেই। প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে বসিয়া একমুখ পান চিবাইতেছেন এবং দেশলাইএর কাঠি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছেন।

পরে জানিতে পারিয়াছিলাম মিস্টার ঘনশ্যাম ঘোষ একজন অতি তুখড় ও কর্মনিপুণ ব্যবসায়ী, বছরে বার দুই বিলাত যান; সেখানে কোম্পানির বিলাতী কর্তৃপক্ষ তাঁহার কথায় ওঠে বসে। বস্তুত, বিলাতী সওদাগরী আফিসে একজন বাঙালীর এমন অখণ্ড প্রতাপ আর কখনও দেখা যায় নাই।

আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এমন ব্যবহার করিলেন যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভয় ত দূর হইলই, ইনি যে একজন অত্যন্ত কদাকার ব্যক্তি একথাও আর মনে রহিল না! কথার অমায়িকতায় মুহূর্ত মধ্যে আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন।

“এই যে বড়বাবু, এটি বুঝি আপনার নতুন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট? বেশ বেশ।··· দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে;—ব’সো।··বড়বাবু, আপনি আপনার কাজে যান না··· বিয়ে করেছ? বেশ বেশ, আরে, তোমাদেরই ত বয়েস। এখন চাকরি হল, আর কি! মন লাগিয়ে কাজ করবে—ব্যস, দেখতে দেখতে উন্নতি; আমার আফিসে কাজের লোক পড়ে থাকে না...নাও, পান খাও···আরে, লজ্জা কিসের? তোমরা হলে ইয়ং ব্লাড, নতুন বিয়ে করেছ, পান খাও তা কি আর আমি জানি না? আমার আফিসে ডিসিপ্লিনের অত কড়াকড়ি নেই··· নাও নাও—হে হে হে···”

তারপর সুখস্বপ্নের মত দিনগুলি কাটিতে লাগিল। চাকরি যে এত মধুর তাহা কোনদিন কল্পনা করি নাই। কাজকর্ম এমন কিছু নয়, একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দুঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দিনের কাজ শেষ করিয়া

ফেলিতে পারে। তারপর অখণ্ড অবসর, সমবয়স্ক সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প-গুজব, বারান্দায় গিয়া সিগারেট টানা। কর্তা প্রায়ই ডাকিয়া পাঠান, তাঁহার সামনে চেয়ারে গিয়া বসি, তিনি পান দেন, খাই; কখনও বাড়ি হইতে ভাল পান সাজাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিই। তিনি খুশি হইয়া খুব রঙ্গতামাসা করেন; কখনও বা রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার হাসি-তামাসা একটু আদিরস-ঘেঁষা হইলেও, ভারি উপাদেয়। বস্তুত, তিনি যে অত্যন্ত নিরহংকার অমায়িক প্রকৃতির মানুষ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না।

গণপতিবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেন, "ওহে বাবাজি, একটু সামলে চ'লো। কর্তা তোমাকে ভাল নজরে দেখেছেন খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু যতটা রয়-সয় ততটাই ভাল। আস্কারা পেয়ে যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলো না—নিজের পোজিশন বুঝে চ'লো। কর্তা লোক খারাপ নয়, কিন্তু কথায় বলে—বড়র পিরিতি বালির বাঁধ…"

লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি কর্তার সহিত প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ একেবারে খাঁটি রাখিয়াছিলেন। কর্তা তাঁহার সহিতও হাস্য-পরিহাস করিতেন, কিন্তু তিনি বিনীত ভাবে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি ছাড়া আর কোন উত্তরই দিতেন না।

মাস তিনেক কাটিবার পর একদিন দুপুরবেলা অবকাশের সময় কর্তার ঘরে গিয়াছি; ঘরে পা দিয়াই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিলাম। কর্তা নিজের চেয়ারে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া ছিলেন, আমার সাড়া পাইয়া চোখ তুলিলেন। তাঁহার চোখ দেখিয়া থমকিয়া গেলাম। জবাফুলের মত লাল চোখে আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি চাও? এ ঘরে তোমার কি দরকার?"

তাঁহার এ-রকম কণ্ঠস্বর কখনও শুনি নাই, থতমত খাইয়া গেলাম, "আজ্ঞে—আমি..."

তিনি লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিলেন, "পান চিবুতে চিবুতে পাঞ্জাবি উড়িয়ে আফিস করতে এসেছ ছোকরা? এটা তোমার শ্বশুরবাড়ি পেয়েছ বটে! গায়ে ফুঁ দিয়ে ইয়ার্কি মেরে বেড়াবার জন্যে আমি তোমাকে মাইনে দিই? যাও, টুলে বসে কাজ করোগে। তোমার মত পুঁচকে কেরানি খবর

না দিয়ে আমার ঘরে ঢোকে কোন্ সাহসে? ফের যদি এ-রকম বেচাল দেখি, দূর করে দেব…"

হোঁচট খাইতে খাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।—এ কি হইল?

নিঃসাড়ে নিজের জায়গায় গিয়া বসিলাম। অভিভূতের মত আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

আমি নূতন লোক, তাই বড়বাবুর পাশেই আমার আসন। চোখ তুলিয়া দেখিলাম তিনি গভীর মনঃসংযোগে খস্‌খস্ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন, আর সকলে নিজ নিজ কাজে মগ্ন, কেহ মাথা তুলিতেছে না। আমি কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "কি হয়েছে, কাকাবাবু?"

তিনি লেখা হইতে চোখ না তুলিয়াই চাপা গলায় বলিলেন, "কাজ করো—কাজ করো…"

সেদিন সন্ধ্যার পর গণপতিবাবুর বাসায় গেলাম। তক্তপোশের উপর বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন, সদয়কণ্ঠে বলিলেন, "এসো বাবাজি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; লজ্জায় ধিক্কারে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শেষে অতি কষ্টে বলিলাম, "কি হয়েছে আমায় বলুন! আমার কি কোনও দোষ হয়েছে?"

তিনি বলিলেন, "না—তোমার আর দোষ কি? তবে বলেছিলুম, বড়র পিরিতি বালির বাঁধ…"

"এর মধ্যে কোনও কথা আছে। আপনি আমাকে সব খুলে বলুন, কাকাবাবু।"

তিনি কিছুক্ষণ একমনে ধূমপান করিলেন।

"খুলে বলবার মত কথা নয়, বাবাজি।"

"না, আপনাকে বলতে হবে। কেন উনি আজ আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করলেন?"

তিনি দীর্ঘকাল নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন; কেবল তাঁহার গালে মাঝে মাঝে খাঁজ পড়িতে লাগিল।

"বলুন, কাকাবাবু!"

"তুমি ছেলের মতন, তোমার কাছে বলতে সংকোচ হয়। আসল কথা

—ঝি।" বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন; তাঁহার গালে একটা বড় রকম খাঁজ পড়িল।

কিন্তু—ঝি! কথাটা ঠিক শুনিয়াছি কি না বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বললেন—ঝি?"

গণপতিবাবু ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, কদিন থেকে বড় সায়েবের মন ভাল যাচ্ছে না···আয়া জানো—আয়া? যে-সব ঝি সায়েবদের ছেলে মানুষ করে? আমাদের বড় সাহেবের ছেলের আয়া হপ্তাখানেক হল চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।"

মাথা গুলাইয়া গেল; গণপতিবাবু এ সব আবোলতাবোল কি বলিতেছেন? বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিলাম, "কিন্তু—কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।"

গণপতিবাবু তখন বুঝাইয়া দিলেন। স্পষ্ট কথায় অবশ্য কিছুই বলিলেন না, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে, অর্থপূর্ণ ভ্রূ-বিলাসে, সময়োচিত নীরবতায় এবং গালের বিচিত্র ভঙ্গীদ্বারা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সংক্ষেপে ব্যাপার এই—আমাদের বড়সাহেব বছর তিনেক আগে বিপত্নীক হন; তাঁহার পত্নী একটি পুত্র প্রসব করিয়া সূতিকাগৃহেই মারা যান। তারপর হইতে শিশুকে লালনপালন করিবার জন্য ঝি—অর্থাৎ আয়া রাখা হয়। সেই ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ঘনশ্যামবাবু অত্যন্ত যত্নসহকারে ঝি নির্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও কারণে ঝি মনের মত না হইলে, কিংবা ছাড়িয়া গেলে সাহেবের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, এমন কি তাঁহার স্বভাবই একেবারে বদলাইয়া যায়। গত কয়েক মাস একটি ক্রিশ্চান যুবতী কাজ করিতেছিল, কিন্তু সে হঠাৎ বিবাহ করিবার অজুহাতে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; অথচ মনের মতন নূতন ঝি পাওয়া যাইতেছে না। তাই এই অনর্থ।

থ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এও কি সম্ভব! এই কারণে মানুষের চরিত্রে এমন পরিবর্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু গণপতিবাবু ত গুল মারিবার লোক নহেন। তবু এক সংশয় মনে জাগিতে লাগিল।

বলিলাম, "কিন্তু উনি আবার বিয়ে করেন না কেন?"

এ প্রশ্নের সদুত্তর গণপতিবাবু দিলেন।—ঘনশ্যামবাবুর শ্বশুর অদ্যাপি জীবিত; তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রকাণ্ড জমিদার। তাঁহার সন্তানসন্ততি কেহ জীবিত নাই, এই দৌহিত্রই—অর্থাৎ ঘনশ্যামবাবুর পুত্রই—তাঁহার

উত্তরাধিকারী। কিন্তু শ্বশুরমহাশয় জানাইয়া দিয়াছেন যে, জামাতা বাবাজি যদি পুনরায় বিবাহ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া এক দূরসম্পর্কের ভাগিনেয়কে সেবায়েৎ নিযুক্ত করিবেন।

সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল। তবু একটা গোলচোখো রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিল। এমন সব ব্যাপার যে দুনিয়ায় ঘটিয়া থাকে তাহার অভিজ্ঞতা তখন একেবারেই ছিল না।

তারপর পাঁচ ছয় দিন কাটিল। আফিসে যতক্ষণ থাকি, কাঁটা হইয়া থাকি; কি জানি কখন আবার মাথার উপর হুড়মুড় শব্দে আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে! ইতিমধ্যে দু-তিন জন সহকর্মীর সামান্য ত্রুটির জন্য অশেষ লাঞ্ছনা হইয়া গিয়াছে। চাকরি যে কী বস্তু তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেদিন আফিসে গিয়া সবেমাত্র নিজের আসনে বসিয়াছি, আর্দালি আসিয়া খবর দিল বড়সাহেব তলব করিয়াছেন। প্লীহা চমকাইয়া উঠিল। এই রে, না জানি কোথায় কি ভুল করিয়া বসিয়াছি, আজ আর রক্ষা নাই!

ফাঁসির আসামির মত কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকিলাম। তিনি নিজের চেয়ারে বসিয়া হেঁটমুখে দেরাজ হইতে কি একটা বাহির করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই প্রফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে শৈলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে ভাল জর্দা আনিয়েছি—দেখ দেখি খেয়ে; মুক্তো-ভস্ম মেশানো জর্দা হে—বড় গরম জিনিস!—হে হে হে···"

দেড় ঘণ্টা ধরিয়া এই ভাবে চলিল—যেন এ মানুষ সে মানুষ নয়। ইনি যে কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে পারেন তাহা কল্পনা করাও কঠিন। কোথায় সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত হিংস্র দৃষ্টি, কোথায় সে কর্কশ দুঃসহ গলার আওয়াজ! তিনি আবার আমাকে তাঁহার সহৃদয়তার প্রবল প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি মন্দ লোক একথা আর কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।

ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিতে বসিতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিলাম, "কাকাবাবু, ব্যাপার কি?"

গণপতিবাবুর কলমে একগাছি চুল জড়াইয়া গিয়াছিল, সেটিকে নিব্ হইতে সন্তর্পণে মুক্ত করিয়া তিনি অবিচলিতভাবে আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই ঘষা গলায় বলিলেন, "ঝি পাওয়া গেছে।"

বলিয়া গালের ভঙ্গী করিলেন।

টুথ-ব্রাশ

প্রসঙ্গটি বৈষয়িক। অপিচ মনুস্তত্ত্ব-যৌনতত্ত্বের সঙ্গেও ইহার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে।

রসশাস্ত্র বিষয়বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের মৌলিক মূল্য লইয়া দর-কষাকষি রসের হাটে চলিবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। 'হিউম্যান্ ভ্যালুস্' কথাটা শুধু বিদেশী নয়, অত্যন্ত অর্বাচীন।

... ...

সুবোধবাবুর মস্তকে একটি অত্যাশ্চর্য টাক ছিল। টাক সাধারণত মস্তকের সম্মুখভাগে বঙ্গোপসাগরের আকারে পড়িয়া থাকে; ইহাই রীতি। সুবোধবাবুকে দেখিয়া কিন্তু কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না যে, তাঁহার টেরি-কাটা মস্তকের সমস্ত পশ্চাদ্ভাগটা উষর নির্লোমতায় একেবারে ধূ ধূ করিতেছে। তাঁহার চরিত্রেও, বোধ করি, এমনই একটা ধোঁকা-লাগানো অ-গতানুগতিক বৈচিত্র্য ছিল, সম্মুখ দেখিয়া সহসা পশ্চাতের খবর পাওয়া যাইত না।

আমার সহিত অল্পদিনের জন্যই আলাপ হইয়াছিল; পশ্চিমের যে শহরে আমি বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তিনি ছিলেন সেই শহরের একজন উন্নতিশীল ব্যবসাদার। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, ধীর প্রিয়ভাষী লোক, অত্যন্ত সাধারণ কথাও বেশ রস দিয়া বলিতে পারিতেন। আলাপের পূর্বে অন্য পাঁচজনের মুখে তাঁহার অখ্যাতি-সুখ্যাতি দুই-ই শুনিয়াছিলাম; তাহা হইতে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ব্যবসা-সম্পর্কে তিনি যেমন নিষ্ঠুর, তৎপূর্বে ও পরে তেমনই অমায়িক।

বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাঁহার সংস্পর্শে আসি নাই বলিয়াই, বোধ হয়, সুবোধবাবুকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। কার্পণ্য-দোষ তাঁহার ছিল না; প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়িতে বহু ভদ্রবেশী অভ্যাগতের ভিড় জমিত। সুবোধবাবুর আধুনিকা ও সুচটুলা স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া একটি সামাজিক আসর গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন; তাঁহার মোলায়েম হাসি-তামাসা এই সান্ধ্য সভার একটা উপভোগ্য উপাদান ছিল।

কেন জানি না, তাঁহাকে এই মজলিসের বায়ুমণ্ডলে রবারের রঙিন বেলুনের মত নির্লিপ্ত সহজতায় ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিয়া আমার মনে হইত, যেন

তিনি মনের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেক কথা ও কার্য ওজন করিতেছেন, তাহার মূল্য ধার্য করিতেছেন। এ বিষয়ে মুখে তিনি কিছুই বলিতেন না, তবু তাঁহার মনের এই তুলাদণ্ডটি যে সর্বদা সক্রিয় হইয়া আছে, তাহা অনুভব করিয়া আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতাম।

একদিন তিনি মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, আপনি ছড়ি ব্যবহার করেন কেন, বলুন দেখি?"

যুক্তিসম্মত কোনও উত্তরই ছিল না! বেড়াইতে বাহির হইবার সময় একটা ছড়ি হাতে না থাকিলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ও নিঃসম্বল মনে হয়—এইটুকুই বলিতে পারি।

তাহাই বলিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমার পানে সেই ওজনকরা দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার কাছে এই অকারণ ছড়ি বহন করিয়া বেড়ানো যে একান্ত অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।

মনুষ্যচরিত্রের গূঢ় মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা হয়ত সুবোধবাবুর বিচিত্র টাক ও অন্যান্য বাহ্য অভিব্যক্তি হইতে তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন, কিন্তু এক মাসের পরিচয়ের ফলে তিনি আমার কাছে যেন একটু আবছায়া রহিয়া গিয়াছেন। এমন কি, শেষের যে গুরুতর ঘটনাটা একসঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের মত তাঁহার মাথার উপর ফাটিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উগ্র আলোকেও লোকটিকে স্পষ্টভাবে চিনিতে পারি নাই। হয়ত আমারই নির্বুদ্ধিতা, কোনও বস্তুকে যাচাই করিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিবার বিদ্যা এত বয়সেও অর্জন করিতে পারি নাই। অথচ শুনিয়াছি, এই বিদ্যাটাই নাকি চরম বিদ্যা—শিক্ষা, সংস্কৃতি, এমন কি দর্শন-শাস্ত্রেরও শেষ সাধনা।

... ...

গুরুতর সংবাদটি আমাকে যিনি প্রথম দিলেন, তিনি সম্ভবত সুবোধবাবুর ব্যবসায়-ঘটিত বন্ধু; উত্তেজনা-উদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, "খবর শুনেছেন বোধ হয়?"

"কিসের খবর?"

"শোনেন নি তা হলে!"—হাস্যোজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি আকাশের পানে তুলিয়া তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, "বড়ই দুঃসংবাদ। সুবোধবাবুর স্ত্রী—, তাঁকে কাল রাত্তির থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সেকি ! কোথায় গেলেন তিনি ?"

"যা শুনছি—এক ছোকরা খুব ঘন ঘন যাতায়াত করত, তার সঙ্গেই নাকি কাল রাত্রে—।" তাঁহার বাম চক্ষুটি হঠাৎ মুদিত হইয়া গেল।

মোটের উপর খবরটা যে মিথ্যা নয়, তাহা আরও কয়েকজন জানাইয়া গেলেন। কেহ স্ত্রী-স্বাধীনতার ধিক্কার দিলেন ; কেহ বা গলা খাটো করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, ঠিক এই ব্যাপারটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পুরা এক বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির মস্তকের পশ্চাদ্দিকে টাক, এবং বক্ষেয়া টাকা না পাইলে স্বজাতি বাঙালীর নামে যে মোকদ্দমা করিতে দ্বিধা করে না, তাহার স্ত্রী যে—ইত্যাদি।

সুবোধবাবুর কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল। নিরপরাধ হইয়াও যাহারা অপরাধীর অধিক লজ্জা ভোগ করে, তাঁহার অবস্থা তাহাদেরই মত। সহানুভূতি জানাইবার বন্ধুর হয়ত অভাব হয় না, কিন্তু মুখের সহানুভূতিকে চোখের বিদ্রূপ যেখানে প্রতি মুহূর্তে খণ্ডিত করিয়া দিতেছে, সেখানে সহানুভূতির মত নিষ্ঠুর পীড়ন আর নাই। তাই মজা-দেখা বন্ধুর মত সমবেদনার ছুতায় তাঁহার বাড়িতে গিয়া ধৃষ্টতা করিতে সংকোচ বোধ হইতে লাগিল।

তবু না গিয়াও থাকিতে পারিলাম না। মনের গহনে একটা নিষ্ঠুর শ্বাপদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুবোধবাবুর মর্মপীড়া প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সে-ই বোধ হয় সন্ধ্যার সময় আমাকে তাঁহার বাড়িতে টানিয়া লইয়া গেল।

অন্য দিনের মত বাড়িতে মজলিসী বন্ধুরা কেহ নাই। বারান্দায় একাকী বসিয়া সুবোধবাবু মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে হাত বুলাইতেছেন ; আমাকে দেখিয়া অন্যান্য দিনের মত সহাস্য সমাদরে আহ্বান করিলেন, "আসুন আসুন !"

স্ত্রী কুলত্যাগ করিলে মানুষ ঠিক কি-ভাবে আচরণ করিয়া থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সুবোধবাবুর ভাবগতিক স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না। যেন কিছুই হয় নাই। হাসিমুখে দুই চারিটা সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা, এমন কি একবার একটা রসিকতা পর্যন্ত করিয়া ফেলিলেন।

বেজায় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। যাঁহার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছি, তিনি যদি দুঃখটাকে গায়েই না মাখেন, তবে সান্ত্বনা দিব কাহাকে ? অপদস্থের মত নীরবে হেঁটমুখে বসিয়া রহিলাম, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিতেই পারিলাম না।

দিনের আলো নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার

পর এক সময় চোখ তুলিয়া দেখিলাম, সুবোধবাবু তাঁহার তৌল-করা চক্ষু দিয়া আমার মনের কথাটা ওজন করিতেছেন। মুখে একটু হাসি।

চোখোচোখি হইতেই তিনি মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; তারপর বাগানের একটা ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের ডগার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার টুথ-ব্রাশটা কে চুরি করে নিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।"

অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে চমকিয়া উঠিলাম, মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, "টুথ-ব্রাশ!"

তিনি তেমনই অর্ধ-নির্লিপ্তভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, টুথ-ব্রাশ। তুচ্ছ জিনিস, সংসারযাত্রা নির্বাহের একটা সামান্য উপকরণ; যে লোকটা চুরি করেছে, তার রুচির প্রশংসা করতে পারি না। কিন্তু তবু সাবধান হওয়া দরকার। ভাবছি, আর টুথ-ব্রাশ কিনব না।"

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। আমার দিকে সহসা চক্ষু নামাইয়া তিনি বলিলেন, "আপনি কখনও দাঁতন ব্যবহার করেছেন? শুনেছি, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ভাল। মনে করছি, এবার থেকে ইউক্যালিপ্টাসের দাঁতন ব্যবহার করব। সস্তাও হবে, আর কিছু না হোক, চুরি যাবার ভয় থাকবে না। দাঁতন কেউ চুরি করবে না!"—বলিয়া হঠাৎ একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

....

তারপর সুবোধবাবুর সহিত আর দেখা হয় নাই। তবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাঁহার নাম দেখিতে পাই; তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মোহমুক্ত বিষয়বুদ্ধি তাঁহাকে বৈষয়িক উন্নতির পথেই লইয়া চলিয়াছে।

তিনি আবার টুথ-ব্রাশ কিনিয়াছেন, অথবা দাঁতন দিয়াই কাজ চালাইতেছেন; সে সংবাদ কিন্তু খবরের কাগজে পাই নাই।

আরব সাগরের রসিকতা

আরবদেশের হাস্যরসের সহিত পরিচয় নাই; কিন্তু একবার আরব সাগরের রসিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম।

অনেক দিন ধরিয়া আরব সাগরের তীরে বাস করিতেছি, কিন্তু এক দিনও সমুদ্র স্নান হয় নাই। বন্ধুরা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন। গৃহিণীর আধুনিকা বান্ধবীরাও যে-ভাবে কথা কহিতেছিলেন, তাহা তাঁহার শ্রুতিমধুর লাগিতেছিল না,—"এত দিন বম্বে-তে আছেন, সী-বেদিং করেননি?...... ভয় করে বুঝি? তা করবারই কথা—যারা আগে কখনও সমুদ্র দেখেনি, তাদের ভয় করবে বৈ কি।"

একদিন গৃহিণী বলিলেন, "ওগো, সমুদ্রে স্নান না করলে আর ত মান থাকে না। চলো এক দিন।"

আমি বলিলাম, "বেশ ত, চলো। কিন্তু বেদিং কস্ট্যুম্ কিনতে হবে যে।"

গৃহিণী উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ওই বেহায়া পোশাক পরে আমি নাইবো? কেটে ফেললেও না।"

"কিন্তু—"

গৃহিণী কিন্তু সতেজে ঐ বিলাতী বর্বরতা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি গঙ্গায় স্নান করিয়াছেন, পদ্মায় স্নান করিয়াছেন—সমুদ্রে তাঁহার ভয় কি? তিনি বাঙালীর কুলবধূ, নিজের চিরাভ্যস্ত সাজ-পোশাকেই স্নান করিবেন। যে যা খুশি বলুক।

ভালই হইল। বেদিং কস্ট্যুমের আজকাল দাম কম নয়। একটা দমকা খরচ বাঁচিয়া গেল।

সমুদ্র আমার বাড়ি হইতে পোয়াটাক মাইল দূরে। ইতিপূর্বে কয়েক বার বীচে বেড়াইতে গিয়াছি; স্থানটা দেখাশুনা আছে। বেশ নির্জন স্থান; তবে সকালে-সন্ধ্যায় স্নানার্থীর ভিড় হয়। আমরা পরামর্শ করিয়া পরদিন ঠিক দুপুরবেলা বাহির হইলাম। এই সময়টায় ভিড় থাকে না। সমুদ্রের সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতা একটু নিভৃতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখন জানিতাম না যে, সে দিন ঠিক দুপুরবেলাই জোয়ার আসিবার সময়।

বীচে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দিঙ্‌মণ্ডল পর্যন্ত সমুদ্র যেন মাতাল হইয়া টলমল করিতেছে! বড়-বড় ঢেউ বেলাভূমিকে আক্রমণ করিতেছে, বালুর উপর শুভ্র ফেনের একটা সীমা-রেখা আঁকিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ।

বীচে কেহ নাই। এপাশে ওপাশে অনেক দূরে জলের মধ্যে দু-একটা মুণ্ড উঠিতেছে নামিতেছে দেখিলাম। বীচের পিছনে নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে এঁকসারি ছোট ছোট কেবিন; যাহারা নিয়মিত সমুদ্র-স্নান করিতে চায়, তাহারা ঐ কেবিন ভাড়া লয়।

এক শ্বেতাঙ্গী যুবতী শিশ দিতে দিতে একটি কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে গোলাপী রঙের বেদিং কস্টুাম্‌, মাথায় রবারের টুপি, কোমরে একটি বড় টার্কিশ তোয়ালে জড়ানো। আমাদের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া ফিক্‌ করিয়া একটু হাসিয়া নৃত্যচঞ্চল চরণে তিনি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

গৃহিণী চাপা তর্জনে বলিলেন, "মরণ নেই বেহায়া ছুঁড়ির! খবরদার বলছি, ওদিকে তাকাবে না!"

হেঁটমুণ্ডে জলের দিকে চলিলাম। গৃহিণী শাড়ির আঁচল কোমরে জড়াইয়া লইলেন। ভাগ্যক্রমে আমি হাফ-প্যাণ্ট পরিয়া আসিয়াছিলাম।

জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া গৃহিণী কিন্তু আর অগ্রসর হইতে চান না। আমারও সুবিধা বোধ হইতেছিল না। কিন্তু এত দূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। ওদিকে শ্বেতাঙ্গী তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! ঢেউয়ের নাগর-দোলায় দোল খাইতেছে—যেন গোলাপী রঙের একটি মৎস্যনারী!

গৃহিণীকে বলিলাম, "এসো, ডাঙায় দাঁড়িয়ে কি সী-বেদিং হয়?"

জলের পানে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ঢেউগুলো বড্ড বড় বড়!"

"তা হোক্ না—সমুদ্রের ঢেউ বড়ই হয়। ঐ দেখ না, ও মেয়েটা কেমন ঢেউ খাচ্ছে।"

"আবার ওদিকে তাকাচ্ছ!"

"না না, ও অনেক দূরে আছে। এখান থেকে বিশেষ কিছু দেখা যায় না।—এসো।"

হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে জলে লইয়া গেলাম। বেশি নয়, হাঁটু জল পর্যন্ত গিয়াছি কি, বিভ্রাট বাধিয়া গেল! প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল। গৃহিণী পড়িয়া গেলেন; ঢেউ তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। ঢেউ ফিরিয়া গেলে তিনি হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই আর একটা ঢেউ আসিয়া আবার তাঁহাকে আছাড় মারিয়া ফেলিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওগো আমাকে ধরো —আমি যে খালি পড়ে যাচ্ছি! কোথায় গেলে তুমি—আমাকে ফেলে পালালে?"

তাঁহাকে ধরিবার মত অবস্থা আমার ছিল না। প্রথম গোটা দুই ঢেউ অতি কষ্টে সামলাইয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তৃতীয় ঢেউটা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। ঢেউয়ের তলায় গড়াইতে গড়াইতে আমি প্রায় ডাঙায় গিয়া উঠিলাম। দু-এক ঢোক লোণা জলও পেটে গিয়াছিল। কোনমতে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখি, গৃহিণী তখনও এক হাঁটু জলে আছাড় খাইতেছেন। ঢেউগুলা এত দ্রুত পরম্পরায় আসিতেছে যে, তিনি পলাইয়া আসিতে পারিতেছেন না! তাঁহার কণ্ঠ হইতে অনর্গল চীৎকার নিঃসৃত হইতেছে, "ওগো, কেমন মানুষ তুমি! আমাকে ফেলে পালালে! আমার যে কাপড় খুলে যাচ্ছে—"

শঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া দেখি, জলের মধ্যে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতেছে। সত্যই গৃহিণী বিবসনা হইতেছেন! ঢেউগুলা দুঃশাসনের মত ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বসন ধরিয়া টানিতেছে: আঁচল শিথিল হইয়া গেল! আর একটা ঢেউ—তিনি প্রাণপণে শাড়ির প্রান্ত আঁকড়াইয়া আছেন। আর একটা ঢেউ—ব্যস্! নারীর লজ্জা-নিবারণকারী শ্রীমধুসূদন বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন না; দুঃশাসনরূপী আরব সাগর গৃহিণীর শাড়ি কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মরীয়া হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলাম। অনেক নাকানি-চোবানি খাইয়া শেষ পর্যন্ত গৃহিণীকে একান্ত নিরাবরণ অবস্থায় ডাঙায় টানিয়া তুলিলাম। তিনি নেহাৎ তন্বী ন'ন—কিন্তু যাক্!

চারি দিক ফাঁকা, কোথাও এতটুকু আড়াল-আবডাল নাই। উপরন্তু, ভোজবাজির মত ঠিক এই সময় কোথা হইতে কতকগুলা লোক জুটিয়া গেল! তাহারা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে দেখিতে নিজেদের

ভাষায় (সম্ভবত আরবী) মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-কালে পঞ্চপাণ্ডবের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে তাকাইলাম—হে মধুসূদন, তুমি কত দূরে!

হঠাৎ দেখি, দূর হইতে শ্বেতাঙ্গী মেয়েটা ছুটিয়া আসিতেছে। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে তাহার বড় তোয়ালেখানা গৃহিণীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।...

সেদিন তোয়ালে-পরিহিতা গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে কি করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম, সে প্রশ্ন করিয়া পাঠক-পাঠিকা আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে মনে চোখ বুজিয়া থাকেন।

প্রেমিক

গল্পের শেষে একটি করিয়া মরাল বা হিতোপদেশ জুড়িয়া দিবার ফন্দিটা বোধ হয় বিষ্ণুশর্মা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে অবধি, লাগায়েৎ বর্তমান কাল, যিনিই গল্প লিখিয়াছেন, তিনিই এই ফন্দিটি কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; অর্থাৎ সুরু হইতে ক্রমাগত মুখ খারাপ করিয়া শেষের কয়েক ছত্রে দুই চারিটি তত্ত্বকথা ছাড়িয়া পিত্ত রক্ষা করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান কথাসাহিত্যের বৈদর্ভী রীতি।

মাতাল সারা রাত্রি মাতামাতি করিয়া প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান সারিয়া ঘরে ফিরিতেছে।

ইহার প্রতিকার আবশ্যক। যদি কিছু উপদেশ দিবার থাকে, গোড়াতেই সারিয়া লইতে হইবে। আরম্ভে নিম্বভক্ষণ সকল রসশাস্ত্রের বিধি হওয়া উচিত। অথ—

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের কয়েক শতাব্দী পরে আবার বাংলাদেশে নূতন করিয়া প্রেমের বান ডাকিয়াছে, কেহ কেহ ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়। মাঠে, ঘাটে, ট্রামে, রিক্সায়, কলেজে,

সিনেমায়, তরুণ-তরুণীরা অনবরত প্রেম করিতেছে। এত প্রেম কিন্তু ভাল নয়। সাধু সাবধান! কোনও বস্তুর অত্যধিক প্রাচুর্য ঘটিলে জ্ঞানী ব্যক্তির সন্দেহ হয়, ইহাতে ভেজাল আছে। বর্তমানে প্রেমের কারবারে কতখানি ভেজাল চলিতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বস্তুত, অহৈতুকী প্রীতি যে এই নশ্বর সংসারে অতীব দুর্লভ তাহা বহু মহাজন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মনের মানুষ মাত্র 'কোটিকে গুটিক' মিলে। বিদ্যাপতি ঠাকুর তো পরিষ্কার বলিয়াই দিয়াছেন যে, প্রাণ জুড়াইতে লাখের মধ্যে একটি মানুষও তিনি পান নাই। সুতরাং, আজকাল যে সব তরুণ তরুণী পথে ঘাটে এই দুর্লভ বস্তু কুড়াইয়া পাইতেছে, তাহাদের কি বলিব? ভ্রান্ত? মূঢ়? না—স্বার্থপর?

আধুনিকদের ভ্রান্ত বা মূঢ় বলিলে চটাচটি হইবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে তাহাদের ভণ্ড, স্বার্থসর্বস্ব, মৎলববাজ, কুচক্রী বলাই শ্রেয়।

শ্রীমান্ বিমানবিহারীর সহিত কুমারী অনিন্দ্যার প্রণয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। যেহেতু বিমান কুকুর ভালবাসিত, সেহেতু অনিন্দ্যার সহিত তাহার প্রেম ঘটিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেহ ভুল বুঝিবেন না। অনিন্দ্যা মানব-নন্দিনী। অনিন্দ্যার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটিই এই যোগাযোগের ঘটক।

আরম্ভে পাত্র-পাত্রীর কুল-পরিচয় দান করাই বিধি। কিন্তু বিমান ও অনিন্দ্যার কুলজি ঘাঁটিবার আমাদের সময় নাই। মনে করিয়া লওয়া যাক, বিমান স্বায়ম্ভুব মনুর ন্যায় auto-fertilisation প্রক্রিয়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—তাহার বাপ-পিতামহ কস্মিন্ কালেও ছিল না। অনিন্দ্যাও বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের কাহিনীর কোনও ক্ষতি হইবে না।

একদা শহরের নির্জন প্রান্তে নবরচিত এক পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে বিমান লক্ষ্য করিল, একটি বেঞ্চির উপর এক তরুণী বসিয়া আছে, তাহার পায়ের কাছে খরগোসের মত ছোট একটি কুকুর খেলা করিতেছে। বিমানের পদদ্বয় অজ্ঞাতসারে তাহাকে সেই দিকে লইয়া চলিল; একদৃষ্টে কুকুরের পানে তাকাইয়া সে বেঞ্চির এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। কুকুরের গায়ে কুচকুচে কালো কোঁকড়া লোম, চোখ দুটি তরমুজ বিচির মতো। মুগ্ধ ভাবে তাহার দিকে হাত

বাড়াইতেই সে টুকটুকে রাঙা জিভ বাহির করিয়া তাহার হাত চাটিয়া লইল। বিমান আবেগরুদ্ধ স্বরে বলিল, "কি সুন্দর কুকুর! পিকেনীজ বুঝি?"—বলিয়া কুকুরের স্বত্বাধিকারিণীর দিকে চোখ তুলিল।

দেখিল, কুকুরের স্বত্বাধিকারিণী টুকটুকে রাঙা ওষ্ঠাধর বিভক্ত করিয়া মিশমিশে কালো চোখে কৌতুক ভরিয়া হাসিতেছে। তাহার কোঁকড়া ঝামর চুলগুলি দুলিয়া উঠিল; সে বলিল, "না, সায়ামীজ।"

তরুণীর কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না, বিমান তীরবিদ্ধের মত চমকিয়া উঠিল, তারপর কুকুরের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তাই হবে। আমার ভুল হয়েছিল।—নাম কি?"

তরুণীর গালদুটি মুচকি হাসিতে টোল খাইয়া গেল, "কার নাম জিজ্ঞেস করছেন? আমার?"

বিমান লাল হইয়া উঠিল, "না না—মানে—ওর একটা নাম আছে তো—তাই—"

তরুণী টিপিয়া-টিপিয়া হাসিল, বলিল, "ওর নাম রুমঝুম। আর আমার নাম—অনিন্দ্যা।"

বিমান অতিমাত্রায় উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "রুমঝুম! ভারি চমৎ—! অর্থাৎ কিনা অনিন্দ্যা। ভারি চমৎকার নাম তো—"

"কোন্ নামটা চমৎকার?"

বিমান ভীষণ লজ্জিত হইয়া পড়িল, তাহার কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া রুমঝুমকে আদর করিতে করিতে তোৎলার মত অর্ধবিভক্ত ভাষায় বলিল, "অ্যাঁ—দ্ দ্ দ্—মানে দু-দুটো নামই চমৎকার—"

অনিন্দ্যা স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "চল্ রুমঝুম, বাড়ি যাই।—নমস্কার।"

হিরণ্ময়ী শাললতার মত জঙ্গমা, স্ফুট-বিকশিত-যৌবনা অনিন্দ্যা চলিয়া গেল; রুমঝুম তাহার চারিপাশে একটি কালো প্রজাপতির মত নৃত্য করিতে করিতে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, বিমান বেঞ্চিতে বসিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

পরদিন—আবার সেই দৃশ্য। আবার সেই ধরনের কথাবার্তা। অনিন্দ্যার গাল মৃদু কৌতুকে টোল খাইয়া যায়, টুকটুকে ঠোঁট-দুটি বিভক্ত হইয়া দাঁত-

গুলিকে ঈষৎ ব্যক্ত করে; বিমান ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠে—অপরিচিতা তরুণীর সহিত রসালাপ করা তাহার অভ্যাস নাই; ঝুমঝুম দুজনকে ঘিরিয়া খেলা করে, বিমানের হাত চাটিয়া দেয়।

এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটিল। বিমান ও অনিন্দ্যার মধ্যে বেশ ভাব হইয়াছে—বিমান আর ততটা সংকোচ করে না। বরং একটা অপূর্ব মোহ দিবারাত্র তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিমান চরিত্রবান্ যুবা, কিন্তু তাহার ভয় হইতেছে চরিত্র বুঝি আর থাকে না। এদিকে অনিন্দ্যার মিশমিশে কালো চোখে কিসের রং ধরিয়াছে। সমস্ত দিনটা যেন সন্ধ্যার প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া যায়। সন্ধ্যায় পার্কে বেড়াইতে যাইবার পূর্বে প্রকাণ্ড আয়নার সম্মুখে ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজেকে দেখে, একখানা কাপড় ছাড়িয়া আর একখানা পরে, কানের দুল খুলিয়া ঝুমকা পরে, ঝুমকা খুলিয়া কানবালা পরে—

একদিন অনিন্দ্যা বলিল, "আপনি ত প্রথম দিনই আমার নামটা জেনে নিলেন। নিজের নাম বলেন না কেন?"

ঝুমঝুমকে কোলে লইয়া বিমান বসিয়া ছিল, চমকিয়া বলিল, "আমার নাম বি—বিভূতি মিত্র।"

"কলেজে পড়েন বুঝি?"

আবার চমকিয়া বিমান বলিল, "হ্যাঁ,—পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট।"

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—আজকাল রোজই বাড়ি ফিরিতে দেরি হইয়া যায়। জনহীন পার্ক একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। আকাশে চাঁদ নাই। অনিন্দ্যা বিমানের পাশে একটু ঘেঁষিয়া বসিল। হাঁটুতে হাঁটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া গেল।

দুজনে কিছুক্ষণ নীরব। তারপর বিমান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

অনিন্দ্যা বলিল, "নিশ্বাস ফেললেন যে?"

বিমান অবরুদ্ধ আবেগের প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভুল আবৃত্তি করিল—

"—যাহা পাই তাহা ভুল করে পাই,
যাহা চাই তাহা পাই না।"

আবার কিছুক্ষণ নীরব। পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে—

চাঁদ উঠিবে। অনিন্দ্যা অস্ফুট আধ-বিজড়িত স্বরে বলিল, "আপনি কখনও ভালবেসেছেন ?"

আকস্মিক উত্তেজনার ফলে মানুষের বাহ্য অভিব্যক্তি কখনও কখনও উৎকট আকার ধারণ করে। বিমান সহসা ঘুমন্ত ঝুমঝুমকে দুহাতে বুকে চাপিয়া ধরিল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রজ্বলিত চক্ষে অনিন্দ্যার পানে চাহিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "এ পৃথিবীতে টাকা না থাকলে কাম্য বস্তু লাভ করা যায় না। আমার টাকা নেই। কেন মিছে আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন ?"—বলিয়া ঝুমঝুমকে অনিন্দ্যার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

রাত্রে ঘুমাইয়া বিমান স্বপ্ন দেখিল—কালো কোঁকড়া চুল, মিশমিশে দুটি চোখ, লাল টুকটুকে—

ঘুম ভাঙিয়া গেল। উত্তপ্ত মস্তকে জল দিয়া সে আবার ঘুমাইল। আবার স্বপ্ন দেখিল—

সকালে উঠিয়া বিমান উদ্‌ভ্রান্তের মত ভাবিল,—আর ত পারা যায় না। লোভ সংবরণ করা বড় কঠিন, চরিত্র ত রসাতলে গিয়াছেই—মনের অগোচর পাপ নাই—তবে আর বাহিরে সাধু সাজিয়া লাভ কি ? যাহা হইবার হোক্—আজই, হাঁ আজই সে এই কার্য করিবে। সন্ধ্যার পর পার্কে কেহ থাকে না—সেই সময়—

কামনার বিষে যখন অন্তর জর্জরিত, তখন অতিবড় সাধু ব্যক্তিরও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ঘৃত ও অগ্নির সান্নিধ্য অতি ভয়ংকর। কত সচ্চরিত্র যুবা—। কিন্তু যাক্, শেষের দিকে আর হিতোপদেশ দিব না।

সন্ধ্যার পর আবার দুজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। অনিন্দ্যার চুলের সৌরভ বিমানের নাকে আসিতেছে। একরাশ নরম রেশমের মত ঝুমঝুম তাহার কোলে ঘুমাইতেছে।

পার্ক অন্ধকার, জনমানব নাই। অনিন্দ্যা কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল আমার কথার জবাব না দিয়ে চলে গেলেন যে ?"

অন্ধকারে হাতে হাত ঠেকিল, বিমান তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "জবাব কি বুঝতে পারো নি ?

"না, বলুন না শুনি।" বিমানের তপ্ত মুঠির মধ্যে অনিন্দ্যার হাতখানি যেন মাখনের মত গলিয়া গেল।

"অনিন্দ্যা, তোমাকে আমার মনের কথা বুঝিয়ে দেব। কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে?"

"হয়ত পারি, শুনিই না আগে।"

"তবে তুমি একটু ব'সো। আমি এখনই আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছেন?"

"ঝুমঝুমের বোধ হয় তেষ্টা পেয়েছে, ওকে একটু জল খাইয়ে আনি।"

বিমান চলিয়া গেল। তারপর পনেরো মিনিট—আধ ঘণ্টা—একটি কম্প্রবক্ষা তরুণী অন্ধকার পার্কে একাকিনী প্রতীক্ষা করিতেছে! কোথায় গেল বিমান?

বিমান তখন শহরের অন্য প্রান্তে নিজের ঘরে বিছানার উপর শুইয়া ঝুমঝুমকে চটকাইতেছে, "ঝুমঝুম, তোকে আমি চুরি করে এনেছি! তোর মন কেমন করবে না? ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না? আর কখনও আমরা পার্কের ত্রিসীমানায় যাব না। কি বলিস? অনিন্দ্যা নিশ্চয় খুব রাগ করবে;—কিন্তু তোকে ছেড়ে যে আমি এক দণ্ডও থাকতে পারছিলুম না!"

রূপকথা

চায়ের দোকানের অভ্যন্তর। ঘরটি বেশ বড়। কয়েকটি মার্বেলটপ্ টেবিল ও তদুপযোগী চেয়ার ঘরের মধ্যে ইতস্তত সাজানো। ঘরের অপর প্রান্তে একটি রান্নাঘর—খোলা দ্বারপথে কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। রান্নাঘরের দেওয়ালে টাঙানো সারি সারি সস্প্যান ও কাঠের টেবিলের উপর কেট্‌লি পিরিচ পেয়ালা ইত্যাদি আংশিকভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

দোকানের নাম 'ত্রিবেণী-সঙ্গম'। কলিকাতার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চা ও অনুরূপ খাদ্যপানীয় সরবরাহ করিয়া ইহার সর্বজনপ্রিয় স্বত্বাধিকারী অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমের একটি বিশেষ আভিজাত্য আছে—সকল দ্রব্যেরই দাম প্রায় ডবল। সুতরাং সাধারণ চা-খোরদের পক্ষে এ স্থান অনধিগম্য, বিত্তবান্ তরুণ-তরুণীরাই এই 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' সঙ্গত হইয়া থাকেন।

বেলা ছটা বাজিয়া গিয়াছে—দোকানের এবং সেই সঙ্গে একটি বিরাট উদরের স্বত্বাধিকারী বেণীখুড়ো ওরফে বেণীমাধব চক্রবর্তী একটি লম্বা টেবিলের

উপর শয়ন করিয়া পিরান ও কাপড়ের ফাঁকে নাভিমণ্ডল উদ্‌ঘাটিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার নাসিকার উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বর একটানা করাতের মত ঘরের স্তব্ধতাকে কর্তন করিতেছে।

দোকানের একমাত্র ভৃত্য বিদ্যাধর—একাধারে পাচক এবং পরিবেষক—অন্য একটা টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারের পিছনের পায়া-যুগলের উপর দেহের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দিয়া মৃদু-মন্দ দুলিতেছে ও একমনে একটি বহুব্যবহারে মলিন ও ছিন্নপ্রায় পত্র পাঠ করিতেছে। বিদ্যাধর যুবাবয়স্ক—দেখিতে সুশ্রী, তাহার গায়ে সস্তা ছিটের পিরান, কাপড়ের কোঁচার অংশটা দুপাট করিয়া কোমরে জড়ানো।

বিদ্যাধর চিঠিখানার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল,—গন্ধ ছিল এখন প্রায় উবে গেছে। জাসমীনের গন্ধ। গুরুমা হলে কি হয়, প্রাণে সখ আছে। (পত্র খুলিয়া পাঠ) 'বন্ধুবর!' ইঃ যেন বন্ধুবরের জন্য বুক ফেটে যাচ্ছিল। বন্ধুবর না লিখে শুধু বর লিখলেই ত ন্যাটা চুকে যেত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না, অ লিখবে কেমন করে? সে ত আর আমি নই, সে যে আর একজন। লিকলিকে চেহারা, ঘাড়ছাঁটা চুল, কোট-সোয়েটার পরা, মেয়েলি মেয়েলি গড়ন—দেখলেই জুতো-পেটা করতে ইচ্ছে করে। মুখখানা পেছন থেকে দেখতে পেলুম না। দেখিনি ভালই হয়েছে! ঘাড়ের চুলগুলো যেন মুর্গীর বাচ্চার মত, মুখখানাও নিশ্চয় প্যাঁচার বাচ্চার মত হবে। দূর হোক গে! (পত্র পাঠ) 'আমি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, ষাট টাকা মাহিনা পাই। তার উপর সম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনহীনা—বংশমর্য্যাদাও কিছু নাই। যিনি আমার স্বামী হইবেন তাঁহাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই। রূপ ক'দিনের? গুণও নাই। তাই স্থির করিয়াছি ইহজীবনে বিবাহ করিব না। নিঃস্ব ভাবে রিক্ত হস্তে কাহারো গলগ্রহ হইতে চাহি না। ছোট ছোট মেয়েদের গুরুমা হইয়াই আমার জীবন কাটাইতে হইবে। তবে যদি দৈবক্রমে কোনদিন অর্থশালিনী হই, তবেই যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। ইতি—

বিনীতা

মঞ্জুষা

হুঁ! এতদিনে তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা হয়ে গিয়েছে। এখন ত আর ষাট টাকা মাইনের গুরুমাটি নয়,—লক্ষপতি। সে বেটাচ্ছেলে নিশ্চয়

আরও দুখানা মোটর কিনেছে। এতদিন হয়ত ছেলেপুলে—। দূর! এই ত মোটে তিনমাস! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তিনশ' বছর! চুলোয় যাক গে, আমি ত বেশ আছি। নিজে রোজগার করে খাচ্ছি, কোনও ভাবনা নেই। বেঁচে থাক্ বেণীখুড়ো আর তার রেস্তোরাঁ! (কিছুক্ষণ নিদ্রিত বেণীকে নিরীক্ষণ করিয়া) খুড়োর নাকে রসুনচৌকি বাজছে। ওর পেটে বোধ হয় একটা ব্যাগপাইপ লুকোনো আছে—ঘুমলেই বাজতে আরম্ভ করে। (সস্নেহে) খুড়োর আমার ভেতরে-বাইরে সমান—পেটেও ব্যাগপাইপ প্রাণেও ব্যাগ-পাইপ! অথচ সারাটা জীবন হোটেল করে কাটিয়ে দিলে। এই দুনিয়া! (কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া) কোথায় দিল্লী আর কোথায় কলকাতা! খুব লম্বা পাড়ি জমানো গেছে, এখানে চেনা লোকের সঙ্গে থামকা মাথা ঠোকাঠুকি হবার ভয় নেই। উপরন্তু যে রকম গোঁফ আর জুলপি গজানো গেছে, দেখা হলেও কেউ সহজে চিনতে পারবে না। উপরন্তু গোদের ওপর বিষ-ফোড়া আছে—ইউনিফর্ম। ছদ্মবেশ দিব্যি পাকা রকম হয়েছে। (চিঠিখানা মুড়িতে মুড়িতে) আমি ত খাসা আছি—কিন্তু আর কিছু নয়,—মঞ্জুষারাণী কেমন আছেন, কি করছেন তাই জানতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। হয়ত সে বেটা মাতাল—আমার টাকাগুলো নাহক শুঁড়ির বাড়ি পাঠাচ্ছে—ওকে হয়ত যন্ত্রণা দিচ্ছে! যাক গে। যেমন কর্ম তেমনি ফল, আমি আর কি করব? মাতালের শ্রীচরণে যখন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তখন মাঝে মাঝে লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে বৈ কি! টাকাগুলো হয়ত এর মধ্যে সব ফুঁকে দিয়েছে, মঞ্জুষারাণী আমার যে গুরুমা সেই গুরুমা। না, অতটা পারবে না। দু'লাখ টাকা তিন মাসের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া সহজ মাতালের কর্ম নয়।—

দেয়ালে টাঙানো জাপানী ঘড়িতে ঠং করিয়া আড়াইটা বাজিতেই বেণী-মাধবের নাসিকাধ্বনি অর্ধপথে হোঁচট খাইয়া থামিয়া গেল। চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিয়া দিগন্তপ্রসারী একটি হাই তুলিয়া বলিলেন, বিশ্বে, ওঠ্ বাবা ওঠ্, আর দেরি করিসনে, আড়াইটে বেজে গেল উননে আগুন দে। এখুনি ছোঁড়াছুঁড়িরা—কি বলে ভাল—ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা আসতে আরম্ভ করবে।

বিশ্বা। তার এখনও ঢের দেরি আছে খুড়ো।

বেণী। না না তুই ওঠ্, মাণিক আমার, উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের জলটা

চড়িয়ে দে। আমার একটু চোখ লেগে গিছল। বলি হাঁারে, আইসক্রীমটা ঠিক করেছিস ত? কাট্‌লেটের মাছ আর মাংস দিয়ে গেছে ত—?

বিদ্যা। হাঁা—

বেণী। তাহলে আর আলস্যি করিসনে বাবা আমার, উঠে পড়্। এই বেলা গোটাকতক ভেজে রাখ্, তখন গরম করে দিলেই হবে। নইলে ভিড়ের সময় যুগিয়ে উঠতে পারবিনে। ঢাকাই পরটাগুলো—?

বিদ্যা। যাচ্ছি খুড়ো, অত তাড়া কিসের! আজ তোমার বেশি খদ্দের হবে না!

বেণী। (বিরক্ত হইয়া) ঐ তোর ভারি দোষ বিদ্যে, বড় কথা কাটিস। হোটেল করে করে আমার দাড়ি পেকে গেল, তুই আমাকে শেখাতে এসেছিস আজ খদ্দের হবে কিনা। বলি, আজ শনিবার সেটা খেয়াল আছে?

বিদ্যা। আছে, কিন্তু আজ ব্যারাকপুরে রেস আছে সেটাও যে ভুলতে পারছি না খুড়ো।

বেণী। হাতোর রেসের নিকুচি করেছে—রোজ রেস রোজ রেস!—আচ্ছা রেসের দিন ছোঁড়াছুঁড়িরা আসে না কেন বলতে পারিস?

বিদ্যা। রেসে হেরে গিয়ে ভয়ানক মনমরা হয়ে পড়ে কিনা খুড়ো তাই আসে না। তখন আমার কাটলেটও আর মুখে রোচে না।

বেণী। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি। তা মাছ মাংস কম করে নিয়েছিস ত?

বিদ্যা। হাঁা—সেজন্য ভেবো না—

বেণী। (উঠিয়া আসিয়া বিদ্যাধরের চিবুক স্পর্শ করত চুম্বন করিয়া) ভ্যালা মোর বাপ রে। সোনারচাঁদ ছেলে। তোর কাছে মিথ্যা বলবো না বিদ্যে, হোটেল আমি ঢের করেছি কিন্তু কপাল খুলল আমার তোর পয়ে। আজ-কাল তোর তৈরী কাটলেট আর ঢাকাই পরটা খেতে ছোঁড়াছুঁড়ির ভিড় দেখি আর ভাবি, এমন দিনও আমার গেছে যখন কারখানার উড়ে মিস্তিরি-দের ভাত রেঁধে খাইয়ে আমার দিন কেটেছে। তখন দিনান্তে পাঁচ গণ্ডা পয়সা আমার বাঁচত। ঝাড়া-হাত-পা রাঁড়ি মনিষ্যি বলেই পেরেছিলুম, নইলে মাগছেলে নিয়ে ন্যাঙ্গাল্ হয়ে পড়লে কি পারতুম, না এই বুড়ো বয়সে তোর কল্যাণে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেতুম?

বিদ্যা। (পা নামাইয়া বসিয়া) তবেই বল খুড়ো, আমি না হলে তোমার কিছুই হত না?

বেণী। কিছু না রে বাবা, কিছু না। এই যে সব ভাল ভাল চেয়ার, টেবিল, আসবাব, এত টাকা ভাড়া দিয়ে শহরের মাঝখানে দোকান—এসব স্বপ্নই রয়ে যেত। 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' কেবল তোর পয়ে।

বিদ্যা। খুড়ো, এই জন্যেই তোমায় এত ভালবাসি। অন্য মনিব হলে আমাকেই বোঝাতে চেষ্টা করত যে তার পয়ে আমার কপাল খুলেছে। ভুলেও মানত না যে আমার কোন কৃতিত্ব আছে, পাছে আমার দেমাক বেড়ে যায়, বেশি মাইনে চেয়ে বসি।

বেণী। দূর পাগল! ভুল বোঝালে কি ভবি ভোলে রে? তোর আমার কাছে যতদিন থাকবার ততদিন থাকবি, তারপর যেদিন কাজ ফুরুবে সেদিন কারণে-অকারণে আপনিই চলে যাবি। তোকে আমি ধরেও আনিনি, ধরে রাখতেও পারব না। কেউ কি তা পারে? দুনিয়ার এই নিয়ম।

বিদ্যা। র'সো খুড়ো তোমার দর্শনশাস্ত্র পরে শুনবো। এইবার চট করে একটা উননে আগুন দিয়ে আসি।

বিদ্যাধর প্রস্থান করিল। ঘরের এককোণে একটি কাঠের ছোট টেবিল ও টুল রাখা ছিল; টেবিলের উপর বেণীমাধবের ক্যাশবাক্স। এইখানে বসিয়া তিনি খদ্দেরের নিকট পয়সা গ্রহণ করেন। কসি হইতে চাবি বাহির করিয়া বেণী ক্যাশবাক্স খুলিয়া একটি পুস্তক বাহির করিলেন, তারপর টুলের উপর বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

থেলো হুঁকার উপর কলিকা বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বিদ্যাধর প্রবেশ করিল।

বিদ্যা। (হুঁকা বেণীমাধবকে দিয়া) এই নাও টানো।—আবার সেই 'শিহরণ-সিরিজ' বার করেছ? এটা কি দেখি—ওঃ একেবারে গুদামে গুমখুন। (উচ্চহাস্য) আচ্ছা খুড়ো, এগুলো তোমার ভাল লাগে?

বেণী। তা লাগে বাবা, মিথ্যে বলব না। তোর মত পেটে বিদ্যে ত নেই, ইংরেজী খবরের কাগজটা পর্যন্ত পড়তে পারি না। তাই এই সব বইয়ে বিলিতী মেমসাহেবদের কেচ্ছা পড়ে একটু আনন্দ পাই।

বিদ্যা। আমার পেটে বিদ্যে আছে তুমি জানলে কোত্থেকে খুড়ো?

বেণী। জানি রে বাবা জানি, ও কি আর চেপে রাখা যায়। আজকাল লেখাপড়া শিখে গেরস্তর ছেলেদের এই দুর্দশাই ত হয়েছে। আমি কত সোনার চাঁদ ছেলেকে রাস্তায় রাস্তায় আলুর চপ, গরম ফুলুরি ফেরি করতে দেখেছি।

লজ্জায় ভদ্দরলোকের ছেলে বলে পরিচয় দিতে চায় না, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে পিরান গায়ে দিয়ে ছোটলোক সেজে বেড়ায়। তুইও সেই দলের। কিন্তু এত লেখাপড়া শিখেও এমন রাঁধতে শিখলি কোত্থেকে সেইটেই বুঝতে পারি না!

বিদ্যা। তা জানো না খুড়ো? ভারতবিখ্যাত পীরুবাবুর্চির নাম শোনো নি কখনও? দেড়শ' টাকা তাঁর মাইনে, রাজা-রাজড়া তাঁর হাতের হোসেনী কাবাব খাবার জন্যে লালায়িত। এ হেন পীরু মিঞা হচ্ছেন আমার গুরু। দুটি বছর তাঁকে মাইনে দিয়ে রেখে—ওর নাম কি—তাঁর পায়ের কাছে বসে রান্না শিখেছি। রান্নার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তিনি—শুক্তুনি থেকে পেঁয়াজের পরমান্ন পর্যন্ত সব রান্নার হুনরী—সকাল বেলা তাঁর নাম স্মরণ করলেও পুণ্য হয়। (উদ্দেশে প্রণাম) ভাগ্যে তাঁর কাছে শিখেছিলুম, নইলে আজ আমার কি দুর্দশাই না হত খুড়ো!

বেণী। আচ্ছা বিদ্যে, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এই তিনমাস আমার কাছে আছিস, একদিনের তরেও ত তোকে বাড়ি যেতে দেখলুম না? তোর বাড়ি কোথায়—বাপ, মা, ভাইবোন সব আছে ত? তাদের একবার খোঁজখবর নিস না কেন? খালি দেখতে পাই, মাঝে মাঝে একখানা চিঠি বার করে বিড় বিড় করে পড়িস। বলি, বাড়ি থেকে ঝগড়া-ঝাঁটি করে পালিয়ে আসিস নি ত?

বিদ্যা। ওসব কথা ছাড়ান দাও খুড়ো। আমার তিনকুলে কেউ নেই, তোমার মত ঝাড়া-হাত-পা লোক। তাই ত তোমার সঙ্গে জুটে গেছি। রতনেই রতন চেনে কিনা। তুমি এখন তোমার গুদোমে গুমখুন আরম্ভ কর, আমি একবার ওদিকটা দেখি। এখনই হয়ত লোক এসে পড়বে।

বিদ্যাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল। বেণী হুঁকা টানিতে টানিতে পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিদ্যাধর ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ বলিল,—খুড়ো, একটা গল্প শুনবে? তোমার শিহরণ-সিরিজের সবচেয়ে ভাল গল্প।

বেণী। (বই মুড়িয়া) বলবি? আচ্ছা তবে তাই বল্। অনেক ভাল ভাল ইংরিজী বই পড়েছিস সেই থেকে একটা বল্ শুনি। এমন এমন গল্প বলিস বিদ্যে যেন শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বিদ্যা। আচ্ছা বেশ। (গলা সাফ করিয়া) এক রাজপুত্তুর ছিল—অর্থাৎ কিনা—

বেণী। (করুণ ভাবে) ওরে, এ যে রূপকথা আরম্ভ করলি বিন্তে। আমার কি আর রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুরের গল্প শোনবার বয়স আছে!

বিন্তা। রূপকথা নয়, তবে কতকটা আরব্য উপন্যাসের মত বটে। আচ্ছা রাজপুত্তুরকে না হয় ছেড়ে দিলুম,—ধর এক মস্ত বড়মানুষের ছেলে।

বেণী। নাম কি?

বিন্তা। (মাথা চুলকাইয়া) নাম? মনে কর—রণেন্দ্র সিংহ। কেমন জমকালো নাম কিনা? তোমার 'গুদামে গুমখুন'-এ এমন নাম আছে?

বেণী। না,—তারপর বল্—

বিন্তা। কি আশ্চর্য খুড়ো, এতদিন লক্ষ্য করিনি! কিন্তু আমাদের সাধারণ বাঙালীর ঘরে সময় সময় এমন এক একটা নাম বেরিয়ে পড়ে যা 'দুর্গেশনন্দিনী' 'জীবনপ্রভাত' খুঁজলেও পাওয়া যায় না। 'রণেন্দ্র সিংহ' শুনলে মনে হয় না যে, নামটা একখানা আনকোরা ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে পেড়ে এনেছে? অথচ—সে যাক, এখন গল্পটা শোনো। এই রণেন্দ্র সিংহের অনেক টাকা; বাপ্-মা ভাই-বোন কেউ নেই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ—চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়, অন্তত ছেলেপুলে অন্ধকারে দেখলে ডরিয়ে ওঠে না। তার বিয়ে হয়নি, কারণ বাপ বিয়ে দেবার আগেই মারা গেছেন। রাজধানীতে সাতমহল বাড়িতে একলা থাকে, কারুর তোয়াক্কা রাখে না। যেন একটি ছোটখাট নবাব।

এ হেন রণেন্দ্র সিংহ একদিন এক মেয়ে-ইস্কুলের গুরুমার সঙ্গে—থুড়ি—এক ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ে দেখতে ঠিক একটি রজনীগন্ধার কুঁড়ির মতো। বলি, রজনীগন্ধার কুঁড়ি দেখেছ ত?

বেণী। দেখেছি রে বাপু, হগ সাহেবের বাজারে ফুলের দোকানে। তুই বলে যা না।

বিন্তা। রণেন্দ্র সিংহ সেই রজনীগন্ধার কুঁড়ির প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। শেষে তার এমন অবস্থা হল যে, মেয়ে-ইস্কুল না হয়ে যদি ছেলে-ইস্কুল হত তাহলে পোড়ো সেজে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে পড়তেও সে দ্বিধা করত না—ঐঃ যা! কি বলতে কি বলে ফেলছি খুড়ো, আমার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। ঘুঁটে কুড়ুনী মেয়ের কথা বলতে কেবলি গুরুমা'র কথা বলে ফেলছি—

বেণী। তা হোক, আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। তুই বলে যা।

বিন্তা। যা হোক, অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে রণেন্দ্র সিংহ শেষে মেয়েটির সঙ্গে ভাব করলে। মেয়েটির নাম—ধর, মঞ্জুষা। দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হল। ক্রমে

রোজ সন্ধ্যাবেলা মেয়েটির কুঁড়ে ঘরে দুজনের দেখা হতে লাগল। হাসি-গল্প, গান, চা-চকোলেটের ভিতর দিয়ে বন্ধুত্ব বেশ প্রগাঢ় হয়ে উঠল। দূর থেকে দেখেই রণেন্দ্র সিংহ যাকে ভালবেসেছিল, এত কাছে পেয়ে তার প্রেমে একেবারে ডুবে গেল। নিজের বলে তার আর কিছু রইল না।

এমনি ভাবে মাস দুই কাটবার পর রণেন্দ্র সিংহ একদিন মঞ্জুষার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে। মঞ্জুষারাণীর মুখখানি লাল হয়ে উঠল,—এক মুহূর্তে রজনীগন্ধার কুঁড়ি ডালিমফুলের কুঁড়িতে পরিণত হল। তারপর কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে থেকে বললে—'না।' রণেন্দ্র সিংহের বুকের রক্ত থেমে গেল, সে জিজ্ঞাসা করলে,—'কারণ জানতে পারি কি?'

মঞ্জুষা বললে,—'চিঠিতে জানাব।'

খালি বুক নিয়ে রণেন্দ্র সিংহ তার সাতমহল বাড়িতে ফিরে এল।

পরদিন মঞ্জুষার চিঠি এল। সে লিখেছে—সে গরিব মেয়ে, বড়মানুষের ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। এমন কি, বিয়ে করতেই তার ঘোর আপত্তি! তবে যদি ভগবান কখনও তাকে টাকা দেন তখন সে যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করবে—নচেৎ বিয়ে-থাওয়ার কথা ঐ পর্যন্ত!

চিঠি পড়ে আহ্লাদে রণেন্দ্র সিংহের বুক নেচে উঠল; সে তখনই ছুটল উকিলের বাড়ি। উকিলকে দিয়ে এক দলিল তৈরি করালে। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ টাকাকড়ি যা ছিল সব ঐ ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ের নামে দান-পত্র করে দিলে। তারপর দানপত্র হাতে করে সন্ধ্যেবেলা মেয়েটির বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

বাড়িতে ঢোকবার আগেই রণেন্দ্র সিংহ দেখতে পেলে, দোতলার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্জুষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কে একজন তাকে চুমু খাচ্ছে। জানলা দিয়ে তাদের কোমর পর্যন্ত দেখা গেল। যে লোকটা চুমু খাচ্ছে তার সরু লিক্‌লিকে চেহারা, ঘাড়ে ছাঁটা চুল, গায়ে কোট-সোয়েটার। রণেন্দ্র সিংহ তার মুখ দেখতে পেলে না। পা টিপে টিপে চোরের মত বাড়ি ফিরে গেল।

সে রাত্তিরটা রণেন্দ্র সিংহ ঘুমোতে পারলে না। পরদিন সকালে উঠে রেজিষ্ট্রি করে দানপত্রটা ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে সে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ল।

বেণী। সব দিয়ে দিলি? দানপত্রটা ছিঁড়ে ফেললি না? দূর আহাম্মক!

বিন্দা। রণেন্দ্র সিংহটা ঐ রকম আহাম্মক ছিল, সব দিয়ে দিলে। ভাবলে

টাকা পেলেই যখন মেয়েটা যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করতে পারবে তখন তাই করুক।

বেণী। হাঁদাগোবিন্দ রণেন্দ্র সিংগির কি দশা হল?

বিদ্যা। কি জানি। হাঁদাগোবিন্দদের যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে বোধ হয়। পথে পথে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেণী। আর মেয়েটা?

বিদ্যা। সে এখন বিয়ে-থা করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে আর মাতালটার লাথি-ঝ্যাটা খাচ্ছে। এতদিনে রণেন্দ্র সিংহের টাকাগুলো প্রায় শেষ করে এনেছে।

বেণী। মাতাল টাকা উড়িয়ে দিয়েছে,—এত খবর তুই জানলি কি করে?

বিদ্যা। এর আর জানাজানি কি? এ ত দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।

বেণী। (বহুক্ষণ হুঁকায় টান দিয়া শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) তোর গল্প একদম বাজে, শেষের দিকে মন একেবারে খিঁচড়ে যায়। তার চেয়ে আমার শিহরণ-সিরিজ ঢের ভাল, শেষ পাতায় নায়ক-নায়িকা চুমু খেয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করে। (সহসা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া বিদ্যাধরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া) তবে কি জানিস রে বাবা, মরদের বাচ্চা—কিছুতেই দমতে নেই। কোথাকার ঘুঁটে-কুড়ুনী মেয়ে নিজের মাথা খেয়ে ফিরে চাইলে না বলে কি প্রাণটাকে তাচ্ছিল্য করে নষ্ট করে ফেলতে হবে? আবার দেখবি, কত রাজার মেয়ে ঐ রণেন্দ্র সিংগির জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্কুলের মাস্টারনী কদর বুঝলে না বলে কি মণিমুক্তোর দাম কমে যাবে! দেখিস, ঐ রণেন্দ্র সিংগির একদিন রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে হবে।

বিদ্যা। তা যদি হতে পারত খুড়ো তাহলে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব তোমাকে, রণেন্দ্র সিংহটা এমনি আহাম্মক যে ঐ ঘুঁটে-কুড়ুনী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে চায় না। রাজকন্যার ওপর তার একটুও নজর নেই।

বেণী। বিন্তে, যা বাবা তুই কাটলেট ভাজগে যা। আর বুড়োমানুষকে দুঃখ দিসনে। তোর গল্প আর আমি শুনতে চাই না।

এই সময় দোকানের সামনে একটি মোটর আসিয়া থামিল। বেণী উঁকি মারিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালে টাঙানো একটি কালো রঙের গলবন্ধ কোট

পরিধান করিতে করিতে বলিলেন,—বিদ্যে, শীগগির যা ইউনিফরম্ পরে নে, খদ্দের আসতে সুরু করেছে।

বিদ্যাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল।

বহির্দ্বার দিয়া একটি তরুণীর প্রবেশ। সুন্দরী তন্বী, চোখে বিষাদের ছায়া। পায়ে হাই-হীল সোয়েড জুতা, ফিকা গোলাপী রঙের মোজা; পরিধানে দামী সিল্কের বেগুনী রঙের শাড়ি ও ব্লাউজ। হাতে একগাছি করিয়া সোনার চুড়ি। বাম কব্জিতে একটি গিনির মত পাতলা ক্ষুদ্র ঘড়ি। গলায় প্লাটিনামের সরু হারে একটি হীরার লকেট ঝুলিতেছে। কানে কোন অলঙ্কার নাই। মাথার চুল ঈষৎ রুক্ষ, এলো খোঁপার আকারে জড়ানো।

বেণী। (সহর্ষে হাত ঘষিতে ঘষিতে) আসুন মা লক্ষ্মী আসুন, এই চেয়ার-টিতে বসুন।—এখনও ফাগুন মাস শেষ হয়নি, এরি মধ্যে কি রকম গরম পড়ে গেছে দেখছেন? পাখাটা খুলে দেব কি?

তরুণী ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; বেণী পাখা খুলিয়া দিলেন।

বেণী। (হাত ঘষিতে ঘষিতে) তা আপনার জন্য কি ফরমাস দেব বলুন ত? চা? কোকো? না এ গরমে চা কোকো চলবে না। ঘোলের সরবৎ? চকোলেট ড্রিঙ্ক? আইসক্রীম? যা চাইবেন তাই তৈরী আছে। আমি বলি, এক গেলাস বরফ দেওয়া ঘোলের সরবৎ খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে নিন, তারপর দুখানা ক্রীম কেক—কিম্বা যদি ইচ্ছা করেন, দুটো চিংড়ি মাছের কাটলেট—

তরুণী। চা দিন এক পেয়ালা—

বেণী। চা? যে আজ্ঞে, তাই দিচ্ছি। এ সময় চায়ে খুব তেষ্টা নাশ করে বটে। ওরে বিদ্যে, অর্ডার নিয়ে যা—

অদ্ভুত ইউনিফর্ম পরিয়া বিদ্যাধরের প্রবেশ।

নিম্নাঙ্গে চুড়িদার পায়জামা, ঊর্ধ্বাঙ্গে জরির কাজকরা নীল রঙের ফতুয়া, মাথায় হাঁড়ির মত আকৃতি-বিশিষ্ট এক টুপি। এই ইউনিফর্ম বিদ্যাধরের স্বকল্পিত সৃষ্টি।

তরুণীর সম্মুখবর্তী হইয়া বিদ্যাধর ভীষণ মুখবিকৃতি করিতে আরম্ভ করিল।

তরুণী অন্যমনস্ক ভাবে হাতের উপর চিবুক ও টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া বসিয়া ছিলেন—কিছু লক্ষ্য করিলেন না।

বেণী। (বিদ্যাধরকে একটা গুপ্ত ঠেলা দিয়া নিম্নস্বরে) ও কি, অমন করে দাঁত মুখ খিঁচুচ্ছিস কেন? অর্ডার নে।

বিদ্যা। (বিকট স্বরে) কি চাই?

তরুণী চমকিয়া উঠিলেন; অবাক হইয়া কিছুক্ষণ বিদ্যাধরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিদ্যাধর পূর্ববৎ মুখভঙ্গী করিতে লাগিল।

তরুণী। (অধর দংশন করিয়া) চা চাই—একটু তাড়াতাড়ি। আমাকে এখনই বারাকপুর রেসে যেতে হবে।

বিদ্যাধর পিছু হটিয়া প্রস্থান করিল।

বেণী। দু-মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে—সব তৈরী আছে। তা শুধু চা কি ঠিক হবে? সেই সঙ্গে দুটো কাটলেট—বিদ্যের হাতের কাটলেট এ অঞ্চলে বিখ্যাত—একবার মুখে দিলে আর ভুলতে পারবেন না।

তরুণী। (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা, আনতে বলুন—

বেণী। (নেপথ্যের উদ্দেশে) এক পেয়ালা চা, দুখানা কাটলেট, জলদি! (তরুণীর দিকে ফিরিয়া) মাঠাকরুন এর আগে কখনও 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' পায়ের ধুলো দেন নি, নইলে আগেই বিদ্যের কাটলেট অর্ডার দিতেন। কলকাতায় যত ভাল-ভাল তরুণী আছেন সবাই এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে থাকেন। অন্তত হপ্তায় একবার বেণী-খুড়োর হোটেলে আসাই চাই। তাঁদেরই দয়ায় বেঁচে আছি।

তরুণী। আমি কলকাতায় থাকি না। কখনও কখনও আসি।

বেণী। রেস খেলতে এসেছেন বুঝি? আজকাল অনেক মেয়েরা বাইরে থেকে আসেন—

তরুণী। না, রেস খেলতে নয়, রেসে যাচ্ছিলুম অন্য কাজে,—আপনিই বুঝি এই রেস্তোরাঁর মালিক?

বেণী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মালিক বটে তবে বিদ্যেই সব করে; আমি শুধু পয়সা কুড়োই।

তরুণী। আপনার ঐ চাকরটির নাম বিদ্যে? ও কি বাঙালী?

বেণী। বাঙালী বই কি, আসল বাঙালী। কায়েতের ছেলে। কিন্তু ওর নাম বিদ্যে নয়, [গলা খাটো করিয়া] ও মস্ত বড়মানুষ ছিল—নানান্ ফেরে পড়ে এখন গরিব হয়ে গেছে, তাই হোটেলে চাকরি করছে। ওর বাড়ি বোধ হয়—

চা ও কাটলেটের প্লেট লইয়া বিদ্যাধর প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ প্রচণ্ড ভাবে উপর্যুপরি হাঁচিতে আরম্ভ করিল। বেণী ফিরিয়া দেখিলেন বিদ্যাধর গলা

ও মাথার চারিপাশে একটা কম্ফর্টার জড়াইয়া আরও অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

বেণী। (কাছে গিয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত ভাবে) এসব তোর কি হয়েছে বিন্তে? গলায় কম্ফর্টার জড়িয়েছিস কেন, অত হাঁচ্ছিস কেন?

বিন্তা। (বেণীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) খবরদার খুড়ো, একটি কথা বলেছ কি এক কামড়ে তোমার কানটি কেটে নেব, একেবারে ভুবনের মাসী হয়ে যাবে। যা করছি করতে দাও—কথাটি কোয়ো না।

বেণী বিহ্বল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিন্তা চা ও কাটলেট তরুণীর সম্মুখে রাখিল।

বিন্তা। আমি বিন্তে, আমার সর্দি হয়েছে—হাঁচ্ছি,—হাঁ—চ্ছি—

তরুণী। সর্বনাশ! আমার চায়ে হেঁচে দাওনি ত?

বিন্তা। না—না—চায়ে আমি হাঁচি না—হাঁ—চ্ছি—

তরুণী। কিন্তু চা একেবারে তৈরি করে নিয়ে এলে কেন? আমি যে চায়ে চিনি খাই না।

বিন্তা। খেয়ে দেখুন, চায়ে চিনি নেই—

(হাঁচিতে হাঁচিতে প্রস্থান)

(তরুণী এক চুমুক চা পান করিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বেণীকে ডাকিলেন, বেণী নিকটে আসিলেন।)

তরুণী। দেখুন, আপনার এই চাকরটি বোধ হয় পাগল।

বেণী। (মাথা নাড়িয়া) না পাগল ত ছিল না, তবে আজ হঠাৎ কেমন-ধাঁধা হয়ে গেছে। (গলা খাটো করিয়া) আমার কান কামড়ে নেবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল।

তরুণী। সে কি! তবে ত একেবারে উন্মাদ!

বেণী। না উন্মাদ নয়, এই খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত বেশ সহজ ভাবে কথা কইছিল। ওর কিছু একটা হয়েছে—

তরুণী। যদি উন্মাদ না হয় তা হলে নিশ্চয় অন্তর্যামী, নৈলে আমি চায়ে চিনি খাই না জানলে কি করে!

বেণী। (চিন্তিতভাবে) সত্যিই ত! জান্‌লে কি করে?—বিন্তে, এদিকে আয়—

তরুণী। থাক্, ওকে ডাকবার দরকার নেই। ভাল 'ওয়েটার'রা সাধারণত

অন্তর্যামী হয়ে থাকে—ওতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। (চা পান করিতে করিতে) আচ্ছা আপনার দোকানে ত অনেক লোক আসে যায়, আমি একজন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার সন্ধান দিতে পারেন? তারি খোঁজে আজ রেসকোর্সে যাচ্ছিলুম, সেখানে অনেক লোক যায়, যদি তার দেখা পাই।

বেণী। (সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করিয়া) কি রকম লোক তুমি খুঁজছ মাঠাকৃরুণ তার বর্ণনাটা একবার দাও ত শুনি। তার নাম ধাম চেহারার একটা আন্দাজ দাও, দেখি যদি বেরিয়ে পড়ে।

তরুণী। নাম জেনে বিশেষ সুবিধে হবে না, কারণ সম্ভবত সে ছদ্মনামে বেড়াচ্ছে। যা হোক, কাজ চালানোর জন্যে ধরে নেওয়া যাক্ যে তার নাম—রণেন্দ্র সিংহ।

বেণী। কি নাম? রণেন্দ্র সিংহ?

তরুণী। মনে করুন রণেন্দ্র সিংহ। কেন, এ ধরনের নাম কি আপনি আগে শুনেছেন নাকি?

বেণী। হুঁ, শুনেছি বলেই মনে হচ্ছে, তবে লোকটাকে যে চিনি সে কথা এখনো জোর করে বলতে পারছি না। লোকটির আর সব পরিচয়?

তরুণী। দেখুন, লোকটির পুরো পরিচয় দিতে গেলে একটা গল্প বলতে হয়। আপনার ঐ চাকরটির মত তারো একটু পাগলামির ছিট আছে।

ইতিমধ্যে বিদ্যাধর হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া তরুণীর চেয়ারের পিছনে বসিয়াছিল এবং একাগ্রমনে কথাবার্তা শুনিতেছিল।

বেণী। বল মা লক্ষ্মী তোমার গল্প, আজ দেখছি আমার রূপকথা শোনবার পালা।

তরুণী। রূপকথা! হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমার গল্প রূপকথার মতই আশ্চর্য। তবে শুনুন,—একটি গরিবের মেয়ে ছিল। ধরুন তার নাম—মঞ্জুষা—

বেণী। হুঁ ধরেছি, বলে যাও মা লক্ষ্মী—

তরুণী। মঞ্জুষা গরিবের মেয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে অনেক দুঃখ পেয়ে সে মানুষ হয়েছিল। তাই যখন সে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনো কারুর গলগ্রহ হবে না; যদি কোনদিন অনেক টাকা পায় তবেই বিয়ে করবে নচেৎ চিরদিন কুমারী থাকবে। কিন্তু

অনেক টাকা পাবার কোনো আশাই তার ছিল না, কারণ, ছোট ছোট মেয়েদের ক খ শিখিয়ে সে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করত। তাই চিরদিন দিদি বাবা হয়ে থাকবার সম্ভাবনাই ছিল তার বেশি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক রাজপুত্তুর কোথা থেকে এসে মঞ্জুষার সঙ্গে ভাব করতে আরম্ভ করে দিলে—তার নাম রণেন্দ্র সিংহ। এরই কথা আপনাকে বলছিলুম। বাইরে থেকে লোকটিকে সহজ মানুষ বলে মনে হয় কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে পাগল। মঞ্জুষার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল, দুজনের রোজই দেখা হ'তে লাগল। তার সম্বন্ধে মঞ্জুষার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল তা আমি বলতে পারি না, কিন্তু মনের ভাব যাই হোক, কোন অবস্থাতেই যে সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলবে তাতে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই রণেন্দ্র সিংহ যেদিন তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেদিন সে রাজী হল না। পরদিন মঞ্জুষা রাজপুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে কেন সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। চিঠি পেয়ে এই রাজপুত্র এক অদ্ভুত কাজ করলে, নিজের ধনরত্ন রাজ্যপাট সমস্ত মঞ্জুষার নামে দানপত্র করে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

বেণী। তারপর ?

তরুণী। তারপর আর কি ? মঞ্জুষা পাগলা রাজপুত্তুরকে দেশ-দেশান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

বেণী। হুঁ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটা রাজপুত্তুরের টাকাকড়ি সব নিলে ?

তরুণী। হ্যাঁ নিলে।

বেণী। নিতে তার একটুও বাধ্‌ল না ? হাত পুড়ে গেল না ?

তরুণী। না হাত পুড়ে গেল না। তার অধিকার ছিল বলে সে নিয়েছিল, নইলে নিত না।

বেণী। কি অধিকার ?

তরুণী। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হেঁট মুখে) বোধ হয় ভালবাসার অধিকার।

বেণী। বুঝলুম না।

তরুণী। (মুখ তুলিয়া) যাঁকে মঞ্জুষা ভালবাসে, যাঁকে মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছে তাঁর সম্পত্তিতে তার অধিকার নেই কি ?

বেণী। (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া) কিন্তু—কিন্তু—আর একটা

কথা, মেয়েটি কি আর একজনকে বিয়ে করেনি? একটা মাতাল লম্পট বদমায়েসকে—

তরুণী। মিথ্যে কথা। মঞ্জুষা তার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা নিয়ে তার রাজপুত্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভগবান তাকে অনেক টাকা দিয়েছেন, সে এখন ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সে তার রাজপুত্র ছাড়া আর কাউকে চায় না।

বিশ্বা। (সহসা সম্মুখে আসিয়া) কিন্তু যে লিক্‌লিকে চেহারা, ছাঁটা চুল, সোয়েটার-পরা লোকটাকে মঞ্জুষা দোতলার সামনে দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছিল, সে লোকটা তবে কে?

তরুণী। মিথ্যে কথা, মঞ্জুষা আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষের চুমু খায়নি—

বিশ্বা। তবে সে কে?

তরুণী। সে আমার বন্ধু রমলা। আমরা দুজনে এক ইস্কুলে পড়াতুম। রমলার চুল শিঙ্গ্‌ল করা—

বিশ্বা। অ্যাঁ! (ললাটে করাঘাত করিয়া) উঃ, মঞ্জু—(তরুণীর হস্তধারণের চেষ্টা করিল)।

তরুণী। (বেণীকে) আপনার চাকর ত ভারি অসভ্য—মেয়েমানুষের হাত ধরে!

বেণী। (হুঙ্কার করিয়া) বিশ্বে, শীগ্‌গির হাত ছেড়ে দে বেয়াদব—

বিশ্বা। (কম্ফর্টর ও টুপি খুলিতে খুলিতে) খুড়ো, জলদি ভাগো, রান্নাঘরে গিয়ে ঘোলের সরবৎ খাও গে, নইলে দুটো কানই তোমার কামড়ে শেষ করে দেব—কিছু থাকবে না (খুড়ো পশ্চাৎপদ)—মঞ্জু, কখন চিনতে পারলে?

মঞ্জু। (বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে হাসিয়া) দেখবামাত্রই। মুখবিকৃতি করে কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারো? জান না, দাঁত খিঁচিয়ে কেউ কেউ নিজের সত্যিকার পরিচয় দিয়ে ফেলে!

রণেন্দ্র। মঞ্জু, বড্ড ভুল করে ফেলেছি—সত্যিই আমি পাগল—

মঞ্জু। কি বলে বিশ্বাস করলে? এতটুকু আস্থা নেই? এই ভালবাসা?

রণেন্দ্র। মঞ্জু, এইবারটি মাপ কর। বল ত খুড়োর টেবিলের ওপর দুশো বার নাকখৎ দিচ্ছি।

মঞ্জু। থাক্। একে ত পাগল, তার ওপর যদি নাকটাও ঘষে মুছে যায়, (চুপি চুপি) তাহলে আমি কি নিয়ে ঘর করব?

রণেন্দ্র। (মঞ্জুকে নিকটে টানিয়া) মঞ্জু, এখনি বলছিলে আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষের চুমু খাওনি। তা—সে ত্রুটি এইবেলা সংশোধন করে নিলে হত না?

বেণী। এই, খবরদার! বুড়ো মানুষের সামনে বেয়াদবি কোরো না, আমাকে আগে রান্নাঘরে যেতে দাও। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কিন্তু বিন্তে, তুই ত তোর রাজকন্যে নিয়ে আজ নয় কাল চলে যাবি, এ বুড়োর কি দশা হবে?

রণেন্দ্র। (বেণীর পিঠ চাপড়াইয়া) ভেবো না খুড়ো, আমিও যে পথে তুমিও সেই পথে। মঞ্জুর অনেক টাকা, আমাদের দুজনকে অনায়াসে পুষতে পারবে।

বাহিরে বহু মোটর আগমনের শব্দ শোনা গেল।

বেণী। (উঁকি মারিয়া দেখিয়া) ঐ রে! সব ছোঁড়াছুঁড়িগুলো একসঙ্গে এসে পড়েছে। কিছু যে তৈরী নেই—কি হবে বিন্তে?

রণেন্দ্র। কুছ্ পরোয়া নেই খুড়ো, আজ আমরা দুজনে কাজ করব,—মঞ্জু তৈরি করবে আমি পরিবেশণ করব। কি বল মঞ্জু—অ্যাঁ? মনে কর এটা তোমার আইবুড়ো ভাতের ভোজ।

মঞ্জু সলজ্জে ঘাড় নাড়িল।

একদল তরুণ-তরুণীর কল-কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ। সকলের উপবেশন ও খাদ্যপানীয়ের ফরমাস দান।

হঠাৎ একজন তরুণ এক হাতে এক গোছা নোট তুলিয়া ধরিয়া আন্দোলিত করিতে করিতে গান ধরিল। আর সকলে, কেহ গলা মিলাইয়া কেহ বা হাতে তাল দিয়া যোগ দিল :

বেরাতের ভাগ্যে ছিঁড়েছে আজ সিকে
—ট্রা—লা—
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
ইচ্ছে হচ্ছে নাচি দিক্‌বিদিকে——ট্রা—লা—
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
বিন্তে কোথায়, নিয়ে আয় সরবৎ—
খুড়ো, বসে থেকো না জড়বৎ,
ঘোড়দৌড়ে জিতেছি আজ পাঁচ কড়া
পাঁচ সিকে—

খুড়ো ডিয়ার খুড়ো !

খেয়ে বেদম চিংড়ির কাটলেট
আইস ক্রীমে ভরিয়ে নিয়ে পেট
বিয়ে কর্‌বো আজ রাত্তিরেই প্রাণের
প্রেয়সীকে

খুড়ো ডিয়ার খুড়ো !

যবনিকা!!

গ্রন্থি-রহস্য

গোদার মতন এমন সচ্চরিত্র এবং গম্ভীর প্রকৃতির বানর আমি আর দেখি নাই। ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, গোদা বাংলাদেশের বাঁনর নয়। শুনিয়াছি, সুমাত্রা কি বোর্নিও কি ঐ রকম একটা দ্বীপ তাহার জন্মস্থান।

গোদাকে বানর না বলিয়া অতি-বানর বলা চলে। শুধু তাহার স্বভাব-চরিত্রের জন্য নয়, তাহার চেহারাটাও সাধারণ বানরের তুলনায় প্রকাণ্ড সোজা হইয়া দাঁড়াইলে তাহার খাড়াই পাঁচ ফুটের কম হইত না। গায়ে জোরও ছিল অমানুষিক, তিন সুতের লোহার ছড় দুই হাতে বাঁকাইয়া দু'ভাঁজ করিয়া দিতে পারিত।

কিন্তু গোদার গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিবার আগে তাহার মালিক শশধর-বাবুর কথা বলা উচিত। শশধরবাবু সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আমি জানি যাহা আর কেহ জানে না; পনরো বছর ধরিয়া আমি তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক ছিলাম। পারিবারিক চিকিৎসক কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না কারণ শশধরবাবুর পরিবারের মধ্যে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার বানর গোদা ছাড়া আর কেহ ছিল না।

শশধরবাবু আদৌ দরিদ্র ছিলেন। তারপর পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এক ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উপার্জন না করিয়া তিনি সংসারধর্ম কিছুই করিবেন না। অতঃপর ত্রিশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। শশধর-বাবু নানাবিধ ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়াছেন, কলিকাতার সবচেয়ে মূল্যবান

পাড়ায় বাগান-ঘেরা বাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহাদি করেন নাই। তিনি মিশুক এবং মিষ্টভাষী লোক কিন্তু বাজারে তাঁহার দুর্নাম ছিল। পরদ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার নাকি তিলমাত্র বিবেকবুদ্ধি নাই। তাঁহার সমধর্মী ব্যবসায়ীরা সকলেই তাঁহাকে ভয়ে ভক্তি করিত এবং আড়ালে শশধরবাবু না বলিয়া বিষধরবাবু বলিত।

শশধরবাবুর বয়স এখন পঞ্চান্ন বছর। বছর চারেক আগে তিনি কোথা হইতে গোদাকে আনিয়া বাড়িতে পুষিলেন। গোদা তখনও পূর্ণবয়স্ক হয় নাই, কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিয়া পাড়া-পড়শীর তাক্ লাগিয়া গেল। তবু কেহই বিস্মিত হইল না। শশধরবাবুর মত যাহাদের একক অবস্থা তাহারা টিয়াপাখী পোষে, কুকুর বেড়াল পোষে, শশধরবাবু বানর পুষিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের কী আছে? ইহার মধ্যে যে বহুদূরদর্শী বিষয়বুদ্ধি থাকিতে পারে, তাহা কাহারও মাথায় আসিল না।

গোদা কিছুদিন শিকলে বাঁধা রহিল, তারপর শশধরবাবু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ির সর্বত্র তাহার গতিবিধি, কিন্তু সে কোনও প্রকার দৌরাত্ম্য করিল না, একটা কাঁচের গ্লাস পর্যন্ত ভাঙিল না। বাগানেও সে যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনও গাছের একটা পাতা ছেঁড়ে না। বানরের এইরূপ আদর্শ চরিত্র দেখিয়া সকলে মুগ্ধ। ক্রমে শশধরবাবু তাহাকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াত করিতে শিখাইলেন। আমাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইলে গোদার হাতে চিঠি দিয়া আমার কাছে পাঠাইতেন। গোদা আসিয়া দ্বারের কড়া নাড়িত, দ্বার খুলিলে চাকরের হাতে চিঠি দিয়া গম্ভীর মুখে বেঞ্চিতে বসিয়া থাকিত। তারপর চিঠির উত্তর লইয়া মন্দমন্থর পদে ফিরিয়া যাইত।

গোদার কার্যকলাপ প্রথমটা পাড়ায় খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল কিন্তু ক্রমে তাহা সহিয়া গেল। গোদা পরিচিত দশজনের একজন হইয়া দাঁড়াইল।

এইভাবে দিন কাটিতেছে, শশধরবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গোদা চিঠি লইয়া আসিয়াছিল, তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। শশধরবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে মিনিট পাঁচেকের পথ।

শশধরবাবু একাকী ড্রয়িং রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমরা

প্রবেশ করিলে বলিলেন,—'এই যে ডাক্তার, এস। গোদা, তুই ঐ কোণের চেয়ারে বোস্ গিয়ে।'

গোদা মুখে অমায়িক গাম্ভীর্য লইয়া কোণের চেয়ারে বসিল। শশধরবাবু তখন সোফায় আমার পাশে উপবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্য করিলাম তাঁহার মুখে-চোখে একটা চাপা উত্তেজনা, পঞ্চান্ন বছরের শুষ্ক শরীরেও যেন এই উত্তেজনার আমেজ লাগিয়াছে। তিনি গলায় গিট্‌কারি দিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, —'একটা সুখবর আছে। আজ থেকে কাজকর্ম ছেড়ে দিলাম। এবার সংসারধর্ম করব।'

বুঝিলাম, এতদিনে তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। শীর্ণ গাল-বসা মুখ, চোখের কোলে চামড়া কুঞ্চিত হইয়াছে, মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলি সংখ্যালঘু হইয়া মস্তকের লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। ঝুনা চেহারা। কাজকর্ম হইতে অবসর লইবার উপযুক্ত সময় বটে। কিন্তু সংসারধর্ম! জীবনের তিন ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যে কাটাইয়া এই শরীরে নূতন করিয়া সংসার পাতা চলে কি?

মুখে মামুলি অভিনন্দন জানাইয়া বলিলাম—'তা বেশ তো, ভালই। আপনার এত টাকা ভোগ করবার লোক চাই তো!'

তিনি বলিলেন,—'শুধু তাই নয়, নিজেরও তো ভোগ করা চাই। তোমাকে ডেকেছি, আমার শরীরটা ভাল করে পরীক্ষা করবে। শরীর অবশ্য ভালই আছে। তুমি তো জানোই, রোগ-টোগ আমার কিছু নেই। তবে—'

তাঁহার মনের কথা বুঝিলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, শরীরে ব্যাধি কিছু নাই বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়াছে। এ বয়সে তাহা অস্বাভাবিক নয়। কাশিয়া বলিলাম,—'হ্যাঁ—তা—শরীর তো বেশ ভালই। তবে সংসারধর্ম করার ধকলও তো আছে—আপনার অভ্যেস নেই—'

শশধরবাবু বলিলেন,—'তোমার কথা বুঝেছি। আমি এর জন্যে তৈরী ছিলাম। তবে শোনো, আমি মতলব করেছি ভিয়েনায় যাব।'

'ভিয়েনা!'

'হ্যাঁ, ভরোনফ্ চিকিৎসার কথা জানো তো?'

'ভরোনফ্ চিকিৎসা! ওঃ—'

'আমার সন্দেহ ছিল, তাই গোদাকে পুষেছি। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব। —সস্তায় ভাল জিনিস হবে। বুঝেছ?'

চোখের ঠুলি খসিয়া পড়িল। শশধরবাবু প্রকৃতির নিকট পরাজিত হইবেন না, তাই চার বছর ধরিয়া গোদাকে পুষিতেছেন! এখন ভিয়েনায় গিয়া গোদার গ্ল্যাণ্ড্ নিজের দেহে কলম লাগাইবেন, গোদার যৌবন আত্মসাৎ করিয়া নিজে যুবক হইবেন। তাঁহার বৈষয়িক দূর-দর্শিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

শশধরবাবু ডাকিলেন,—'গোদা, এদিকে আয়।'

গোদা তৎক্ষণাৎ পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিলেন, বলিলেন, 'কেমন হবে মনে হয়?'

আমি ডাক্তার, গ্রন্থি-বদল বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা। সুতরাং সায় দিতে হইল। গোদাকে লক্ষ্য করিলাম, সে সপ্রশ্নভাবে আমাদের মুখের পানে চাহিতেছে, যেন আমাদের আলোচনার মর্মানুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে বানর, আমাদের কুটিল অভিসন্ধি বুঝিল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—'গোদা কিন্তু বাঁচবে না। তখনি তখনি মরবে না বটে, কিন্তু দু'চার মাসে শুকিয়ে মরে যাবে।'

শশধরবাবু বলিলেন,—'সে কথাও ভেবেছি। আমার গ্ল্যাণ্ড্ তো ফেলাই যেতো, ওর গায়ে বসিয়ে দেব। তাতে কিছুদিন টিকবে।'

হয়তো টিকিবে এবং মানুষের গ্রন্থি বানরের গায়ে বসাইলে কিরূপ ফল হয়, তাহারও একটা পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার ফল যে কিরূপ অদ্ভুত দাঁড়াইবে, তাহা তখনও জানিতাম না। শশধরবাবুকে নমস্কার করিয়া এবং গোদার সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া আসিলাম।

তারপর শশধরবাবু গোদাকে লইয়া ভিয়েনা গেলেন এবং মাস কয়েক পরে ফিরিয়া আসিলেন।

দেখা করিতে গেলাম। ফটকের কাছে গোদা বসিয়া আছে। তাহার চেহারার কোনও তারতম্য দেখিলাম না; মুখ তেমনি গম্ভীর। আমার পানে কপিশ-পিঙ্গল চোখ তুলিয়া একবার চাহিল। মনে হইল তাহার চোখে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ঝিলিক মারিয়া উঠিল।

বাড়ির বারান্দায় শশধরবাবু ছিলেন। চেহারার সত্যই উন্নতি হইয়াছে; বয়স দশ বছর কম বলিয়া মনে হয়। আমি সহাস্যে বলিলাম,—'এই যে, দিব্যি উন্নতি হয়েছে দেখছি।'

অতঃপর তিনি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তিনি আরক্ত নয়নে বলিলেন,—'উন্নতি হয়েছে! তুমি আমার সর্বনাশ করেছ! তুমি যদি মানা করতে তাহলে এ কাজ আমি করতাম না। যাও—বেরোও! আর যদি আমার বাড়িতে পা দাও, মার খেতে হবে।' বলিয়া ফটকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

হতভম্ব হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মাথার মধ্যে একঝাঁক দুশ্চিন্তা তাল পাকাইতে লাগিল। এ কী অভাবনীয় পরিবর্তন! শশধরবাবু হাসিমুখে মানুষের গলায় ছুরি দিতে পারেন, কিন্তু কটু কথা বলিতে আজ পর্যন্ত তাঁহাকে কেহ শোনে নাই। তবে কি হিতে বিপরীত হইয়াছে? গোদার তেজালো গ্রন্থি শশধরবাবুর বুড়া শরীরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ওলটপালট করিয়া দিয়াছে? কোন্ দিক হইতে তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে?

এই ঘটনার কয়েকদিন পর হইতে পাড়ায় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। একদিন সকালবেলা আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়া দেখি রাত্রে জানালা ভাঙিয়া কেহ ঘরে ঢুকিয়াছিল, ঔষধের শিশি, বোতল সমস্ত ভাঙিয়া তচ নচ্ করিয়া দিয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ঔষধাদি ছিল।

এমন অর্থহীন ধ্বংসলীলায় কাহার কী লাভ? শশধরবাবুর উপর ঘোর সন্দেহ হইল। তিনি আমার উপর চটিয়াছেন, তার উপর বানরের গ্রন্থি তাঁর শরীরে আছে। হয়তো এই সর্বনাশের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। বানরের গ্রন্থি তাঁহার স্বভাবকে বানরের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর আরও কয়েকটা বাড়িতে উপর্যুপরি অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। অজ্ঞাত চোর রাত্রিকালে জানালা ভাঙিয়া বাড়িতে প্রবেশ করে এবং জিনিসপত্র ভাঙিয়া-চুরিয়া চলিয়া যায়; কখনও সোনারূপার দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়।

পাড়ায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পুলিশে খবর দেওয়া হইল। পাড়ার ছেলেরা লাঠি-সোঁটা লইয়া রাত্রে পাড়া পাহারা দিতে লাগিল।

ইহা যে শশধরবাবুর কীর্তি, তাহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, উপরন্তু শশধরবাবু হয়তো মানহানির মোকদ্দমা আনিবেন।

আরও কয়েক দিন কাটিল। তারপর হঠাৎ একদিন চোর ধরা পড়িয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! চোর শশধরবাবু নয়, গোদা! আমাদের নিরীহ শান্ত-

শিষ্ট গোদা, যে-গোদা বিনা অনুমতিতে গাছের একটা পাতা পর্যন্ত ছিঁড়িত না, সে এই কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে!

আমার হিসাবের গোড়াতেই গলদ ছিল। বুঝিলাম, গোদার নিষ্পাপ শরীরে শশধরবাবুর দুষ্ট গ্রন্থি প্রবেশ করিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছে, গোদাকে দুর্জয় চোর করিয়া তুলিয়াছে। গোদা বানর, তাই এত শীঘ্র ধরা পড়িয়া গেল, শশধরবাবু ত্রিশ বছরেও ধরা পড়েন নাই।

শশধরবাবু যে আমার উপর চটিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতেও বাকি রহিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে জীবন সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গোদার শুদ্ধ-সাত্ত্বিক গ্রন্থি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া উল্টা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আশাহত শশধরবাবুর সমস্ত আক্রোশ আমার উপর পড়িয়াছিল।

কিন্তু এখন বোধ হয় আমার উপর আর তাঁহার আক্রোশ নাই। যত দিন যাইতেছে, ততই তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে। তিনি নাকি বিবাহ করিবেন না, সংসারধর্মের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিতেছি তিনি যোগ অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, শীঘ্রই শ্রীমৎ হনুমানদাস বাবাজী নামক সাধুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

গোদার জন্য কিন্তু বড় দুঃখ হয়। পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া লোহার খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়াছে, আর শশধরবাবু তাহার গ্রন্থি চুরি করিয়া ব্রহ্মলাভ করিবেন! এর চেয়ে অবিচার আর কি হইতে পারে?

আধিদৈবিক

পুলিনবিহারী পালের নাম অল্প লোকেই জানে। অথচ তাঁহার মত প্রগাঢ় পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানী পুরুষ বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। দেশী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব তাঁহার এত ছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের নামের পিছনে ময়ূরপুচ্ছ রচনা করিতে পারিতেন। জ্ঞানমার্গের পাকা সড়কের কথা ছাড়িয়া দিই, সমস্ত গলিঘুঁজির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; অতিবড় গূঢ় বিদ্যার আলোচনা করিয়াও কেহ তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না। কেবল একটি বিদ্যা তাঁহার ছিল না—ঘানিযন্ত্র হইতে কি

করিয়া তৈল বাহির করিতে হয় তাহা তিনি শিখিতে পারেন নাই। এই জন্যই বোধ করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার খোঁজ রাখে না।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল; ভক্তিভরে তাঁহাকে পুলিন্দা বলিয়া ডাকিতাম। বিপদে আপদে অর্থাৎ বিদ্যাঘটিত কোনও সঙ্কটে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতাম। কখনও নিরাশ করেন নাই, তাঁহার ভাস্বর বুদ্ধির প্রভায় মনের সমস্ত সংশয় ঘুচাইয়া দিয়াছেন। মানুষ হিসাবে হয়তো সহজ ও স্বাভাবিক বলা যায় না, সাধারণে তাঁহাকে খামখেয়ালী বলিবে। কিন্তু এমন পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ, একান্তভাবে নিরভিমান মানুষ আর দেখি নাই। বিবাহাদি করেন নাই; পয়সার পিছনে দৌড়িবার মত মানসিক দীনতা যেমন তাঁহার ছিল না, পয়সার প্রয়োজনও তেমনি খুব কম ছিল। উচ্চ অঙ্গের দুই একটা ইংরেজী ও মার্কিন পত্রিকাতে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু কিছু টাকা পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার অনাড়ম্বর একক জীবন চলিয়া যাইত।

বছর দুই পুলিন্দাকে দেখি নাই; মাঝে মাঝে ডুব মারা তাঁহার অভ্যাস। একদিন খবর পাইলাম, তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বজ্‌বজ্‌ লাইনের একটি জনপদে বাস করিতেছেন এবং একাগ্রচিত্তে বাংলা ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করিতেছেন। বিস্মিত হইলাম না, কারণ অকস্মাৎ ডুব মারিয়া অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত স্থানে আবির্ভূত হওয়া পুলিন্দার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য।

একদিন বৈকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। অনেকদিন তাঁহাকে দেখি নাই সেজন্যও বটে, তা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। কয়েক মাস হইতে একটা আধ্যাত্মিক সংশয় আমার মনকে পীড়া দিতেছিল; বোধ করি ত্রিশের কোঠা পার হইলে সকলেরই এইরূপ হয়। আধ্যাত্মিক সংশয়টি আর কিছুই নয়, সেই আদিম সংশয়—জন্মান্তর আছে কিনা, মরিবার পর আত্মা থাকে কিনা, ভূতপ্রেত আছে কিনা। প্রাচীন মুনি ঋষি অবতারগণের সহিত আধুনিক মুনি ঋষি ও চিন্তাবীরগণের এ বিষয়ে এত অধিক মতদ্বৈধ যে মনটা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল। খাঁচায় ধরা পড়া ইঁদুরের মত আমার বুদ্ধি একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল কিন্তু কোনও দিকেই পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এইরূপ মানসিক সঙ্কটের মধ্যে পুলিন্দার খবর পাইয়া ভাবিলাম তাঁহার কাছেই যাই, এ সমস্যার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সন্তোষজনক সমাধান যদি কেহ দিতে পারে তো সে পুলিন্দা।

তাঁহার আস্তানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ছোট্ট স্টেশনের নিকটে প্রকাণ্ড

এক তামাকের গুদামে তিনি বাস করিছেন। দ্বিতল বাড়ির উপরতলায় তামাকের পাতার বস্তা ঠাসা আছে, নিচের তলায় ছুটি ঘর লইয়া পুলিন্দা থাকেন। উপরতলার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, অধিকাংশ সময়ই উপরতলাটা বন্ধ থাকে।

এই দুই বৎসরে পুলিন্দার বয়স যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মাথাটি স্বভাবতই ডিম্বাকৃতি; লক্ষ্য করিলাম, ডিম্বের উপর হইতে চুল ঝরিয়া গিয়া শীর্ষস্থানটি বেশ চকচকে হইয়াছে; নাকের উপর একজোড়া 'চাল্‌শে'র চশমা বসিয়াছে। কিন্তু স্বভাব বিন্দুমাত্র বদ্‌লায় নাই; তেমনি মেঝেয় মাদুর পাতিয়া চারিদিকে পুঁথি কাগজপত্র ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে চশমার উপর দিয়া দেখিয়া সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, 'এই যে এসেছ।' এবং এক টিপ নস্য লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সুরু করিয়া দিলেন।

বলিলেন,—'ছাখো, বাংলা ভাষাটা দিন দিন বড় দুর্বল হয়ে পড়ছে—আর সে তেজ নেই, ধমক নেই, বড় বেশি বিনয়ী বড় বেশি মিহি হয়ে যাচ্চে। ঐ যে আমাদের সাহিত্যে ব্রাহ্ম সংস্কৃতি ঢুকেছিল এটা তারই ফল। এমন দিন ছিল যখন বাঙালী রেগে গেলে দু'চারটে গরম গরম কথা বলতে পারত, শব্দের তাল ঠুকে বহ্বাস্ফোট করতে পারত; কিন্তু এখন বাঙালীকে জুতো-পেটা করলেও তার মুখ দিয়ে গোঙানি আর কাৎরানি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ বেরুবে না। বেরুবে কোত্থেকে? ভাষার সে হুঙ্কার, শব্দের সে দাপট থাকলে তো! বাঙালী জাতটাও তাই দিন দিন মিইয়ে যাচ্চে মেদিয়ে যাচ্চে। বাঙালীকে আবার চাঙ্গা করে তুলতে হলে নতুন নতুন জোরালো শব্দ আমদানি করতে হবে—সংস্কৃত ইংরিজি ফারসী পুস্তকে যেখানে যত জবরদস্ত শব্দ আছে সব বাংলা ভাষার পেটের মধ্যে পুরে দিয়ে তাদের হজম করাতে হবে। ছাখো, বাংলা ভাষাটা অপভ্রংশের ভাষা। অপভ্রংশের দোষ এই যে, সে শব্দকে মোলায়েম ক'রে ফেলে, সহজ ক'রে ফেলে। ও আর চলবে না। এখন থেকে ইয়া বড় বড় গোব্দা গোব্দা মৌলিক শব্দ ব্যবহার কর। নৈলে নিস্তার নেই।'

আমি ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম—'কিন্তু ক্রমাগত সাধু ভাষায় কথা বলা—'

পুলিন্দা বলিলেন—'তুমি একটি পুঙ্গব।'

চমকিয়া বলিলাম—'সে কি ?'

'তিনি বলিলেন—'মানে ষাঁড়। আমার কথাটা ভাল করে বোঝো—'

অতঃপর দুই ঘণ্টা ধরিয়া বঙ্গবাণীর শিরাধমনীতে নূতন রক্ত সঞ্চারের প্রসঙ্গ চলিল; বাংলা ভাষা তথা বাঙালীর যে নিদানকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং অচিরাৎ নাদব্রহ্মরূপী বিষ-বটিকা প্রয়োগ না করিলে রোগীর কোনও আশাই নাই একথা পুলিন্দা অত্যন্ত মজবুতভাবে প্রমাণ করিয়া দিলেন। উদ্বিগ্নভাবে শ্রবণ করিলাম। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত প্রশ্নটি ভুলি নাই; তাই অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি যখন আলো জ্বালিতে উঠিলেন, তখন আমি তাক্ বুঝিয়া আমার আধ্যাত্মিক সমস্যাটি পেশ করিয়া দিলাম।

পুলিন্দা আলো জ্বালিয়া আবার মাদুরে আসিয়া বসিলেন; নাকের মধ্যে ডবল-টিপ নস্য ঠুসিয়া দিয়া সজলনেত্রে বলিলেন,—'ভূত প্রেত আত্মা পরমাত্মা পরলোক জন্মান্তর অসিদ্ধ—কারণ প্রমাণাভাব।'

এইভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া পুলিন্দা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন; ক্রমে প্রসঙ্গ জমিয়া উঠিল; আমিও মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করিবার স্থান নাই; কিন্তু যুক্তির ধাপে ধাপে প্রমাণের সোপান রচনা করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত আমার বুদ্ধিকে যে স্থানে লইয়া উপনীত করিলেন সেখানে ভূতপ্রেত নাই জন্মান্তরও নাই। দেখা গেল আসলে ওগুলি বাসনাপ্রণোদিত অলীক ভাবনা—**wishful thinking**! চার্বাক হইতে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ পর্যন্ত সমস্ত মনীষীর উক্তি তাঁহার যুক্তিকে সমর্থন করিল—শরীরই সর্বস্ব, মন-বুদ্ধি-আত্মা সমস্তই দেহের বিকার মাত্র, সুতরাং শরীর নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?

রাত্রি অনেক হইয়া গেলেও আলোচনার শেষে মনে বেশ শান্তি অনুভব করিলাম; যাহোক তবু পাকা রকম একটা কিছু পাওয়া গেল। আত্মার দেহবিমুক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যদি নাই থাকে তবে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল। দু'নৌকায় পা দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করার কোনও মানে হয় না।

আর একদিন আসিব, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি হঠাৎ মাথার উপর ভীষণ দুম্‌দাম্ শব্দে চমকিয়া উঠিলাম; যেন উপরের গুদাম ঘরে অনেকগুলা পালোয়ান যৌথভাবে মল্লযুদ্ধ সুরু করিয়া দিয়াছে। উপরে কেহ থাকে না শুনিয়াছিলাম,

তামাক পাতার আড়তে মানুষের থাকা সম্ভবও নয়; তবে এত রাত্রে কাহারা বন্ধ ঘরের মধ্যে এমন দুর্দান্ত দুরন্তপনা আরম্ভ করিয়া দিল?

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম—'ও কী?'

পুলিন্দা নিশ্চিন্তভাবে নাকের চশমা খাপে পুরিতে পুরিতে বলিলেন—'ও কিছু নয়। এগারোটা বেজেছে তো! রোজ রাত্রে ঐ রকম হয়। ওপরে কয়েকটা ভূত আছে, তারাই এই সময় দাপাদাপি করে।'

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। উপরে দাপাদাপি চলিতে লাগিল। বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উপরের ঘরে সত্যই যদি ভূতের পাল কুস্তি লড়িতেছে তবে এতক্ষণ ধরিয়া কী শুনিলাম?

পুলিন্দা বলিলেন—'ভয়ের কিছু নেই, ওরা কোনও অনিষ্ট করে না। দশ মিনিট পরে সব চুপচাপ হয়ে যাবে।'

আমি বলিয়া উঠিলাম,—'পুলিন্দা! সত্যিই ওরা ভূত? আপনি বিশ্বাস করেন?'

তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ, আমি খুব ভাল করে অনুসন্ধান করেছি, জ্যান্ত জীব হতে পারে না। ইঁদুর বেড়াল তামাকের ধার ঘেঁষে যাবে না, আর মানুষও নয়। সুতরাং ভূতই বটে।'

'কিন্তু—কিন্তু—এতক্ষণ ধরে এই যে আপনি প্রমাণ করলেন—'

পুলিন্দা বলিলেন—'তুমি একটি ইঁদম—মানে হাঁদা। প্রমাণের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্বন্ধ কি? ভূত আছে এটা ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রমাণ করা যায় না, তাই ব'লে বিশ্বাস করব না? ঐ যারা ওপরে ছুটোপাটি করছে ওরা কি প্রমাণের তোয়াক্কা রাখে? জেনে রাখো, যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আচ্ছা রাত হয়েছে, আজ এস তাহলে—'

উপরে ভূতের নৃত্য চলিতে লাগিল। আমি চলিয়া আসিলাম।

ভূত-ভবিষ্যৎ

গভীর রাত্রে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম। টেবিলের এক কোণে মোমবাতিটা গলদশ্রু হইয়া জ্বলিতেছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখি প্রেত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলম রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম,—'আমি পারব না।'

প্রেত কাতর চক্ষে আমার পানে চাহিয়া রহিল; মিনতিভরা স্বরে বলিল,—'আপনি দয়া না করলে আমার আর উপায় নেই। মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। পাড়ার ছোঁড়াগুলো তার পেছনে লেগেছে।'

প্রেতের কণ্ঠস্বর ঘষা-ঘষা; গ্রামোফোন রেকর্ডে গান সুরু হইবার আগে যেরূপ শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—'তা আমি কি করব? আপনি অন্য কারুর কাছে যান না।'

প্রেত বলিল,—'আর কার কাছে যাব? সবাই চোর। আপনি দয়া করুন।'

ভূতের কথায় মনটা একটু নরম হইল। সত্য বটে আমি দেনার দায়ে লুকাইয়া আছি, কিন্তু তবু চুরি যে করিব না—এ বিশ্বাস ভূতেরও আছে। বলিলাম,—'আচ্ছা, আপনি ঐ মেয়েটাকে কিম্বা তার বাপকে আপনার কথা বললেই পারেন, তারা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। আমাকে কেন?'

প্রেত একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল; মোমবাতির শিখা একটু নড়িয়া উঠিল। সে বলিল,—'চেষ্টা কি করিনি? আমাকে দেখেই ভয়ে হাউমাউ ক'রে উঠল। তারপর বাড়িতে রোজা ডেকে ঝাড়িয়েছে। ওদিকে আমার আর যাবার উপায় নেই।'

রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা। আমি ফুৎকারে বাতি নিভাইয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। প্রেত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তক্তপোশের পাশে বসিল, করুণস্বরে বলিল,—'দয়া করুন। আপনার কল্যাণ হবে।'

বড় বিপদে পড়িয়াছি।

আমি একজন সাহিত্যিক। বাজারে নাম হইয়াছে; কিন্তু নাম হইলেই সাহিত্য-বাজারে টাকা হয় না। ফলে, একদিন যাঁহারা বন্ধু ছিলেন তাঁহারা

মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; আমাকে দেখিলেই মুখ ভার করেন, কিম্বা তাগাদা করেন।

বন্ধুত্বের দাক্ষিণ্য যখন একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল তখন স্থির করিলাম কলিকাতা হইতে অন্তত কিছু দিনের জন্য গা-ঢাকা দিব। ভাগ্যক্রমে একজন প্রকাশক একটি উপন্যাস লেখার বরাত দিলেন; কিছু দাদনও আদায় করিলাম। সেই দাদনের টাকা লইয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি শহরে জীর্ণ খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছি। উপন্যাস শেষ না হইলে ফিরিব না।

আমার খোলার ঘরের জানালা ভাঙা; খাপ্‌রার ছাউনীও নিরবচ্ছিন্ন নয়। আসবাবের মধ্যে কীটদষ্ট তক্তপোশ, নড়বড়ে টেবিল ও একটি টুল। যিনি ঘরটি ভাড়া দিয়াছেন তিনি পাশেই পাঁচিল-ঘেরা মস্ত বাড়িতে থাকেন, মহাজনী কারবার আছে। এ জগতে মহাজনী কারবার কিম্বা পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা না করিতে পারিলে বাঁচিয়া সুখ নাই। মহাজন নিকুঞ্জবাবুর চোখ দুটি বড় সন্দিগ্ধ; এক মাসের ভাড়া আগাম লইয়া থাকিতে দিয়াছেন। অল্প দূরে একটি সস্তা ভোজনালয় আছে, সেইখানেই আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছি।

প্রথম তিনদিন বেশ নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। উপন্যাস সুরু করিয়া দিয়াছি; খোলার ঘরে যে উপদেবতার যাতায়াত আছে তাহা জানিতে পারি নাই। চতুর্থ দিন রাত্রে আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম। আমার অভ্যাস, বিছানায় শুইয়া একটি বিড়ি সেবন না করিলে নিদ্রা আসে না। দেশলাই জ্বালিতেই চোখে পড়িল কে একজন তক্তপোশের পাশে বসিয়া আমার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। দু'টা আগ্রহ-ভরা চোখ—

চমকিয়া বলিয়া উঠিলাম,—'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা মিলাইয়া গেল।

আবার দেশলাই জ্বালিলাম। কেহ নাই। ভাবিলাম ভুল দেখিয়াছি। অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিলে এমন হয়; চোখের ভ্রান্তি।

বিড়ি পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার স্নায়ু দুর্বল নয়; ভূতের ভয় করি না। ভূত থাকে থাক্, তাহাকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই; ভূতের চেয়ে মানুষকেই ভয় বেশি।

পরদিন সকালে রাত্রির কথা আর মনেই রহিল না। সারাদিন উপন্যাস লিখিলাম। উপন্যাসে প্রেমের প্রগতি দেখাইতেছি। আমার হিরো একেবারে

নিম্নতম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছে; এক মেথর-কন্যার প্রতি অবৈধভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পৈশাচ বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। (পৈশাচ বিবাহের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে অভিধান দেখুন)। কাহিনী বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।'

তারপর রাত্রে যথারীতি তক্তপোশে শয়ন করিয়া বিড়ি সেবনপূর্বক ঘুমাই-বার উপক্রম করিলাম। কিন্তু ঘুমাইতে হইল না; হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া শুনিলাম, ঘষা-ঘষা গলায় কে বলিতেছে,—'ঘুমোলেন নাকি?'

অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না; কিন্তু মনে হইল যিনি প্রশ্ন করিলেন তিনি তক্তপোশের পাশে বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম,—'আপনি কে?'

উত্তর হইল,—'কি বলে পরিচয় দেব? যখন বেঁচে ছিলাম তখন নাম ছিল নন্দদুলাল নন্দী।'

বলিলাম,—'খাসা নাম। আপনি তাহলে প্রেত?'

প্রেত বলিল,—'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না—আমার কোনও বদ্ মতলব নেই।'

আমি একটা হাই তুলিয়া বলিলাম,—'বদ্ মতলব থাকলেও আপনি আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবেন না—আপনি তো হাওয়া।—তবে আমি ভয় পেয়ে নিজে নিজের অনিষ্ট করতে পারি বটে।'

প্রেত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'তা বটে।'

মনে পড়িল দেশলায়ের বাক্সটা মাথার শিয়রেই আছে। সেই দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলাম,—'আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে কি?'

প্রেত বলিল,—'দরকার এমন কিছু নয়। কথা কইবার লোক পাই না—আপনি স্বজাতি—তাই—'

দেখিলাম প্রেতের অবস্থা আমারই মতন; সম্ভবত বন্ধুদের নিকট টাকা ধার লইয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দেশলাই জ্বালিতে উদ্যত হইয়াছি, সে বলিল,—'দেশলাই জ্বালবেন?'

'কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

'হঠাৎ আলো জ্বাললে একটু অসুবিধে হয়।'

'তবে থাক্। কাল আপনার চেহারাটা লহমার জন্যে দেখেছিলাম, ভাল ঠাহর করতে পারিনি। তা থাক্।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভাবিলাম, বেচারা কথা কহিবার লোক পায় না, স্বজাতি পাইয়া আলাপ করিতে আসিয়াছে, আমার কিছু বলা-কহা দরকার।

'আপনি কি কাছেপিঠে কোথাও থাকেন

'পাশে পাঁচিল-ঘেরা বাগানে পুরোনো নিমগাছ আছে, তাতেই থাকি।'

'তাই নাকি? আপনিও নিকুঞ্জবাবুর ভাড়াটে? কত ভাড়া দিতে হয়?'

প্রেত রসিকতা বুঝিল না, বলিল,—'বাড়ি বাগান একদিন আমারই ছিল। আমার প্রপৌত্রের কাছে নিকুঞ্জ পাল কিনেছে।'

'বটে! আপনার প্রপৌত্র বেঁচে আছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। তার অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গেছে—'

'প্রপৌত্র! তাহলে আপনি আন্দাজ আশী-নব্বই বছর আগে ছিলেন?'

'সিপাহী যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম। মুচ্ছুদির কাজে পয়সা করেছিলাম; ভেবেছিলাম সাতপুরুষ ব'সে খাবে—কিন্তু—'

প্রেতের কথা শেষ হইল না। আমি অভ্যাসবশত অন্যমনস্কভাবে একটি বিড়ি মুখে দিয়া ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিলাম। প্রেতের ত্রস্ত চকিত চেহারা-খানা ক্ষণেকের জন্য দেখা গেল; তারপর সে হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

আবার হয়ত আসিবে ভাবিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া বিড়ি টানিলাম। কিন্তু প্রেত আর আসিল না। তারপর কয়েক রাত্রি তাহার দেখা পাই নাই।

এদিকে আমার উপন্যাস দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। হিরো এখন এক রজক-কন্যার কৌমার্যহানির উদ্যোগ করিতেছে। এর পর আসিবে গোপ-কন্যা। স্থির করিয়াছি, এইভাবে ধাপে ধাপে তুলিয়া হিরোকে এক [illegible]র সহিত বিবাহ দিয়া ছাড়িব। উপন্যাসের নাম রাখিয়াছি—স্বর্গের সিঁড়ি।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর বাতি জ্বালিয়া লিখিতে বসিয়াছিলাম। খুব মন লাগিয়া গিয়াছিল, সময়ের হিসাব ছিল না। মনোজগতে নিরঙ্কুশ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া স্থূল জগতে ফিরিয়া আসিলাম। দেখি, টেবিলের অপর পারে দাঁড়াইয়া প্রেত মিটিমিটি হাসিতেছে।

আজ প্রেতকে প্রথম ভাল করিয়া দেখিলাম। সূক্ষ্ম মূর্তি; তবু চেহারার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নাই। গায়ে ফিতা-বাঁধা মেরজাই, মেটে-মেটে রং, সরু পাকানো গোঁফ; চোখদুটি সজাগ ও প্রাণবন্ত। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন। নিতান্তই সেকালের বাঙালী চেহারা।

প্রেত বলিল,—'কি লেখেন এত?'

বলিলাম,—'উপন্যাস।'

'সে কাকে বলে? আমাদের সময় তো ছিল না।'

উপন্যাস কী তাহা বুঝাইয়া দিলে প্রেত সাগ্রহে বলিল,—'ও—গোলে বকাওলির গল্প—রূপকথা! তা বলুন না, শুনি।

সংক্ষেপে গল্পটা বলিলাম। শুনিয়া ভূত বলিল,—'ছি ছি।'

বলিলাম,—'ছি ছি বললে চলবে কেন? এ না হলে বই কাটে না। যাহোক, ক'দিন আসেননি যে?'

প্রেত বলিল,—'আপনি অদ্ভুত লোক। অন্য লোক ভূত দেখলে আঁৎকে ওঠে, আপনি গ্রাহ্যই করেন না।'

বলিলাম,—'সে-রাত্রে আচম্‌কা দেশলাই জ্বেলেছিলাম তাই রাগ হয়েছিল বুঝি?'

'রাগ নয়—চম্‌কে গিয়েছিলাম। চম্‌কে গেলে আর শরীর ধারণ করা যায় না।'

খাতা টানিয়া লইয়া বলিলাম,—'আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, পরিচ্ছেদটা শেষ করতে হবে। মাঝে মাঝে আসবেন, গল্প সল্প করা যাবে।'

'আচ্ছা।'—প্রেত চলিয়া গেল।

তারপর প্রেত প্রায় প্রতি রাত্রেই আসে; কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়, তারপর 'আসুন' বলিলেই হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। এ আমার শাপে বর হইয়াছে। এখানে আসিয়া মানুষ প্রতিবেশীর সহিত ইচ্ছা করিয়াই আলাপ পরিচয় করি নাই; তৎপরিবর্তে যাহা পাইয়াছি তাহা মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়। প্রেতের সঙ্গে যতটুকু ইচ্ছা মেলামেশা করি, সঙ্গ-পিপাসা মিটিলেই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলি, সে চলিয়া যায়। মানুষ প্রতিবেশীকে এত সহজে তাড়ানো যাইত না। 'ঘণ্টা ধ'রে থাকেন তিনি সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায়।'

আমার ভূতই ভাল।

একদিন ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—'আচ্ছা, আপনি সংসার করেছেন?'

বলিলাম,—'সংসার? মানে, বিয়ে? সর্বনাশ, একলা শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। ও কার্যটি আমাকে দিয়ে হবে না।'

ভূত একটু হাসিল। কিছুক্ষণ যেন অন্যমনস্ক থাকিয়া হঠাৎ বলিল,—'দেখুন আপনার সঙ্গে এ ক'দিন মেলামেশা করে বুঝেছি আপনি সজ্জন—চোর-ছ্যাচড় নয়। আমি অনেকদিন থেকে আপনার মতন একজন মানুষ খুঁজছি। আমার একটি অনুরোধ আছে, আপনাকে রাখতে হবে।'

ভূত যে নিছক আমার সঙ্গ-লাভের জন্য নয়, একটা মৎলব লইয়া আমার কাছে ঘোরা-ঘুরি করিতেছে তাহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই। বোঝা উচিত ছিল; মুচ্ছুদ্দির প্রেতাত্মা বিনা প্রয়োজনে কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে, মনে করাও অন্যায়।

সতর্ক ভাবে বলিলাম,—'কি অনুরোধ?'

ভূত তখন টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া নিজের ও বংশের ইতিকথা বলিতে আরম্ভ করিল। আন্দাজ করিলাম কাঁকড়াবিছার ল্যাজে যেমন হুল থাকে, অনুরোধটা আছে গল্পের শেষে।

নন্দদুলাল নন্দী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করিয়া প্রচুর উপার্জন করিয়াছিল। জমিদারী বাগান শ্বেত বালাখানা সবই হইয়াছিল। তাহার যখন তিপ্পান্ন বছর বয়স তখন সিপাহী-বিদ্রোহের গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। এদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না; কিন্তু যাহার টাকা আছে তাহার আশঙ্কার শেষ কোথায়? একদা গভীর রাত্রিকালে নন্দদুলাল একটি পিতলের ঘুটিতে একশত মোহর পুরিয়া বাগানের নিমগাছ-তলায় পুঁতিয়া রাখিল। আর সবই যদি যায়, একশত আকবরী মোহর তো বাঁচিবে।

ম্যুটিনীর হাঙ্গামা এদিকে আসিল না বটে, কিন্তু অরাজকতার সময়, হঠাৎ একদিন নন্দদুলালের বাড়িতে ডাকাত পড়িল। নন্দদুলালের হৃৎযন্ত্র দুর্বল ছিল, সে বেবাক হার্টফেল করিয়া মারা গেল। ডাকাতেরা লুটপাট করিয়া চলিয়া গেল। তারপর ক্রমে দেশ ঠাণ্ডা হইল; শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

নন্দদুলাল হিসাবী লোক ছিল। তাই তাহার আমলে 'চাল' বেশি বাড়িতে পায় নাই। তাহার পুত্র যশোদাদুলালের আমলে বাবুয়ানি বাড়িল; আগে দোল-দুর্গোৎসবের সময় হরিকীর্তন কথকতা হইত, এখন বাঈ নাচ দেখা দিল। তারপর তস্য পুত্র ব্রজদুলাল আসিয়া বিলাসিতার চরম করিয়া ছাড়িয়া দিল; জুতায় মুক্তার ঝালর লাগাইয়া, বাঈজীর পল্টন পুষিয়া, একশ' টাকার নোটের ঘুড়ি উড়াইয়া সে যখন পৃথিবী হইতে বিদায় লইল তখন লক্ষ্মীও বিদায় লইয়াছেন। বাকি আছে শুধু বাগান-ঘেরা বাড়িখানা।

ব্রজদুলালের পুত্র গোপীদুলাল নিরীহ মানুষ। বাপের ভুক্তাবশিষ্ট এঁটো পাতায় যত দিন পারিল চালাইল; শেষ পর্যন্ত তাহাকে বাড়ি বিক্রয় করিতে হইল। তারপর গত বিশ বছর ধরিয়া গোপীদুলাল বাড়ির বিক্রয়মূল্য লইয়া এবং সামান্য কাজকর্ম করিয়া অতি দীন ভাবে সংসার চালাইতেছে। তাহার

স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে; একমাত্র কন্যার বয়স একুশ, কিন্তু এখনও তাহার বিবাহ দিতে পারে নাই। উপরন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ তাহাকে দুরন্ত হাঁপানী রোগে ধরিয়াছে।

কাহিনী শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনার প্রপৌত্র মানে গোপীদুলালবাবু এখানেই থাকেন ?'

প্রেত বলিল,—'হ্যাঁ, বেনে পাড়ার এক ধারে একটা ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছে। তারও বেশি দিন নয়, তাকে কালে ধরেছে। আর তো কিছু নয়, গোপীদুলাল ম'লে মেয়েটা ভেসে যাবে।' বলিয়া করুণ নিশ্বাস ফেলিল।

সন্দেহ হইল প্রেত বুঝি ঘটকালি করিতেছে। মনকে দৃঢ় করিয়া বলিলাম,—'দেখুন আমি আগেই বলেছি বিয়ে করবার মত অবস্থা আমার নয়। আপনিও অনুরোধ করবেন না।'

প্রেত তাড়াতাড়ি বলিল,—'না না, ও অনুরোধ করছি না। আমি বলছিলাম, আপনি যদি দয়া ক'রে মোহরগুলো গোপীদুলালের কাছে পৌঁছে দেন তাহলে সে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মরতে পারে।'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'মোহরের ঘটি কি এখনও নিমতলায় পোতা আছে নাকি ?'

প্রেত বলিল,—'হাঁ। মরার আগে কাউকে ব'লে যেতে পারলাম না; যেমন পুতেছিলাম তেমনি পোতা আছে। তাই তো নিমগাছ ছাড়তে পারি না।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। আশ্চর্য এই যে ভূতের কথায় তিলমাত্র অবিশ্বাস জন্মিল না। একশত আকবরী মোহর! আকবরী মোহরের দাম কত জানি না কিন্তু বর্তমান কালে একশত মোহরের দাম দশ হাজার টাকার কম হইবে না।

ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম,—'এত সোনা! এর দাম যে অনেক।'

ভূত বলিল,—'সেইজন্যেই তো কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে। এক আপনি ভরসা।'

চমকিয়া উঠিলাম,—'আমি! আমি কি করব।'

ভূত মিনতির স্বরে বলিল,—'ঘটিটা খুঁড়ে বার করতে হবে। বেশি খুঁড়তে হবে না, হাত খানেক খুঁড়লেই পাওয়া যাবে—'

'কিন্তু খুঁড়বে কে ? আমি ?'

ভূতের চক্ষু নীরবে অনুনয় জানাইল। আমি চটিয়া বলিলাম,—'বেশ ভূত

তো আপনি! ও বাগান এখন নিকুঞ্জ পালের দখলে, সে আমাকে খুঁড়তে দেবে কেন? আর আমিই বা তাকে বলব কি? বলব, মশায়, আপনার বাগানে মোহর পোতা আছে তাই খুঁড়তে এসেছি?'

ভূত বলিল,—'না না আপনি দিনের বেলা যাবেন কেন? দুপুর রাত্রে চুপি চুপি পাঁচিল ডিঙিয়ে—নিমগাছটা বাড়ি থেকে অনেক দূরে, বাগানের এক কোণে—রাত্রে বাগানে কেউ থাকবে না—'

আমি বিড়ি ধরাইবার উপক্রম করিয়া বলিলাম, 'মাপ করবেন, আমার দ্বারা হবে না। রাত্রিবেলা পরের বাগানে যদি ধরা পড়ি, ঠ্যাংয়ে দড়ি পড়বে। নিকুঞ্জ পাল এমনিতেই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। আমি পারব না।'

দেশলাই জ্বালিলাম।

তারপর কয়রাত্রি উপর্যুপরি ভূতের সঙ্গে ঝুলোঝুলি চলিল। আমি অটল, ভূতও নাছোড়বান্দা। আমি যত বলি—'পারব না', ভূত ততই বলে —'দয়া করুন'। যে-রাত্রির দৃশ্য লইয়া আরম্ভ করিয়াছি, তাহার পরও কয়েক রাত্রি কাটিয়া গেল। হঠাৎ দেশলাই জ্বালিয়া ভূতকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভূতের এখন দেশলাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেলেও আবার ফিরিয়া আসে এবং কাতর কণ্ঠে বলে,—'দয়া করুন। সদ্‌বংশের মেয়ে, নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। রাত্রে ঘুম নাই; সারারাত্রি ভূতের সঙ্গে তর্ক করিতেছি। উপন্যাস লেখা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একদিন মরীয়া হইয়া বলিলাম,—'বেশ, রাজি আছি। কিন্তু আমাকেও মোহরের ভাগ দিতে হবে।'

ভূত মুচ্ছুদ্দি; সে ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া বলিল,—'বেশ, আপনি পাঁচ পারসেণ্ট দালালী পাবেন। পাঁচখানা মোহর আপনার।'

অতঃপর আর 'না' বলিবার উপায় রহিল না। পাঁচখানা মোহর, মানে পাঁচশত টাকা। পাঁচশত টাকার জন্য অতি বড় দুঃসাহসিক কাজ করিবেন না এমন সাহিত্যিক কয়জন আছেন? আমার দুঃখ এই যে বাকি পঁচানব্বইটি মোহর হজম করিতে পারিব না। পেটের দায়ে কুৎসিত উপন্যাস লিখি বটে, কিন্তু চুরি করিতে পারিব না। তাছাড়া, চুরি করিয়া যাইব কোথায়, নন্দদুলাল মুচ্ছুদ্দির হাত এড়াইব কি করিয়া?

রাত্রি আড়াইটার সময় প্রেতের অনুগামী হইয়া বাহির হইলাম। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ ছিল, তাহারই আলোয় পাঁচিল টপকাইয়া নিকুঞ্জ

পালের বাগানে ঢুকিলাম। ভূত দেখিয়া যাহা হয় নাই তাহাই হইল, বুকের ভিতর দুম্‌দাম শব্দ হইতে লাগিল।

ভূত দেখাইয়া দিল, এক স্থানে কয়েকটা কোদাল শাবল খন্তা পড়িয়া আছে। একটা খন্তা তুলিয়া লইলাম। ভূত পথ দেখাইয়া নিমগাছ-তলায় লইয়া গেল। নিমগাছ-তলায় একটা স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভূত কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া তদারক করিতে লাগিল, আমি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম। চারিদিকে নিশুতি, কোথাও সাড়াশব্দ নাই; মনে হইল আমিও মানুষ নই, কোন্ স্বপ্নসঙ্কুল সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা।

আধঘণ্টার মধ্যে ঘটি লইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঘটির গায়ে সবুজ রঙের কলঙ্ক, কিন্তু ভিতরে একশত নিষ্কলঙ্ক আকব্বরী মোহর ঝক্‌মক্ করিতেছে।

ভূত আত্মাভিমানসূচক একটা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—'কি বলেছিলাম!'

আমার গায়ে তখন কালঘাম ঝরিতেছে। ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আমি একটা বিড়ি ধরাইলাম। ভূতকে বেশি আস্কারা দেওয়া ভাল নয়।

পরদিন সকালবেলা আবার ঘটি খুলিয়া দেখিলাম, স্বপ্ন নয় মায়া নয় মতিভ্রম নয়, সত্যই একশত মোহর। তাহার মধ্যে হইতে পাঁচটি সরাইয়া রাখিয়া বাকি পঁচানব্বইটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া বাহির হইলাম। আর দেরি নয়। সোনার মোহ বড় মোহ; বেশিক্ষণ কাছে রাখিলে হয়তো লোভ সামলাইতে পারিব না।

বেনে পাড়ার একপ্রান্তে গোপীদুলালের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। নোনা-ধরা চটা-ওঠা বাড়ি; তাহার সম্মুখে ঝাঁকড়া-চুলো একটি ছোকরা শিস্ দিতে দিতে পায়চারি করিতেছে। আমি দ্বারের কড়া নাড়িতেই ছোকরা আমার পানে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া পড়িল।

একটি মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; তারপর অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া একটু ভিতর দিকে সরিয়া গিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইল, স্খলিত স্বরে বলিল,—'কাকে চান? বাবা বাড়ি নেই।'

বুঝিলাম গোপীদুলালের আইবুড় মেয়ে। গায়ের রঙ ফরসা, মুখখানি নরম ও সুশ্রী। সর্বাঙ্গে ভরা যৌবন। কিন্তু চোখেমুখে আতঙ্ক, যেন নিজের যৌবনের ভয়ে সর্বদা ত্রস্ত-চকিত হইয়া আছে। পরিধানে বোধ করি বাপের একখানা অর্ধমলিন ধুতি; গায়ে ব্লাউজের অভাব ঢাকা দিবার জন্য আঁচলটা বুকের উপর দুইফের করিয়া জড়ানো।

আমার কণ্ঠ যেন কে চাপিয়া ধরিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিলাম, 'এটা কি গোপীদুলালবাবুর বাড়ি ?'

'হাঁ।'

'তিনি বাড়ি নেই ? কখন ফিরবেন ?'

'হাসপাতালে গেছেন। ফিরতে বোধ হয় দেরি হবে।'

'ও—' আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম,—'তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার ছিল। আমি ওবেলা আবার আসব। তাঁকে ব'লে দিও।'

মেয়েটি চকিতে চোখ তুলিল।

'আচ্ছা।'

আমার খোলার ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটার পর একটা বিড়ি টানিতে লাগিলাম। মাথা গরম হইয়া উঠিল; দুই বাণ্ডিল বিড়ি নিঃশেষ হইয়া গেল। ভয়-চকিত যৌবন, দুঃসহ অসহায় যৌবন, আপনার মাংস হরিণীর বৈরী—

ভূতের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু ভূত দিনের বেলা আসে না।

অপরাহ্ণে আবার গেলাম। এবার দালালীর মোহর পাঁচটিও লইয়া গেলাম। মেয়েটি দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল,—'বাবার শরীর বড় খারাপ, দেখা করতে পারবেন না। কী দরকার আপনার ?' তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তোমার নাম কি ?'

ত্রাস-বিস্ফারিত চোখ তুলিয়া হ্রস্বকণ্ঠে সে বলিল,—'কমলা।'

আমি বলিলাম,—'কমলা, তোমার বাবাকে বল, আমার কাছে তাঁর কিছু টাকা পাওনা আছে, তাই দিতে এসেছি।'

দ্বারের ছায়ান্ধকার হইতে সে বিহ্বল চক্ষে আমার পানে চাহিল, তারপর ছায়ার মত অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—'আসুন।'

গোপীদুলালবাবু বিছানায় অর্ধোপবিষ্ট হইয়া হাঁপাইতেছিলেন। অকালবৃদ্ধ জীর্ণ মানুষ, চোখে উৎকণ্ঠা-ভরা ক্লান্তি। আমি পাশে বসিলে বলিলেন,—'আপনাকে—? টাকা পাওনা আছে মনে পড়ে না তো।'

আমি বলিলাম,—'টাকার কথা পরে বলব। এখন আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি আপনার স্বজাতি, ভদ্রসন্তান। আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

গোপীদুলাল দিশাহারা হইয়া গেলেন। আমি বিস্তারিতভাবে নিজের পরিচয় দিলাম ; তাঁহার হাঁপানি যেন আরও বাড়িয়া গেল। শেষে বলিলেন,—'কমলার বিয়ে দিতে পারব এ আমার আশার অতীত। আমার তো পয়সা নেই।'

'আছে বৈকি! এই যে—' বলিয়া আমি পুঁটুলি খুলিয়া একশত মোহর তাঁহার সম্মুখে ঢালিয়া দিলাম।

... ...

কমলাকে বিবাহ করিয়াছি। শ্বশুর মহাশয় কিন্তু টিকিলেন না, বিবাহের পরদিনই মারা গেলেন। আকস্মিক ভাগ্যোন্নতি তাঁহার সহ্য হইল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুদের ঋণ শোধ করিয়াছি; পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা ফাঁদিবার আয়োজন করিতেছি। উপন্যাসখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। এবার একখানা রোমান্স-ভরা ভদ্র উপন্যাস ধরিব ; যাহা পড়িয়া কমলা লজ্জা পাইবে না।

নন্দদুলালের সহিত আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম,—'কেমন, খুশি হয়েছেন তো?'

নির্লজ্জ প্রেত চোখ টিপিয়া মুচকি হাসিয়াছিল। 'দালালী একটু বেশি নিয়েছ', বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

ভূতের কৃপায় আমার ভবিষ্যৎ এখন বেশ উজ্জ্বল।

পরীক্ষা

বিনায়ক বসুর ড্রয়িংরুম।

রাত্রিকালে বিদ্যুৎবাতির আলোয় ঘরটি অতি সুন্দর দেখাইতেছে। ফিকা সবুজ রংয়ের দেয়াল ; নূতন আধুনিক গঠনের আসবাব। তিনটি আলোর বাল্ব ঘরে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া ঘরটি প্রায় ছায়াহীন করিয়া তুলিয়াছে।

ঘরের দুইপাশে দুইটি দ্বার, একটি ভিতরে এবং অন্যটি বাহিরে যাইবার পথ। ঘরের তৃতীয় দেয়ালের মাঝখানে ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জের সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একটি প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে।

বিনায়ক বসু ডিনার শেষ করিয়া ড্রয়িংরুমে আসিয়া বসিয়াছে এবং একটি কৌচে প্রায় চিৎ হইয়া শুইয়া একখানি ইংরেজী উপন্যাস পড়িতেছে।

তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবীর উপর একটি সিল্কের ড্রেসিং গাউন।

বিনায়কের বয়স ত্রিশের নিচেই, সে এখনও অবিবাহিত। তাহাকে সুপুরুষ বলা চলে। গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ, মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা কোঁকড়া চুল; মুখের লালিত্যের সঙ্গে এমন একটা পরিমার্জিত হঠকারিতার ভাব মিশ্রিত আছে যে, তাহাকে চালিয়াৎ বলিয়া মনে হয় এবং তাহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধেও খট্‌কা লাগে। উপরন্তু সে তরুণীদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারে; তরুণীরাও কেন জানি না, তাহার প্রতি একটু বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হন। এই সব কারণে শহরে তাহার কিছু বদনাম রটিয়াছে।

বিনায়ক সরকারী ইঞ্জিনীয়ার; মাস দুই পূর্বে সে পশ্চিমবঙ্গের এই সমৃদ্ধ শহরে বদলি হইয়া আসিয়াছে এবং স্থানীয় অভিজাত সমাজের তরুণীমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

নিবিষ্ট মনে বই পড়িতে পড়িতে বিনায়ক অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিতেছিল এবং ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া শূন্যে তাকাইতেছিল, যেন তাহার মনের মধ্যে অন্য কোনও চিন্তা ঘোরাঘুরি করিতেছে। একবার সে বই রাখিয়া উঠিল; ঘরের কোণে একটি ক্ষুদ্র আলমারি ছিল, তাহার ভিতর হইতে বোতল ও পেগ বাহির করিয়া পেগ পূর্ণ করিয়া লইয়া আবার আসিয়া বসিল। বই পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে পেগে চুমুক দিতে লাগিল।

বাহিরের দিকের দরজা দিয়া একটি উর্দিপরা ফিটফাট খানসামা প্রবেশ করিল; তাহার হাতে জার্মান সিল্‌ভারের রেকাবের উপর একখানি চিঠি। খানসামা নিঃশব্দে প্রভুর সম্মুখে রেকাব ধরিল। বিনায়ক চিঠি তুলিয়া লইয়া খাম ছিঁড়িয়া পড়িল। তাহার ভ্রূ একটু উঠিল। সে একবার ঘড়ির দিকে তাকাইল; পাশের টেবিলে বুদ্‌বুদের ন্যায় কাঁচে ঢাকা সুন্দর একটি টাইমপীস্‌, তাহাতে দশটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিট হইয়াছে। বিনায়ক চিঠিখানি ড্রেসিং গাউনের পকেটে রাখিল, পেগ তুলিয়া লইয়া খানসামার দিকে না তাকাইয়াই বলিল,—'তুমি এখন যেতে পার, তোমাকে আর দরকার হবে না।—হ্যাঁ, সদর দরজা বন্ধ করবার দরকার নেই।'

খানসামা 'জী' বলিয়া প্রস্থান করিল।

বিনায়ক পেগে একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া রাখিয়া দিল; একটি জয়পুরী কৌটার মধ্য হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে পড়িল—

"বিনায়কবাবু, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমি আসব—সে সময় যেন কেউ না থাকে—

ইতি—মণিকা নন্দী।"

বিনায়কের মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব কিছুই বোঝা গেল না। সে চিঠি মুড়িয়া পকেটে রাখিল, তারপর সিগারেটে একটা টান দিয়া সেটা অ্যাশ্-ট্রেতে ফেলিয়া পেগ তুলিয়া লইল।

পেগ ঠোঁটের কাছে তুলিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের ওপার হইতে স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল,—'বিনায়কবাবু, আসতে পারি?'

বিনায়ক ক্ষণেক দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর পেগ নামাইয়া রাখিয়া হাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

বিনায়ক: এস মণিকা।

মণিকা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার আবির্ভাবে ঘরটা যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। মণিকা শুধু সুন্দরী নয়, তাহার মুখে চোখে বুদ্ধি ও চিত্তবলের এমন একটি প্রভা আছে যে তাহা তাহার দৈহিক সৌন্দর্যকে আরও ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। মণিকার বয়স কুড়ি বছর, তাহার কবরীতে যূথীফুলের মালা, পরিধানে চাঁপা রঙের একটি সূক্ষ্ম বেনারসী শাড়ি, কর্ণে কণ্ঠে মণিবন্ধে মুক্তার লঘু অলঙ্কার উচ্ছল যৌবনের ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া সে যখন বিনায়কের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন মনে হইল, সেকালে রাজকন্যারা বুঝি এমনি ভাবেই চোখ ধাঁধাইয়া স্বয়ংবর-সভায় আবির্ভূতা হইতেন।

মণিকার অধরে একটু হাসি লাগিয়া আছে; বিরাগ ও অনুরাগ অবিশ্লেষ্য-ভাবে মিশিয়া গেলে বোধ করি মেয়েদের মুখে এইরূপ হাসি দেখা দেয়। মণিকা বলিল, 'আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

বিনায়ক পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া ধরিল, মণিকাকে দেখিয়া তাহার বুক যে গুরুগুরু করিতেছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না।

বিনায়ক: সেকালের পণ্ডিতগুলো ঠিক ধরেছিল। স্ত্রীজাতির চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য—কখন কী ঘটবে বলা যায় না। আমার ভাগ্য যে হঠাৎ এত প্রসন্ন হয়ে উঠেছে তা দশটা বেজে পঁচিশ মিনিটের আগে জানতে পারিনি। তাই সামাজিক ভদ্রবেশ পরবার সময় পেলুম না।

মণিকা এই ত্রুটি-স্বীকারের কোনও উত্তর না দিয়া চিঠিখানি লইয়া নিজের ব্লাউজের মধ্যে রাখিল।

মণিকা: এটার আর বোধ হয় আপনার দরকার নেই?

বিনায়ক মুখ টিপিয়া হাসিল।

বিনায়ক: না। তা ছাড়া তোমার চিঠি আমার কাছে না থাকাই ভাল। সাবধানের মার নেই। কিন্তু যাক্, তোমার সম্বর্ধনা করা হয়নি। এস—বোসো—

মণিকাকে সোফায় বসাইয়া সিগারেটের জয়পুরী বাক্সটা তাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া বিনায়ক বলিল, 'নাও।'

মণিকা একবার বাক্সের দিকে তাকাইল, একবার বিনায়কের মুখের পানে তাকাইল, তারপর শান্তকণ্ঠে বলিল,—'আমি সিগারেট খাই না। আপনার পরিচিতা মহিলারা সকলেই বুঝি সিগারেট খান?'

বিনায়ক: সকলেই নয়। তবে কয়েকজন আছেন যাঁরা এক টানে একটা আস্ত সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন। কিন্তু তুমি যখন ধূমপান কর না তখন অন্য কোনও পানীয়ের ব্যবস্থা করি! চা—? কফি—? সরবৎ—?

মণিকা পেগের দিকে কটাক্ষপাত করিল।

মণিকা: আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, বরং আপনি যা খাচ্ছিলেন সেটা শেষ করে ফেলুন।

বিনায়ক: আমি—? ওঃ!

অর্ধপূর্ণ পেগ হাতে তুলিয়া লইয়া বিনায়ক হাসিল।

বিনায়ক: তুমি যা ভাবছ তা নয়, আমি মাতাল নই। মাঝে মাঝে ডিনারের পর একটু পোর্ট খাই, শরীর ভাল থাকে। তুমিও ইচ্ছে করলে খেতে পার। মেয়েদের পোর্ট খেতে বাধা নেই।

মণিকা: ধন্যবাদ। পোর্ট আর ব্র্যাণ্ডি-হুইস্কির মধ্যে কি তফাৎ তা বোঝবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। সুতরাং ওটা থাক্।

বিনায়ক পেগ নিঃশেষ করিয়া রাখিয়া দিল।

বিনায়ক: বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছে। আমার অতিথি-সৎকারের ত্রুটি হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় কি?

সে কৌচের অন্য প্রান্তে বসিল। মণিকা ঘরের চারিদিকে একবার সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাইল; রাজার ছবির উপর দৃষ্টি পড়ায় তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল।

মণিকা : আপনি খুব সৌখীন লোক দেখছি। কিন্তু রাজার ছবি কেন? ওতে আপনার ড্রয়িংরুমের শোভা আরও বেড়েছে বলে মনে হয়?

বিনায়ক : না। ওটা ভেক।

মণিকা : ভেক?

বিনায়ক : হ্যাঁ। ইংরেজের চাকরি করতে হলে ওটা দরকার হয়।

মণিকা : (ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে) আমার বাবাও ইংরেজের চাকরি করেন, এ জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তিনি। কিন্তু তিনি তো ধরে রাজার ছবি টাঙান্‌নি!

বিনায়ক : তবে কার ছবি টাঙিয়েছেন?

মণিকা : কারুর নয়। বাবার ঘরে কোনও ছবিই নেই।

বিনায়ক : আমার ঘরে কিন্তু অন্য ছবি আছে।

মণিকা : (চারিদিকে চাহিয়া) কৈ—কোথায়? দেখছি না তো!

বিনায়ক : এস আমার সঙ্গে—দেখাচ্ছি।

সে উঠিয়া রাজার ছবির দিকে গেল, মণিকাও তাহার অনুবর্তিনী হইল। বিনায়ক ছবির ফ্রেমের উপর একটা বোতাম টিপিতেই রাজার ছবি উল্টাইয়া গিয়া তাহার স্থানে মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখা দিল। মনিকা কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর একটু অপ্রতিভভাবে হাসিল।

মণিকা : ভুলে গেছলুম আপনি ইঞ্জিনীয়র। বেশ কল বানিয়েছেন—

সে ফিরিয়া গিয়া কৌচে বসিল।

মণিকা : কিন্তু এতে একটা কথা প্রমাণ হল।

বিনায়ক : কী প্রমাণ হল?

মণিকা : প্রমাণ হল যে আপনার ভেতরে এক বাইরে আর। আপনি সাদা লোক নন।

বিনায়ক : (হাসিয়া) এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। পৃথিবীতে সাদা লোক ক'টা পাওয়া যায়? তুমি আজ যে ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ তার মধ্যেও তো লুকোচুরি রয়েছে।

মণিকার মুখ একটু লাল হইল, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনায়কের মুখের পানে চাহিল।

মণিকা : লুকোচুরি কিছু নেই। আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

বিনায়ক : বেশ তো। কিন্তু সেজন্য এই রাত্রে একলা আসার দরকার ছিল কি? অন্তত তোমার ছোট ভাই শম্ভু সঙ্গে এলে কোন দোষ হত না!

মণিকা যেন একটু অস্বস্তি অনুভব করিল, একবার চকিত চক্ষে বাহিরের দ্বারের পানে তাকাইল, তারপর একটু তাড়াতাড়ি বলিল,—'একলা আসার দরকার ছিল। আমার কথা গোপনীয়। এ বাড়িতে আর কেউ নেই তো?'

বিনায়ক : কেউ না। স্রেফ তুমি আর আমি।

বিনায়ক আড়চোখে মণিকার পানে তাকাইল। মণিকার মুখে ক্ষণেকের জন্য শঙ্কার ছায়া পড়িল; তারপরই সে সোজা হইয়া বসিল, তাহার চক্ষু প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায় প্রখর হইয়া উঠিল। বিনায়ক তাহা লক্ষ্য না করিয়া বাক্স হইতে সিগারেট লইতে লইতে প্রশ্ন করিল,—'আপত্তি নেই? খেতে পারি?'

মণিকা : স্বচ্ছন্দে।

সিগারেট ধরাইয়া বিনায়ক কৌচের পাশে বসিল, কয়েকটা ধোঁয়ার আংটি ছাড়িয়া বলিল,—'এবার তোমার গোপনীয় প্রশ্ন আরম্ভ হোক।'

মণিকা বিনায়কের পানে তাকাইল না, দেয়ালে মহাত্মার ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—'আজ সকালে আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

বিনায়ক : হাঁ।

মণিকা : আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন?

বিনায়ক : করেছিলুম।

চকিতে বিনায়কের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি ফিরাইয়া মণিকা বলিল,—'বিয়ের প্রস্তাব করবার কী যোগ্যতা আছে আপনার?'

সিগারেটের ছাই সন্তর্পণে অ্যাশ-ট্রেতে ঝাড়িয়া বিনায়ক নীরসকণ্ঠে বলিল —'যোগ্যতার পরিচয় তো আজ সকালে তোমার বাবার কাছে দিয়েছি। আমি সহকারী ইঞ্জিনীয়র, বর্তমানে চার শ' টাকা মাইনে পাই; ভবিষ্যতে মাইনে আরও বাড়বে। আমার স্বাস্থ্যও বেশ ভাল—'

মণিকা : (অধীরভাবে) আমি ও যোগ্যতার কথা বলছি না। বিয়ে করবার নৈতিক যোগ্যতা আপনার আছে কি?

বিনায়ক : কথাটা একটু পরিষ্কার করে না বললে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

মণিকা : বিনায়কবাবু, যে কুমারী আপনাকে বিয়ে করবে, সে আপনার কাছে নৈতিক পবিত্রতা আশা করতে পারে, একথা আপনি স্বীকার করেন?

বিনায়ক: নিশ্চয় স্বীকার করি। শুধু তাই নয়, আমি বিশ্বাস করি, যে-পুরুষের নৈতিক পবিত্রতা নেই তার বিয়ে করা উচিত নয়।

মণিকা কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে বিনায়কের পানে চাহিয়া রহিল।

মণিকা: তাহলে আপনি বিয়ে করতে চান কোন্ সাহসে?

বিনায়ক: (গম্ভীরস্বরে) আমার সে দাবী আছে।

মণিকা অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিল।

মণিকা: বিনায়কবাবু, আপনি নিজেকে যতটা সাধু বলে প্রমাণ করতে চান, সত্যি আপনি ততটা সাধু নন। আজ আমি নিজের চোখে আপনাকে মদ খেতে দেখেছি। তা ছাড়া শহরে আপনার অন্য বদনামও আছে—

বিনায়ক: অসম্ভব নয়, বদনাম কার না হয়? কিন্তু মদের কথা যে বললে, আগেই বলেছি আমি মাতাল নই, নিয়মিত মদ খাই না—

মণিকা: প্রমাণ করতে পারেন?

বিনায়ক: (হাসিয়া) একথা প্রমাণ করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীও প্রমাণ করতে পারেন না যে তিনি লুকিয়ে মদ খান না; ওটা তাঁর চরিত্র থেকে অনুমান করে নিতে হয়। তোমার কথাই ধরো। আজ তুমি একলা লুকিয়ে আমার বাড়িতে এসেছ। লোকে যদি মনে করে তুমি রোজ রাত্রে আমার বাড়িতে আসো, সেকথা কি সত্য হবে?

মণিকা: আচ্ছা ও কথা ছেড়ে দিলুম। কিন্তু আপনি যে স্ত্রীজাতির সঙ্গ খুবই ভালবাসেন একথা অস্বীকার করতে পারেন?

বিনায়ক হাসিয়া উঠিল, দগ্ধাবশেষ সিগারেট অ্যাশ-ট্রের উপর ঘষিয়া নিভাইয়া বলিল—'কি মুস্কিল, অস্বীকার করতে যাব কোন্ দুঃখে? স্ত্রীজাতির সঙ্গ যদি ভালই না বাসব, তাহলে তোমাকে বিয়ে করতে চাই কেন?'

মণিকার দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

মণিকা: হেসে ওড়াবার চেষ্টা করবেন না। দু' মাস হল আপনি এ শহরে এসেছেন, এরি মধ্যে আপনার সব কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।—অমিতা সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক তা সবাই জানে।

বিনায়কের মুখ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল।

বিনায়ক: না, কেউ জানে না। অমিতার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক—তা শুধু আমি জানি আর অমিতা জানে!

মণিকা: সত্যি? খুব গোপনীয় সম্পর্ক বুঝি? আমরা জানতে পারি না?

বিনায়ক : অমিতা আমার ভাবী ভাদ্রবধূ। তোমরা জান না, আমার ছোট ভাই বিলেত গেছে। অমিতা তাকে ভালবাসে।

মণিকা থতমত খাইয়া গেল।

মণিকা : ও, তা তাই যদি হয়, তাহলে এত লুকোচুরির কি দরকার?

বিনায়ক : লুকোচুরির কারণ অমিতার বাবা এ বিয়ের বিরুদ্ধে, তিনি জাতের বাইরে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না।

মণিকার দৃষ্টি নত হইল, কিন্তু তখনি আবার সে চোখ তুলিল।

মণিকা : আচ্ছা, সে যেন হল। মেয়ে-স্কুলের টিচার মিসেস রমা গাঙ্গুলীর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধটা কি রকম?

বিনায়ক : তিনি আমার বান্ধবী।

মণিকা : (মুখ টিপিয়া) বান্ধবী। ও কথাটার অনেক রকম মানে হয়।

বিনায়ক ক্ষণেক গম্ভীর হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল— 'মণিকা, আমার সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পার, কিন্তু একটি শুদ্ধচরিত্রা নিষ্ঠাবতী বিধবা মহিলা সম্বন্ধে ও রকম ইঙ্গিত করলে অপরাধ হয়।'

মণিকার মুখে লজ্জার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেরুদণ্ডও শক্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া সে ঈষৎ তিক্তস্বরে বলিল, 'আর হাসপাতালের লেডি ডাক্তার মিস্ মল্লিকা? তিনিও কি শুদ্ধচরিত্রা নিষ্ঠাবতী মহিলা? তাঁর সঙ্গেও তো আপনার খুব ঘনিষ্ঠতা।'

বিনায়কের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

বিনায়ক : শ্রীমতী মল্লিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু অন্য ধরনের। শিকারের সঙ্গে শিকারীর যে ঘনিষ্ঠতা, তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও সেই রকম। ভুল বুঝো না; তিনি শিকারী—আর আমি শিকার। ভাগ্যক্রমে এখনও অক্ষত শরীরে আছি।

মণিকা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; বিনায়কও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। মণিকা অস্থিরভাবে ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন কিছুতেই তাহার মনের অসন্তোষ দূর হইতেছে না।

বিনায়ক : কি হল! আর কোনও প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছ না?

মণিকা : ক'টা বেজেছে? আমি এবার বাড়ি যাব।

ঘড়ি দেখিবার জন্য বিনায়ক পিছন ফিরিতেই মণিকা এক অদ্ভুত কাজ করিল, মদের শূন্য পেগটা তাহার হাতের কাছেই ছিল, ক্ষিপ্র হস্ত-

সঞ্চালনে তাহা মেঝেয় ফেলিয়া দিল। ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া কাঁচ ভাঙার শব্দ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবাতি নিভিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের ভিতর হইতে মণিকার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর আসিল,—'ঐ যাঃ! এ কী হল! আলো নিভে গেল! বিনায়কবাবু?'

বিনায়কঃ কোনও ভয় নেই। মাঝে মাঝে এমন হয়—পাওয়ার হাউসে কোন গোলমাল হয়ে থাকবে। তুমি যেমন আছ তেমনি দাঁড়িয়ে থাকো, নইলে পায়ে কাঁচ ফুটে যেতে পারে। আমি পাশের ঘর থেকে মোমবাতি নিয়ে আসছি।

মণিকাঃ না না, আপনি কোথাও যাবেন না, আমার ভয় করবে।

বিনায়কের হাসির শব্দ শোনা গেল।

বিনায়কঃ আচ্ছা আমি দেশলাই জ্বালছি।

সে ফস করিয়া দেশলাই জ্বালিল। অন্ধকার কিন্তু সম্পূর্ণ দূর হইল না, দু'জনকে আবছায়াভাবে দেখা গেল। মণিকা সেই অস্পষ্ট আলোকে সাবধানে পা ফেলিয়া আবার কৌচে আসিয়া বসিল। দেশলাই-কাঠি নিভিয়া গেল।

মণিকাঃ আপনার কাঁচের গ্লাসটা ভেঙে ফেললুম—

বিনায়কঃ কি করে ভাঙল?

মণিকাঃ কি জানি অসাবধানে হাত লেগে গিছল।

বিনায়ক আবার দেশলাই জ্বালিল। দেখা গেল, তাহার মুখে একটু বাঁকা হাসি লাগিয়া আছে।

বিনায়কঃ মদের গ্লাস ভাঙার মধ্যে হয়তো নিয়তির কোনও ইঙ্গিত আছে।

মণিকাঃ তা জানি না। আপনি অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কাছে আসুন, আমার যে ভয় করছে।

বিনায়ক মণিকার কাছে গিয়া বসিল। দেশলাই নিঃশেষ হইয়া নিভিয়া গেল।

মণিকাঃ আমার হাত ধরুন।

বিনায়কঃ হাত ধরলে দেশলাই জ্বালব কি করে?

মণিকাঃ দেশলাই জ্বালতে হবে না।

কিছুক্ষণ নীরব। বিনায়ক মণিকার হাত ধরিয়া আছে কিনা অন্ধকারে তাহা দেখা গেল না।

বিনায়কঃ মণিকা!

মণিকা : কী ?

বিনায়ক : ঘর অন্ধকার—

মণিকা : জানি।

বিনায়ক : তুমি আর আমি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই।

মণিকা : হুঁ।

বিনায়ক : আমার মত অসাধু লোকের সঙ্গে থাকতে তোমার ভয় করছে না ?

মণিকা : না।

বিনায়ক : তোমরা অদ্ভুত জাত। সাধে পণ্ডিতেরা বলেছেন—

মণিকা : পণ্ডিতদের কথা শুনতে চাই না।

বিনায়ক : বেশ, চল তাহলে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

মণিকা : না। আলো জ্বললে বাড়ি যাব।

বিনায়ক : আলো কখন জ্বলবে ঠিক নেই। আজ রাত্রে না জ্বলতেও পারে।

মণিকা কথা বলিল না। ক্ষণেক পরে বিদ্যুৎবাতি যেমন হঠাৎ নিভিয়া গিয়াছিল তেমনি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল, দুইজনে পাশাপাশি কৌচের উপর বসিয়া আছে, মণিকার ডান হাত বিনায়কের বাম মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ।

মণিকা বিনায়কের মুখের পানে চাহিয়া মধুর আনন্দোচ্ছল হাসিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নম্র কুহক-কোমল স্বরে বলিল,—'এবার আমি বাড়ি যাই ?'

বিনায়কও উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিনায়ক : তুমি আজ আমাকে অনেক জেরা করেছ। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে ?

মণিকা : কি প্রশ্ন ?

বিনায়ক : আমি ভাগ্যবান কিম্বা হতভাগ্য সেটা জানাবে কি ?

মণিকা বিনায়কের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

মণিকা : তুমি ভাগ্যবান কিনা জানি না, কিন্তু আমার ভাগ্য মন্দ নয়।

বিনায়কের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে মণিকার সম্মুখে গিয়া তাহার একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

বিনায়ক : আর তোমার মনে সন্দেহ নেই ?

মণিকা : না।

বিনায়ক : (হাসিয়া) অন্ধকারের পরীক্ষায় পাশ করেছি তাহলে ?

মণিকা : হাঁ। (চমকিয়া) অ্যাঁ, কি বললে ? অন্ধকারের পরীক্ষা ! তুমি—তুমি বুঝতে পেরেছ ?

বিনায়ক : তা পেরেছি—

মণিকা : কী করে বুঝলে ?

বিনায়ক : খুব সহজে। তুমি যখন হাত দিয়ে গ্লাসটা ফেলে দিলে তখন আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলুম, ঘড়ির কাঁচে সবই দেখতে পেলুম। তারপরই আলো নিভে গেল। বুঝতে দেরি হল না যে, গেলাস ভাঙার শব্দটা সঙ্কেত, তোমার যে সহচরটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি বারান্দায় মেন্ সুইচ বন্ধ করে দিলেন। সহচরটি বোধ হয় শম্ভু—না ?

মণিকা নীরব বিস্ময়ে ঘাড় নাড়িল।

বিনায়ক : এর পরে তোমার এই রাত্তিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার প্ল্যানটা পরিষ্কার হয়ে গেল : অন্ধকারে আমি কোনও অসভ্যতা করি কিনা তাই পরীক্ষা করতে চাও। যখন বুঝতে পারলুম তখন পরীক্ষায় পাশ করা আর শক্ত হল না।

মণিকার মুখ আবার সংশয়াকুল হইয়া উঠিল।

মণিকা : কিন্তু—কিন্তু—আমার সন্দেহ তো তাহলে গেল না ! তুমি যদি জেনে-শুনে—

বিনায়ক হাসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল।

বিনায়ক : একটু সন্দেহ থাকা ভাল। কবি বলেছেন—'ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম একান্ত বিশ্বাসে হয়ে আসে জড় মৃতবৎ, তাই তারে মাঝে মাঝে জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।'* কিন্তু মণিকা, আমি যদি সত্যিই অসভ্যতা করতুম ? শম্ভু এসে অবশ্য আমাকে উত্তম-মধ্যম দিত। কিন্তু তুমি কী করতে ?

মণিকার মুখ কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল।

মণিকা : কী আর করতুম, তোমাকেই বিয়ে করতুম। তুমি কি আমার কিছু রেখেছ ? আমার নিজের ইচ্ছে বলে কি কিছু আছে ?

* রাজা ও রাণী

দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া মণিকা কাঁদিবার উপক্রম করিল। স্নেহে আমন্দে বিনায়কের মুখ কোমল হইয়া উঠিল। সে মণিকার চুলের উপর একবার লঘুস্পর্শে হাত বুলাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—'ওহে শম্ভু, ভেতরে এস।'

আঠারো বছরের হৃষ্টপুষ্ট বলবান যুবক শম্ভু একটি হকি-ষ্টিক্ হাতে লইয়া প্রবেশ করিল এবং প্রসন্নমুখে দন্ত বিকশিত করিল।

বিনায়ক: শম্ভু, তোমার বোনকে শীগ্‌গির বাড়ি নিয়ে যাও। আর বেশি দেরি করলে আমার বদ্‌নাম রটে যাবে।

ভক্তিভাজন

মাতালকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবার প্রথা আমাদের দেশে নাই। বরঞ্চ মাতালের প্রতি কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখাইলে বন্ধু-বান্ধব সন্দিগ্ধ হইয়া ওঠেন, গৃহিণীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। বস্তুত মদ্য পান করা যে অতিশয় গর্হিত কার্য, বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু তবু আমার প্রতিবেশী ব্রাগাঞ্জা সাহেবকে যে আমি সম্প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সত্যের অনুরোধে তাহাও মানিয়া লইতে আমি বাধ্য।

ব্রাগাঞ্জা একজন গোয়াঞ্চি পিদ্রু। এদেশে গোয়ানী খৃষ্টানরা সাধারণত ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাগাঞ্জার চেহারাটি যেমন প্যাণ্টলুনপরা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মতন, মানুষটিও অতিশয় শান্তশিষ্ট ও নির্বিরোধ। আমার বাড়ির পাশে একটা খোলার ঘরে বাস করিত এবং মোটরমিস্ত্রীর কাজ করিত। আমি কখনও তাহাকে শাদা-চক্ষু অবস্থায় দেখি নাই; সর্বদাই তাহার গোলাপী চক্ষু দুটি ঢুলুঢুলু। আমার সঙ্গে দেখা হইলে কোমল হাস্য করিয়া কপালে হাত ঠেকাইত। দুনিয়ার কাহারও সহিত তাহার অসদ্ভাব আছে এমন কথা শুনি নাই; মাতাল অবস্থাতেও সে কাহারও সহিত ঝগড়া করিত না। আবার কাহারও সহিত অতিরিক্ত মাখামাখিও ছিল না। সে আপন মনে মদ খাইত এবং বানচাল মোটরের তলায় প্রবেশ করিয়া ঠুক্‌ঠাক্ করিত।

গত মহাযুদ্ধের সময় বোম্বাই শহরে মানুষের যে জোয়ার আসিয়াছিল

তাহা বোম্বাই শহরকে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া উপকণ্ঠেও প্রবাহিত হইয়াছিল। আমি থাকি উপকণ্ঠে। এতদিন বেশ নিরিবিলি ছিলাম, আমার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে খোলা মাঠ পড়িয়া ছিল। ক্রমে সেখানে দুটি-একটি টিনের চালা বা ঘর দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

একদিন দেখিলাম আমার বাড়ির ঠিক সম্মুখে কোনও এক ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি এক চায়ের দোকান খুলিয়া সাইনবোর্ড লট্‌কাইয়া দিয়াছে— শ্রীবিলাস হিন্দু হোটেল। নিতান্তই দীনহীন ব্যাপার; টিনের চালার নীচে কয়েকটি বার্নিশহীন কাঠের টেবিল ও লোহার চেয়ার। কিন্তু খদ্দের জুটিতে বিলম্ব হইল না। এদিকে তখন মার্কিন গোরার ভিড়। দেখিলাম, শাদা সিপাহীরা লোহার চেয়ারে বসিয়া অম্লানবদনে চা ও চিঁড়েভাজা খাইতেছে। দোকানদার লোকটা রোগাপটকা ছিল, দেখিতে দেখিতে খোদার খাসী হইয়া উঠিল।

সাহেবদের দেখাদেখি দেশী-খদ্দেরও অনেক জুটিয়াছিল। কিন্তু ব্রাগাঞ্জাকে কোনও দিন দোকানে ঢুকিতে দেখি নাই। চায়ের মতন নিরামিষ নেশায় তাহার রুচি ছিল না।

তারপর একদিন মহাযুদ্ধ শেষ হইল। সাহেব সিপাহীরা ক্রমে ভারতরক্ষা-রূপ নিঃস্বার্থ কর্তব্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেল। শ্রীবিলাস হোটেলের চায়ের ব্যবসাতেও ভাটা পড়িল।

কিন্তু ব্যবসায়ে ভাটা পড়িলে ব্যবসায়ীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে; তখন সে মরীয়া হইয়া আবার ব্যবসা জাঁকাইবার নানা ফন্দি-ফিকির বাহির করিতে থাকে। একদিন লক্ষ্য করিলাম, শ্রীবিলাস হোটেলের স্বত্বাধিকারী গ্রামোফোন কিনিয়াছে এবং তাহাতে লাউড্-স্পীকার লাগাইয়া তারস্বরে তাহাই বাজাইতেছে।

প্রথমটা বিশেষ বিচলিত হই নাই। সিনেমার বর্ণসঙ্কর গান আমার ভালই লাগে; তাহাতে 'বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর উচ্চ গাম্ভীর্য না থাক, প্রাণ আছে, চঞ্চলতা আছে। তাহাই বা আজকাল কোথায় পাওয়া যায়? কিন্তু যখন দেখিলাম, দোকানদার মাত্র দুই-তিনটি রেকর্ড কিনিয়াছে এবং সেগুলি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে বাজাইয়া চলিয়াছে, তখন মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গীত ভাল জিনিস; কিন্তু সকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত যদি একই সঙ্গীত বারম্বার শুনিতে হয়, তাহা হইলে স্নায়ুমণ্ডলের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মনুষ্যজাতিকে অনেক নব নব আবিষ্কার দান করিয়াছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর দান বোধ হয়—যান্ত্রিক শব্দ। শতবর্ষ পূর্বেও পৃথিবীতে এত শব্দ ছিল না। মেঘগর্জনই তখন শব্দের চূড়ান্ত বলিয়া মনে হইত। এখন মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে এমন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে যাহার কাছে বজ্রপাতও কপোত-কূজন বলিয়া মনে হয়। লাউড্-স্পীকার যুক্ত গ্রামোফোনও এইরূপ একটি শব্দ-যন্ত্র। 'এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়, দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।' শুধু বিস্ময় নয়, মানুষ এই শব্দের আক্রমণে কেমন যেন জবুথবু হইয়া গিয়াছে!

শরীরের একই স্থানে যদি ক্রমাগত হাত বুলানো হয় তাহা হইলে প্রথমটা বেশ আরাম লাগে কিন্তু ক্রমে অসহ্য হইয়া ওঠে। গান শোনাও তেমনি। প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন একই গান শুনিতে শুনিতে স্নায়ুমণ্ডলী বিদ্রোহ করে। প্রাণ ছট্‌ফট্ করে; ইচ্ছা করে কোথাও ছুটিয়া পলাইয়া যাই।—কিন্তু যাঁহারা শহরের বাসিন্দা তাঁহাদের পক্ষে এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা নূতন নয়; সুতরাং বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

মরীয়া হইয়া একদিন দোকানদারকে গিয়া বলিলাম, 'বাপু, চায়ের দোকান করেছ তা এত গান বাজনার কী দরকার?'

দোকানদার এক গাল হাসিয়া বলিল, 'শেঠ্, গ্রামোফোন কেনার পর আমার খদ্দের বেড়েছে।'

দেখিলাম কথাটা মিথ্যা নয়; অনেকগুলি গলায়-রুমাল-বাঁধা হাফ্-শার্ট-পরা ছোক্‌রা বসিয়া চা খাইতেছে ও টেবিল বাজাইতেছে। বলিলাম, 'তা খদ্দেরকে গান শোনানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে আস্তে বাজাও না কেন? পাড়ার লোকের কান ঝালাপালা ক'রে কি লাভ?'

সে বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কেন, আপনি কি গান ভালবাসেন না? এ দেশের লোক কিন্তু খুব গান ভালবাসে।'

চলিয়া আসিলাম। লোকটা আমাকে সঙ্গীত-রস-বঞ্চিত পাষণ্ড মনে করিল তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সে যে আমার অনুরোধে গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া ব্যবসার ক্ষতি করিবে এমন সম্ভাবনা দেখিলাম না।

পুলিশে খবর দিব কিনা ভাবিতে লাগিলাম। এদেশে আইনকানুন নিশ্চয় একটা কিছু আছে; যন্ত্র-সঙ্গীতের উৎপীড়ন হইতে নিরীহ মানুষকে রক্ষা করিতে পারে এমন আইন কি নাই? হয়তো আছে; কিন্তু পুলিশ কিছু

করিবে কি? এদেশের পুলিশের সে রোয়াব নাই, গাম্ভীর্য নাই, দাপট নাই। রাস্তার ধারে যে-সব হলদে শামলাপরা কনস্টেবল দেখিয়াছি তাহারা মনে সম্ভ্রম উৎপাদন করে না; তাহাদের দেখিলে ইয়ার্কি দিবার ইচ্ছা হয়, নালিশ জানাইবার ইচ্ছা হয় না। আমি যদি নালিশ করি, পুলিশ হয়তো মিঠেভাবে একটু মুচকি হাসিবে। তাহাতে আমার কী লাভ?

এইভাবে মাসখানেক চলিল। স্নায়ু বলিয়া শরীরে যাহা ছিল ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে; মস্তিষ্কের মধ্যে চাতক পাখীর কাতরানির মতো একটা ব্যাকুলতা পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। ডাক্তারেরা যাহাকে নার্ভাস ব্রেক্-ডাউন বলেন সেই অবস্থায় পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময়—

পরিত্রাণায় সাধূনাং—ইত্যাদি।

ত্রাণকর্তা যে কত বিচিত্ররূপে সম্ভবামি হন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অপার তাঁহার মহিমা।

রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় একদিন বাড়ির সমস্ত বিদ্যুৎবাতি নিভিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে কোথায় মিস্ত্রী পাইব; ব্রাগাঞ্জার কথা মনে পড়িল। সে মোটর-মিস্ত্রী, নিশ্চয় বিদ্যুৎ সম্বন্ধে জানে শোনে। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

সম্মুখের হোটেলে তখন উদ্দাম সঙ্গীত চলিয়াছে—'পহেলি মোহব্বত কি রাত!' অন্ধকারে প্রথম প্রণয়-রজনীর উল্লাস যেন আরও গগনভেদী মনে হইতেছে।

ব্রাগাঞ্জা আসিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলো জ্বালিয়া দিল। বিশেষ কিছু নয়, একটা ফিউজ পুড়িয়া গিয়াছিল। আমি ব্রাগাঞ্জাকে একটি টাকা দিলাম। তৈলাক্ত হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল; কপালে হাত ঠেকাইয়া সে বলিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে একবার থামিল; একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'স্যর, এই গান শুনতে আপনার ভাল লাগে?'

লক্ষ্য করিলাম, তাহার ঢুলুঢুলু চক্ষের মধ্যে ফুলঝুরির ফুলকির মতন একটা আলো ঝিকমিক করিতেছে। বলিলাম, 'ভাল লাগে! অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তুমিও তো দিনরাত শুনছ, তোমার ভাল লাগে?'

ব্রাগাঞ্জা মাথাটি দক্ষিণ হইতে বামে আন্দোলিত করিতে করিতে বলিল, 'না, ভাল লাগে না।'

ব্রাগাঙ্গা চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গেল না; এত রাত্রে অপ্রত্যাশিত একটি টাকা পাইয়াছে, বোধ হয় মদের সন্ধানে গেল। ওদিকে গান চলিয়াছে—'লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা—'

রাত্রি সাড়ে দশটা। শুইতে গিয়া কোনও লাভ আছে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় শ্রীবিলাস হোটেলে রৈ রৈ মার্ মার্ শব্দ হইয়া গ্রামোফোনটা মধ্যপথে থামিয়া গেল; তৎপরিবর্তে চীৎকার চেঁচামেচি দুম্‌দাম্ শব্দ আসিতে লাগিল।

ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। দেখি, হোটেলে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গিয়াছে। তফাৎ এই যে দক্ষযজ্ঞে অনেকগুলা ভূত যজ্ঞ পণ্ড করিয়াছিল, এখানে একা ব্রাগাঙ্গা। সে একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে; তাহাকে দেখিয়া সেই নিরীহ নির্বিরোধ ব্রাগাঙ্গা বলিয়া চেনা শক্ত। গ্রামোফোনটাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া সে তাহার উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, টেবিল চেয়ার পেয়ালা গেলাস যাহা সম্মুখে পাইতেছে তাহাই ধরিয়া আছাড় মারিতেছে। আর গভীর গর্জনে বলিতেছে—'ড্যাম্ লারে লাপ্পা—টু হেল্ উইথ গিলি গিলি গিলি—ডেভিল্ টেক্ পহেলি মোহব্বৎ কি রাত.........'

রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। হোটেলের মালিক ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ঐকতানে চেঁচাইতেছে; কিন্তু এই দুর্দান্ত মাতালকে বাধা দিবার সাহস তাহাদের নাই।

মদমত্ত অবস্থায় পরের সম্পত্তি নাশ করার অপরাধে ব্রাগাঙ্গার জেল ও জরিমানা হইল। জেল খাটিয়া আসিয়া ব্রাগাঙ্গা পূর্ববৎ মোটর মেরামত করিতেছে; যেন কিছুই হয় নাই। কিন্তু শ্রীবিলাস হোটেলের গ্রামোফোন বাজনা বন্ধ হইয়াছে। ব্রাগাঙ্গা নাকি দোকানের মালিককে ইসারায় জানাইয়াছে যে, আবার গ্রামোফোন বাজিলে আবার সে দক্ষযজ্ঞ বাধাইবে।

ব্রাগাঙ্গাকে আমি ভক্তি করি, তা যে যাই বলুন। মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যাইবার সাহস যাহার আছে সে আমাদের সকলেরই নমস্য।

একদিন তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলাম—'সেদিন তুমি আমার বিদ্যুৎবাতি মেরামত করে দিয়েছিলে তার জন্যে তোমাকে উচিত পুরস্কার দিই নি। এই নাও।'

ব্রাগাঞ্জা কপালে হাত ঠেকাইয়া সলজ্জ মিটিমিটি হাসিল। সে মাতাল হইলেও নির্বোধ নয়।

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

সম্প্রতি মদ্য-নিবারণী আইন জারি হইয়াছে; কিন্তু সেজন্য ব্রাগাঞ্জার আটকায় না।

যস্মিন্ দেশে

বোম্বাই শহরটি যে প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বীপ, একথা অবশ্য সকলেই জানেন। কিন্তু এই দ্বীপকে অতিক্রম করিয়া একটি বৃহত্তর বোম্বাই আছে, পীনাঙ্গী রমণীর আঁটসাঁট পোশাক ছাপাইয়া উদ্বৃত্ত দেহভাগের মত যাহা বাহিরে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

বৈদ্যুতিক রেলের লাইন ও মোটর রাস্তা দুইই পাশাপাশি বোম্বাই হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের খাঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর দিকে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথের ধারে ধারে এক মাইল আধ-মাইল অন্তর ছোট ছোট জনপদ—বোম্বাইয়ের তুলনায় তাহাদের আয়তন সিকি-দুয়ানির মত। এখানে যাঁহারা বাস করেন, প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহারা খাদ্যান্বেষী পাখীর মত ঝাঁক বাঁধিয়া বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেন, আবার সন্ধ্যাবেলা কলরব করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসেন। মেয়েরা বৈকাল-বেলা বাহারে থলি হাতে করিয়া বাজার করিতে বাহির হন; উচ্চ-নীচ ধনী-নির্ধন নাই, সব মেয়েরাই সব্জী-বাজারে গিয়া আলু শাক কাঁকুড় ভাজি ক্রয় করেন; তারপর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তরুণী, তাঁহারা ক্ষুদ্র রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া নিজ নিজ 'শেঠ'এর প্রতীক্ষা করেন। শেঠ আসিলে দু'জনে গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যান।

তারপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে দেখা যায়, পথের দুই ধারে বাড়ির সম্মুখস্থ অন্ধকার বারান্দায় কাঠের পিঁড়িযুক্ত দোলা দুলিতেছে; অদৃশ্য মিথুনের হাসি-গল্পের মৃদু আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, ক্বচিৎ কোমল কণ্ঠের গান অন্ধকারকে মধুর করিয়া তুলিতেছে। নিবিড় ঘনীভূত জীবনের স্পন্দন—আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন ঝুলাবে।

কিন্তু বৃহত্তর বোম্বাইয়ের এই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সহিত আমার গল্পের কোনও সম্বন্ধ নাই।

বোম্বাইয়ের সমুদ্রকূল বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য ভাঙা পোর্তুগীজ ঘাঁটি দ্বারা কীর্ণ; এককালে তাহারা যে এই উপকূল বাহুবলে দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহার প্রচুর চিহ্ন এখনও সমুদ্রের ধারে ধারে ছড়ানো রহিয়াছে। প্রত্ন-জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই ভগ্ন ইট-পাথরের স্তূপগুলি বিশেষ কৌতূহলের বস্তু।

বৈদ্যুতিক রেল-লাইনের প্রায় শেষ প্রান্তে ঐরূপ একটা বড় পোর্তুগীজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। অতি ক্ষুদ্র স্থান, দিনের বেলা একান্ত জনবিরল। দুই চারিটি দোকান, এক-আধটি ইরাণী হোটেল, পোস্ট অফিস—এই লইয়া একটি লোকালয়; পোর্তুগীজ শক্তির গলিত শবদেহ জীবন্ত লোকালয়ের পাশে পড়িয়া যেন তাহার উপরেও মুমূর্ষার ছায়া ফেলিয়াছে।

শুনা যায় রাত্রি গভীর হইলে এই ভাঙা দুর্গের চারিপাশে নানা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করে। জীবন্ত মানুষ সে-সময় কেহ ঘরের বাহির হয় না; যদি কেহ একান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় ঐ দিকে যায়, অকস্মাৎ বহু ঘোড়ার সমবেত খুরধ্বনি তাহাকে উচ্চকিত করিয়া তোলে, যেন একদল ঘোড়সওয়ার ফৌজ পাশ দিয়া চলিয়া গেল। দৈবক্রমে দুর্গের আরও নিকটে গিয়া পড়িলে সহসা অন্ধকার স্তম্ভশীর্ষ হইতে পোর্তুগীজ সান্ত্রীর কড়া হুকুম আসে—'Halt! Quem vai la!'

কিন্তু ভাঙা পোর্তুগীজ দুর্গের ভৌতিক ভয়াবহতার সহিত আমার কাহিনীর কোনও সম্বন্ধ নাই।

দুপুর বেলা বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। সঙ্গী বা দিগদর্শক লইবার প্রয়োজন হয় নাই; যে মারাঠী বন্ধুর গৃহে কয়েকদিনের অতিথিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম তিনি ট্রেনে তুলিয়া দিয়া রাস্তা-ঘাটের বিবরণ বলিয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছিলাম কিন্তু দুর্গ পরিক্রমণ শেষ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। চায়ের তৃষ্ণা যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল; একটু ক্ষুধাও যে পায় নাই এমন নয়।

তাড়াতাড়ি স্টেশনের দিকে ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতেছিলাম, মনের মত খাদ্য পানীয় এই নগণ্য স্থানে পাওয়া যাইবে কি না; হয় তো বোম্বাই না পৌঁছানো পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে। এমন সময় চোখে পড়িল রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র একটি ঘরের মাথায় প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড টাঙানো রহিয়াছে—ঈস্ট ইণ্ডিয়া হোটেল।

আমিও ঈস্ট ইণ্ডিয়ার লোক, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব কোণে থাকি; তাই বোধ হয় নামটা ভিতরে ভিতরে আমাকে আকর্ষণ করিল। অজ্ঞাত স্থানে নিম্নশ্রেণীর হোটেলের খাদ্য পানীয় উদরস্থ করা হয় তো সমীচীন হইবে না; তবু মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করিয়া ভাবিলাম,—দেখাই যাক না; চা যদি উপাদেয় নাও হয় গরম জলে নেশার পিত্তরক্ষা হইবে!

ছোট্ট ঘরে কয়েকটি টিনের টেবিল চেয়ার সাজানো; লোকজন কেহ নাই। পিছনের ঘর হইতে দুইটি স্ত্রী পুরুষের কণ্ঠস্বর আসিতেছিল; আমার সাড়া পাইয়া পুরুষটি বাহির হইয়া আসিল।

বেঁটে দোহারা মজবুত গোছের লোকটি, রঙ ময়লা তামাটে ধরনের; পার্শী ও ইরাণী ছাড়া ভারতবর্ষের যে কোনও জাতি হইতে পারে। বয়স আন্দাজ বত্রিশ-তেত্রিশ। আমার সম্মুখে আসিয়া দুর্বোধ্য অথচ বিনীত ভাষায় কি একটা প্রশ্ন করিল।

ইংরেজীর আশ্রয় লইতে হইল। এ দেশের পনেরো আনা লোক ইংরেজী বুঝিতে পারে এবং দায়ে ঠেকিলে কষ্টেসৃষ্টে ইংরেজী বলিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিতেও পারে।

বলিলাম—'চা চাই।'

লোকটি ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ ভাল কথা; তারপর মোটের উপর শুদ্ধ ইংরেজীতে বলিল,—'কত চা চাই?'

বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। সেও বোধ হয় বুঝিল আমি এ-অঞ্চলে নূতন লোক, তাই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল—এখানে এক পয়সায় সিকি পেয়ালা, দুই পয়সায় আধ পেয়ালা, তিন পয়সায় তিন পোয়া এবং চার পয়সায় পরিপূর্ণ এক পেয়ালা চা পাওয়া যায়; আমি যেটা ইচ্ছা ফরমাস করিতে পারি। তারপর আমার বিলাতী বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'যদি কফি চান ভাল কফি দিতে পারি।'

এ দেশের লোক চায়ের চেয়ে কফি বেশি পছন্দ করে তাহা জানিলাম;

কিন্তু চায়ের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ, কফি কদাচিৎ এক-আধ পেয়ালা খাইয়াছি। বলিলাম,—'না, চা আনো।'

লোকটি পূর্ববৎ ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়া পিছনের ঘরে প্রবেশ করিল। আমি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। নেপথ্যস্থিত ঘরটা বোধহয় হোটেলের রান্নাঘর; সেখান হইতে অবোধ্য ভাষায় স্ত্রীপুরুষের কথাবার্তা ও হাসির আওয়াজ আসিতে লাগিল।

অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। ধূমায়িত পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিলাম —'আঃ!' চায়ে দুধের অংশ বেশি এবং চায়ের পাতার সঙ্গে অন্যান্য সুগন্ধি মশলাও আছে। তবু স্বাদ ভালই লাগিল।

এই সময়, কেমন করিয়া জানি না, লোকটি আমাকে চিনিয়া ফেলিল। গরম চা পেটে পড়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বোধ হয় গুন্ গুন্ করিয়া একটি খাঁটি বাংলা সুর ভাঁজিয়া ফেলিয়াছিলাম; লোকটি উত্তেজনা-প্রখর চক্ষে আমার পানে চাহিল। তারপর টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলিল,—'আপনি বাঙালী?'

উভয়ে পরস্পর মুখের পানে পরম উদ্বেগভরে তাকাইয়া রহিলাম। বিস্ময়কর ব্যাপার! বাঙালীর ছেলে এতদূরে আসিয়া হোটেল খুলিয়া বসিয়াছে! দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল কথা বলিতেছে! 'হাঁ' বলিতে ডাহিনে-বাঁয়ে শিরঃসঞ্চালন করিতেছে!

কিম্বা—বাঙালী বটে তো?

বলিলাম,—'হ্যাঁ।—আপনি?'

লোকটি একগাল হাসিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল; তাহার আহ্লাদ ও বিস্ময়ের অবধি নাই। আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে এক গঙ্গা কথা বলিয়া গেল—'হাঁ, আমিও বাঙালী মশায়। কিন্তু কি রকম চিনেছি তা বলুন!—আচ্ছা, এদিকে নতুন এসেছেন—না? বুঝেছি রুইন্স্ দেখতে এসেছিলেন! উঃ—কদ্দিন যে বাঙালীর মুখ দেখিনি!—বম্বেতে বাঙালী আছে বটে—কিন্তু—! আপনার নিবাস কলকাতাতেই তো? আমিও কলকাতার লোক মশায়—আদ বাসিন্দা—'

সে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল।

দাঁড়ান—শুধু চা খাবেন না। খাবার আছে—বাংলা খাবার। (একটু লজ্জিত ভাবে) বড় খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, সিঙাড়া আর চমচম্ নিজেই তৈরি করেছিলুম। এদিকে তো আর ওসব—'

বলিতে বলিতে দ্রুত পিছনের ঘরে প্রবেশ করিল।

... ...

অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইবার পর তাঁহার মোটামুটি পরিচয় জানিতে পারিলাম। নাম তপেশচন্দ্র বিশ্বাস; গত সাত বৎসর এইখানেই আছে দোকানের আয় হইতে সংসার নির্বাহ হইয়া যায়; সুখে দুঃখে জীবন চলিতেছে কোনও অভাব নাই। হঠাৎ এতদিন পরে একজন টাট্‌কা স্বজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া সানন্দ উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

তপেশ জাতিতে কায়স্থ কিম্বা ময়রা জানিতে পারা গেল না—জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ হইল—কিন্তু চম্‌চম্‌ ও সিঙাড়া খাসা তৈয়ার করিয়াছে।

আমাদের চায়ের আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের কাছে গুটি তিনেক যুবতীর আবির্ভাব হইল। এদেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে তাহাদের মধ্যে একটি মেমেদের মত স্কার্ট পরিয়াছে, বাকি দুইটির কাছা দিয়া কাপড় পরা। সকলের হাতেই বাজার করিবার থলি; তাহারা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া কলকণ্ঠে ডাকাডাকি সুরু করিল! তপেশ গলা বাড়াইয়া দেখিয়া হাসিমুখে কি একটা বলিল; সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের ঘর হইতেও সাড়া আসিল।

ঘরের ভিতর যে মেয়েটির সহিত তপেশকে কথা কহিতে শুনিয়াছিলাম তাহাকে এতক্ষণে দেখিলাম। সে থলে হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া আসিল, আমার প্রতি স-কৌতূহল নাতিদীর্ঘ কটাক্ষপাত করিল, তারপর তপেশকে দ্রুতকণ্ঠে কি একটা বলিয়া সখীদের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

মেয়েটির বয়স কুড়ি বাইশ—নিটোল শরীর; তাহার উপর বস্ত্রাদির বাহুল্য নাই। এ অঞ্চলে ঘাটি বলিয়া একটি জাতি আছে, তাহারা পশ্চিম ঘাটের আদিম অধিবাসী। এই জাতীয় মেয়েদের মত এমন অপূর্ব সুন্দর দেহ-গঠন খুব কম দেখা যায়। ইহারা হাঁটু পর্যন্ত আঁট-সাঁট কাছা দেওয়া রঙীন শাড়ি পরে, শাড়ির কিন্তু কোমরের উর্ধ্বে উঠিবার অধিকার নাই; উর্ধ্বাঙ্গের যৌবনোচ্ছলতাকে কেবলমাত্র একটি সস্তা ছিটের কাপড়ের আঙ্‌রাখায় দ্বারা অযত্নভরে সম্বৃত করিয়া রাখে। মাথার পরিপাটি কবরীতে ফুলের 'বেণী' জড়াইয়া ইহারা যখন উৎফুল্ল হাসিমুখে পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায় অথবা তরিতরকারি বা কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে যায়, তখন নবাগতের চোখে

তাহাদের এই সহজ ভ্রূক্ষেপহীন প্রগল্‌ভতা একটু বেহায়া মনে হইলেও রসজ্ঞ ব্যক্তির চোখে মাধুর্য বৃষ্টি না করিয়া পারে না।

এই মেয়েটি ঠিক ঐ ঘাটি-জাতীয় কি না জানি না ; তবে তাহার ভাব-সাব বেশবাস দেখিয়া সেইরূপই মনে হয়। একটি কালো চকিতনয়না হরিণীর মত ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার ক্ষিপ্র চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তপেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এটি কে?'

টেবিলের উপর চোখ নত করিয়া তপেশ একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল,—'এ আমার স্ত্রী।'

নিজের স্ত্রীর দৈহিক আব্রু সম্বন্ধে বাঙালী অতিশয় সতর্ক ; মনে হইল আমার সম্মুখে স্ত্রীর এই স্বল্প-বাস আবির্ভাবে তপেশ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছে—কারণ আমিও বাঙালী। মনে মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম,—'এখানে বিবাহাদিও করেছেন, তা'হলে?'

'হ্যাঁ, বছর তিনেক হল—' তারপর যেন বিদ্রোহের ভঙ্গীতে একটু বেশি জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল,—'এরা বড় ভাল—এমন মেয়ে হয় না—। এদের মত এমন—।' বাকি কথাটা সমুচিত ভাষার অভাবে উহ্য রহিয়া গেল। বুঝিলাম বহুবচনটা বাহুল্য মাত্র, তপেশ স্ত্রীকে ভালবাসে ; এবং পাছে আমি তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনরূপ বিপরীত ধারণা করিয়া বসি তাই তাহার মন পূর্ব হইতেই যুদ্ধোদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কথা পাল্টাইয়া দিলাম।

'এতদিন দেশছাড়া ; দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তুলেই দিয়েছেন বলুন?'

বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তপেশ বলিল,—'হাঁ, তা ছাড়া আর কি সাত বছর ওমুখো হই নি, আর বোধ হয় কখনও হবও না। কি দরকার বলুন।'

আমি বলিলাম,—'তা বটে। আপনার-জন কিম্বা বাড়ি-ঘর-দোর থাকলে তবু দেশে ফেরবার একটা টান থাকে। আপনার বোধ হয়—?'

তপেশ একটু চুপ করিয়া রহিল ; তারপর টেবিলের উপর আঙুল দিয়া দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল,—'বাড়ি-ঘর-দোর আপনার-জন—সবই ছিল। তবু একদিন হঠাৎ সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে এলুম—' বলিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হয়তো তাহার দেশত্যাগের পশ্চাতে একটা করুণ গার্হস্থ্য ট্রাজেডি লুকাইয়া আছে ; এমন তো কতই দেখা যায়, স্ত্রী-বিয়োগ বা ঐ রকম কোনও

নিদারুণ শোকের আঘাতে মানুষ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে ; তারপর কালক্রমে বৈরাগ্য ও শোক প্রশমিত হইলে আবার দেশে ফিরিয়া যায় অথবা অন্য কোথাও নূতন করিয়া সংসার পাতে। তপেশেরও সম্ভবত ঐ রকম কিছু হইয়া থাকিবে ; তারপর ঐ হরিণ-নয়না বিদেশিনী মেয়েটির আকর্ষণ-জালে জড়াইয়া পড়িয়া দেশের মায়া ভুলিয়াছে।

প্রকৃত তথ্যটা জানিবার কৌতূহল হইতেছিল অথচ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলাম। তাই চায়ে চুমুক দিতে দিতে ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিলাম,—'দেশে বিয়ে-থা করেন নি বোধ হয়? এখানেই প্রথম?'

তপেশ আমার পানে চোখ তুলিল; চোখ দুটাতে বিরাগ ও অসন্তোষ ভরা। প্রথমটা ভাবিলাম, আমার গায়ে-পড়া কৌতূহলের ফলেই সে বিরক্ত হইয়াছে ; কিন্তু যখন কথা কহিল তখন বুঝিলাম, তাহা নয় ; তাহার মুখের উপর যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা অতীতের ছায়া। মুখ শক্ত করিয়া সে বলিল,—'দেশেও বিয়ে করেছিলাম। তিনি হয়তো এখনো বেঁচেই আছেন—মরবার তো কোনও কারণ দেখি না! শুনবেন কেন দেশ ছেড়েছি? শোনেন তো বলতে পারি। কিন্তু আগে আর এক পেয়ালা চা এনে দিই, আর গোটা দুই মিষ্টি। কি বলেন?'

... ...

তপেশের কাহিনীটা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বলিতেছি ; কারণ তাহার কথায় বলিতে গেলে শুধু যে অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে তাই নয়, নানা অবান্তর কথার মিশ্রণে এলোমেলো হইয়া পড়িবে। তবে তপেশের মনে যে একটু অবচেতনার গোপন গ্লানি ছিল, গল্প বলিতে বলিতে সে যে নিজের সাফাই গাহিয়া অবচেতনাকে ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিতেছিল, এ কথাটা পাঠকের জানা দরকার, নচেৎ তাহার চরিত্রটা অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তপেশ যে একজন অতি সাধারণ সহজ প্রকৃতিস্থ মানুষ এ কথা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।

কলিকাতারই কোনও অঞ্চলে তাহার বাস। ছোট্ট একটি নিজস্ব বাড়ি ছিল। বাপ তাহার বিবাহ দিয়াই মারা গিয়াছিলেন, আর কেহ ছিল না। তপেশ আই-এ পর্যন্ত পড়িয়া কোনও মার্চেন্ট অফিসে কেরানির চাকরিতে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী-স্ত্রী মাত্র দুইটি প্রাণী; আর্থিক অভাব ছিল না। কলিকাতার বাসিন্দা, বাড়ি-ভাড়া দিতে না হইলে অতি অল্প খরচে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইয়া লইতে পারে। স্ত্রীটি দেখিতে শুনিতে ভাল। চারি বৎসরের দাম্পত্য জীবনে দুইজনের মধ্যে গুরুতর অসদ্ভাব কিছু হয় নাই। ছেলেপুলে হয় নাই বটে, কিন্তু সেজন্য কাহারও মনে দুঃখ ছিল না।

সকালবেলা দৈনিক বাজার করিয়া তারপর যথাসময় আহারাদি সারিয়া তপেশ অফিসে বাহির হইত। সে বাহির হইয়া যাইবার ঘণ্টা খানেক পরে শুকো ঝি কাজকর্ম সারিয়া চলিয়া যাইত। অতঃপর তপেশের স্ত্রী পাড়া বেড়াইতে বাহির হইত। গায়ে একটা সিল্কের চাদর জড়াইয়া আধ-ঘোমটা দিয়া রাস্তায় নামিত। তারপর এ বাড়িতে গল্প করিয়া, ও বাড়িতে তাস খেলিয়া, বৈকালে তপেশ বাড়ি ফিরিবার কিছুক্ষণ আগে ফিরিয়া আসিত। তপেশ কিছু জানিতে পারিত না।

এমন কিছু দূষণীয় আচরণ নয়। একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক সারাটা দ্বিপ্রহর একাকিনী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিতে পারিয়া যদি পাড়ার অন্যান্য গৃহস্থের বাড়িতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা-গল্পে সময় কাটাইয়া আসে, তাহাকে মারাত্মক অপরাধী বলা যায় না। কিন্তু তপেশ যখন একজন প্রতিবেশী বন্ধুর মুখে কথাটা শুনিল তখন তাহার ভাল লাগিল না। ঘরের বৌ রোজ পাড়া বেড়াইতে বাহির হইবে কেন? তাছাড়া, তাহাকে লুকাইয়া এমন কাজ করা যাহা বাহিরের লোকে জানিবে, এ কেমন স্বভাব?

তপেশ বাড়ি আসিয়া বৌকে খুব ধমক-চমক করিল। বৌ মুখ বুজিয়া শুনিল, অস্বীকার করিল না, কোনও কথার জবাব দিল না।

কিন্তু তাহার পাড়া-বেড়ানো বন্ধও হইল না। কিছুদিন পরে তপেশ আবার খবর পাইল; একটি বন্ধু এই লইয়া একটু মিঠে-কড়া রসিকতাও করিলেন। তপেশের বড় রাগ হইল। এ কি কদর্য নির্লজ্জতা! ঘরের বৌ দু-দণ্ড ঘরে থাকিতে পারে না! অবশ্য স্ত্রীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই তপেশের হয় নাই, পাড়ার লোকেও কেহ এরূপ অপবাদ দিতে পারে নাই। কিন্তু তবু তপেশ বৌকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া চীৎকার ও রাগারাগি করিল। বৌ পূর্ববৎ মুখ বুজিয়া শুনিল।

এমনি ভাবে ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তপেশ বৌকে অনেক বই মাসিক-পত্রিকা আনিয়া দেয়, যাহাতে দুপুর-

বেলাটা তাহার গল্পাদি পড়িয়া কাটিয়া যায়, বৌও দু'একদিন বাড়িতে থাকে, তারপর আবার কোন্ দুনিবার আকর্ষণের টানে গায়ে চাদর জড়াইয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়ে। আবার ঝগড়া হয়, তপেশ ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবার ভয় দেখায়, তাহাতেও কিছু ফল হয় না।

পাড়ায় এটা একটা হাসির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধুরা তামাসা করে—'কি রে, তোর সেপাই আজ রোঁদে বেরিয়েছিল ?' তপেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না—দাঁত কিশ্ কিশ্ করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যায়। তাহার মনে হয়, বৌ তাহাকে ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীর কাছে হাস্যাস্পদ করিতেছে, তাহার আব্রু ইজ্জত কিছুই আর রহিল না।

শেষে নাচার হইয়া তপেশ বৌকে অতি কঠিন দিব্য দিয়াছিল—'আর যদি অমন করে বাড়ি থেকে বেরোও, আমার মাথা খাবে, মরা মুখ দেখবে।' বৌ কাঠ হইয়া গিয়াছিল, তারপর তাহার পাড়া বেড়ানো বন্ধ হইয়াছিল।

তপেশ মনে একটু শান্তি অনুভব করিতেছিল। বৌয়ের শরীরে আর তো কোনও দোষ নাই। এটা একটা বদ্-অভ্যাস মাত্র, একবার ছাড়াইতে পারিলে আর ভাবনা নাই।

মাস খানেক পরে একদিন অফিসে মাহিনা পাইয়া তপেশ সকাল সকাল বাড়ি ফিরিল। বাহিরের দরজা ভেজানো; বাড়িতে বৌ নাই।—তাহার মাথার মধ্যে যেন চিড়িক মারিয়া উঠিল; সে শয়ন-ঘরে গিয়া ঢুকিল, সাবেক আমলের একটা বড় মজবুত তালা ঘরে ছিল; সেটা লইয়া সদর দরজায় চাবি দিয়া তপেশ বাহির হইয়া পড়িল। হাওড়া স্টেশনে আসিয়া বম্বের টিকিট কিনিয়া গাড়িতে চাপিয়া বসিল।

সেই অবধি সে দেশছাড়া; বাড়ি অথবা বৌএর কি হইল তাহা সে জানে না, জানিবার ঔৎসুক্যও নাই। পূর্ব জীবনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া সে নূতন করিয়া সংসার পাতিয়াছে।

তপেশের গল্প শেষ হইতে হইতে বেলাও শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমি উঠিয়া পড়িলাম। তাহাকে চা জলখাবারের দাম দিতে গেলাম, সে কিছুতেই লইল না। বলিল—'ও কি কথা—আপনি দেশস্থ লোক—। যদি সুবিধে হয় আর একবার আসবেন কিন্তু।'

দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়া বলিলাম,—'কৈ তোমার স্ত্রী তো এখনো ফিরে এলেন না ?'

তপেশ বলিল,—'তাড়া তো কিছু নেই, বাজার ক'রে একটু বেড়িয়ে চেড়িয়ে ফিরবে—' বলিয়াই সচকিতে আমার মুখের পানে চাহিল।

আমি অবশ্য কিছু ভাবিয়া বলি নাই কিন্তু নিরীহ প্রশ্নের আড়ালে কোনও অজ্ঞাত খোঁচা খাইয়া তপেশ একটু থতমত হইল, তারপর গলায় একটু জোর দিয়া বলিল,—'এদেশের এই রেওয়াজ—কেউ কিছু মনে করে না।—আচ্ছা নমস্কার।'

ভাল বাসা

যুদ্ধের হিড়িকে বোম্বাই শহরে বাঙালী অনেক বাড়িয়াছে। আগে যত ছিল তাহার প্রায় চতুর্গুণ। তিন বছর আগেও বোম্বাইয়ের পথেঘাটে গুজরাতী-মারাঠী-পার্শী-গোয়ানিজ মিশ্রিত জনারণ্যে হঠাৎ একটি সিঁদুর-পরা বাঙালী মেয়ে বা ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা পুরুষ দেখিলে মন পুলকিত হইয়া উঠিত, যাচিয়া কথা বলিবার ইচ্ছা হইত। এখন আর সেদিন নাই। এখন পদে পদে হাফ্-প্যাণ্ট-পরা দ্রুতপদচারী বাঙালী যুবকের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া যায়। যাহারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁহারা পূর্ববৎ শহরের উত্তরাঞ্চলে খানিকটা স্থানে বাঙালীপাড়া তৈয়ার করিয়া বাস করিতেছেন; নূতন আমদানী যাহারা, তাহারা শহরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে কোথায় কি ভাবে থাকে তাহার ঠিকানা করা কঠিন। তাহারা যুদ্ধের জোয়ারে ভাসিয়া আসিয়াছে, যখন যুদ্ধ শেষ হইবে তখন আবার ভাঁটার টানে বাংলা দেশের বিপুল গর্ভে ফিরিয়া যাইবে।

গত সাত বৎসর যাবৎ আমিও এ-প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছি। তবে আমি বোম্বাই শহরের সীমানার বাহিরে থাকি; বেশি দূর নয়, মাত্র আঠারো মাইল। বাড়িটি ভাল এবং পাড়াটি নিরিবিলি; ইলেকট্রিক ট্রেনের কল্যাণে অল্প সময়ের মধ্যে শহরে পৌঁছানো যায়। কোনও হাঙ্গামা নাই। শহরে থাকার সুখ ও পাড়াগাঁয়ে থাকার শান্তি দুই-ই একসঙ্গে ভোগ করি। বন্ধুরা হিংসা করেন—কিন্তু সে যাক। এটা আমার কাহিনী নয়, ঘেঁচুর উপাখ্যান।

মাসকয়েক আগে একটা কাজে শহরে গিয়াছিলাম। গিরগাঁও অঞ্চলের জনাকীর্ণ ফুটপাথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখি—ঘেঁচু! বিকালবেলার পড়ন্ত রৌদ্রে খাকি হাফপ্যাণ্ট ও হাফশার্ট-পরা কৃষ্ণকায় ছোকরাকে দেখিয়া চিনিতে

বিলম্ব হইল না—আমাদের ঘেঁচুই বটে। তাহার চেহারাখানা এমন কিছু অসামান্য নয় কিন্তু অমন সজারুর মত খোঁচা খোঁচা চুল এবং তিনকোণা কান আর কাহারও হইতেই পারে না।

ঘেঁচুকে ছেলেবেলা হইতেই চিনি; আমাদের গাঁয়ের ছেলে—বিষ্ণু মাইতির ভাইপো। এখন বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি দাঁড়াইয়াছে। যখন তাহাকে শেষ দেখি তখন সে গাঁয়ের মিড্ল্ স্কুলে পড়িত এবং ডাংগুলি খেলিত। চেহারা কিছুই বদলায় নাই, কেবল একটু ঢ্যাঙা হইয়াছে। এই ছেলেটা বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ের একটি পঙ্কিল পানাপুকুরের অতি ক্ষুদ্র পুঁটিমাছের মত ছিপের এক টানে একেবারে বোম্বাইয়ের শুক্না ডাঙায় আসিয়া পড়িয়াছে।

বলিলাম—'আরে ঘেঁচু! তুই!'

ঘেঁচু একটা ইরাণী হোটেল হইতে মুখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইতেছিল, আমার ডাক শুনিয়া ক্ষণকাল বুদ্ধিভ্রষ্টের মত তাকাইয়া রহিল; তারপর লাফাইয়া আসিয়া এক খাম্চা পায়ের ধূলা লইল—

'বটুকদা!'

তাহার আনন্দবিহ্বলতার বর্ণনা করা কঠিন। হারানো কুকুরছানা অচেনা পথের মাঝখানে হঠাৎ প্রভুকে দেখিতে পাইলে যেমন অসম্বৃত আনন্দে অধীর ও চঞ্চল হইয়া উঠে, ঘেঁচুও তেমনি আমাকে পাইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল—কি বলিবে কি করিবে কিছুই যেন ভাবিয়া পায় না। সে সামান্য একটু তোৎলা, কিন্তু এখন তাহার কথা পদে পদে আটকাইয়া যাইতে লাগিল—'হাঃ হাশ্চর্য! আপনি কী ক'রে আমাকে দেখে ফেললেন? আম্মিও আপনার ঠ্‌ঠিকানা লিখে এনেছিলুম, কৃকিন্তু কাগজের চিল্‌তেটা কোথায় হাঃ হারিয়ে গেল। আর কী ক'রে খোঁজ নেব? কেউ একটা কথা বুঝতে পারে না, কিড়ির মিড়ির ক'রে কী বলে আম্মিও বুঝতে পারি না—এসে অবধি একটা বাঙালীর মুখ দেখি নি। ভাঃ ভাগ্যে দেখা হয়ে গেল—নৈলে তো—'

নিজের কাজ ভুলিয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়াই তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলাম। ছেলেটা ভালমানুষ, তাহার উপর বলিতে গেলে এই প্রথম পাড়াগাঁয়ের বাহিরে পা বাড়াইয়াছে। নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। দিন সাতেক হইল সে বোম্বাই আসিয়াছে, আসিয়াই কোন্ এক যুদ্ধ-সম্পর্কিত কারখানায় যোগ দিয়াছে। একটা মাথা গুঁজিবার আস্তানা খুঁজিতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়াছিল, শেষে এক মারাঠী

সহকর্মীর কৃপায় একটা চৌলে একটি খোলি পাইয়াছে। সেইখানেই থাকে এবং চৌলের নীচের তলায় একটা নিরামিষ হোটেলে খায়। এখানে আসিয়া অবধি মাছের মুখ দেখে নাই, কেবল ডাল রুটি আর তেলাকুচার তরকারি খাইয়া তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।

বর্ণনা শেষ করিয়া ঘেঁচু সজলনেত্রে বলিল—'বটুকদা, এদেশের রান্না আমি মুখে দিতে পারি না; খাবারের দিকে যখন তাকাই প্রাণটা হু হুঃ ক'রে ওঠে। আর কিছু নয়, দুটি ভাত আর মাছের ঝোল যদি পেতুম—'

বলিলাম—'সে না হয় ক্রমে স'য়ে যাবে। কিন্তু তুই যে এখানে একটা মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়েছিস্ এই ভাগ্যি। আজকাল তাই কেউ পায় না।'

ঘেঁচু বলিল—'মাথা গোঁজবার জায়গা যদি স্বচক্ষে দেখেন বটুকদা, তা হলে আপনারও কান্না পাবে। আসবেন—দেখবেন? বেশি দূর নয়, ঐ মোড়টা ঘুরেই—'

ঘেঁচুর সঙ্গে তাহার বাসা দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড একখানা চারতলা বাড়ি, তাহার আপাদমস্তক পায়রার খোপের মত ছোট কুঠুরী বা খোলি। প্রত্যেক কুঠুরীতে একটি করিয়া মধ্যবিত্ত পরিবার থাকে; সেই একটি ঘরের মধ্যে শয়ন রান্না সব কিছুই সম্পাদিত হয়। ইহাই বোম্বাইয়ের চৌল। এক একটি বড় চৌলে শতাধিক ভদ্র দরিদ্র পরিবার কাচ্চাবাচ্চা লইয়া বৎসরের পর বৎসর বাস করে। ঐটুকু পরিসরের অধিক বাসস্থান পাওয়া যায় না, বোধ করি ইহারা প্রয়োজনও মনে করে না।

ঘেঁচুর খোলি চৌলের চারতলায়। তিনপ্রস্থ অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলাম। লম্বা সঙ্কীর্ণ বারান্দা এপ্রান্ত ওপ্রান্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহারই দুই পাশে সারি সারি ঘরের দরজা। বারান্দায় অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, কুস্তি লড়িতেছে। প্রত্যেকটি দ্বারের কাছে একটি দুটি স্ত্রীলোক মেঝেয় বসিয়া গম বা ডাল বাছিতেছে, নিজেদের মধ্যে হাসিতেছে গল্প করিতেছে। অপরিচিত আগন্তুক কেহ আসিলে ক্ষণেক নিরুৎসুক চক্ষে চাহিয়া দেখিয়া আবার ডাল বাছায় মন দিতেছে।

বারান্দার একপ্রান্তে ঘেঁচুর ঘর। দেখিলাম, ঘরটি আদৌ ঘর ছিল না, ব্যাল্‌কনি ছিল। ঘরের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান গৃহস্বামী স্থানটি তক্তা দিয়া ঘিরিয়া সম্মুখে একটি দরজা বসাইয়া রীতিমত ঘর বানাইয়া ভাড়া

দিয়েছেন। ভিতরটি দেশালায়ের বাক্সের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঘেঁচুর একটি তোরঙ্গ ও গুটানো বিছানা তেই তাহার অর্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে।

ঘেঁচু বলিল—'দেখছেন তো! দরজা বন্ধ করলে দম বন্ধ হয়ে যায়, আর খুলে রাখলে মনে হয় হাঃ হাটের মধ্যিখানে বসে আছি। সাতদিন রয়েছি, একটা লোকের সঙ্গে মুখ-চেনাচেনি হয় নি। কেউ ডেকে কথা কয় না; আর কী বা কথা কইবে? বুঝতে পারলে তো! ইংরিজিও কেউ বোঝে না, সব সাট্টাবাজারের গোমস্তা। বলুন তো, এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে? কেন যে মরতে চাকরি করতে এসেছিলুম! এক এক সময় লোভ হয়, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু প্‌পালাবার কি জো আছে—লড়াইয়ের চাকরি—ধ্‌ধরেই জেলে পুরে দেবে—'

ছেলেটার কথা শুনিয়া বড় মায়া হইল; বলিলাম—'চল্‌ ঘেঁচু, তুই আমার বাড়িতে থাকবি। আমার একটা ফালতু ঘর আছে—হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবি। আর কিছু না হোক, তোর বৌদির রান্না ডালভাত তো দু'বেলা পেটে পড়বে।'

আহ্লাদে ঘেঁচু নাচিয়া উঠিলেও, শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখা গেল ব্যবস্থাটা খুব কার্যকরী নয়। ঘেঁচুকে সকাল আটটার মধ্যে কারখানায় হাজ্‌রি দিতে হয়। একঘণ্টা ট্রেনে আসিয়া তারপর আরও আধঘণ্টা পায়ে হাঁটিয়া ঠিক আটটার সময় প্রত্যহ কারখানায় হাজির হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর মনে হইল না।

ঘেঁচু দুঃখিতভাবে বলিল—'আমার কপালে নেই তো কী হবে! কিন্তু বটুকদা, এখানে আর পারছি না। আপনি অন্য কোথাও একটা ভ্‌ভাল বাসা দেখে দিন—যেখানে স্‌সকাল বিকেল দুটো বাংলা কথা শুনতে পাই—আর যদি মাঝে মাঝে দুটি মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যায়—'

আমি বলিলাম—'চেষ্টা করব। কিন্তু আজকাল ভাল বাসা পাওয়া তো সহজ কথা নয়। যদি বা একটা ভদ্রলোকের মত ঘর পাওয়া যায়, তার ভাড়া হয় তো পনেরো টাকা কিন্তু পাগড়ী দিতে হবে দেড় হাজার।'

ঘেঁচু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—'পাগ্‌ড়ী?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাগড়ী; যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোড়া! সেলামী আর কি! গভর্মেণ্ট্‌ আইন করে দিয়েছে বাড়িওয়ালারা ভাড়া বাড়াতে পারবে না,

তাই রসিদ না দিয়ে মোটা টাকা গোড়াতেই আদায় করে নেয়। এ তো আর ভেতো বাঙালীর বুদ্ধি নয়—গুজরাতী বুদ্ধি।'

ঘেঁচু বলিল—'ও ব্বাবা, অত টাকা কোথায় পাব। মাইনে তো পাই কুল্লে—'

বলিলাম, 'না না, সে তোকে ভাবতে হবে না। বাসা যদি জোগাড় করতে পারি, বিনা পাগড়ীতেই পাবি। চেষ্টা করব দাদারে, মানে বাঙালীপাড়ায়। তোর ভাগ্যে থাকে তো এক-আধটা ঘর পেলেও পেতে পারি। কিন্তু তুই ভরসা রাখিস নে; মনে ভেবে রাখ এইখানেই তোকে থাকতে হবে। আর একটা কথা বলি, যখন এদেশে এসেছিস তখন এদেশের ভাষাও শিখতে আরম্ভ কর। নৈলে এভাবে কদ্দিন চালাবি ?'

কাতরভাবে ঘেঁচু বলিল—'সে তো ঠ্‌ঠিক কথা বটুকদা, কিন্তু ও কিচির-মিচির ভাষা কি শিখতে পারব ? ভাষা শুনলে মনে হয় চ্চাল কড়াই দাঁতে ফেলে চিবচ্ছে—'

বলিলাম—'নতুন নতুন অমনি মনে হয়—ক্রমে সয়ে যাবে। কথায় বলে যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।'

নিরপরাধ আসামী যেভাবে ফাঁসির আজ্ঞা গ্রহণ করে তেমনিভাবে ঘেঁচু বলিল—'বেশ, আপনি যখন বলছেন—'

সেদিন ঘেঁচুকে তাহার কোটরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। স্থির করিলাম অবকাশ পাইলেই দাদারে গিয়া তাহার জন্য ভাল বাসার খোঁজ করিব। সেখানে অনেক ভদ্রলোক আছেন, তাঁহাদেরই কাহারও পরিবারে একটি আলাদা ঘর ও দুটি মাছের ঝোল ভাত জোগাড় করা বোধ করি একেবারে অসম্ভব হইবে না।

তারপর পাঁচটা কাজে পড়িয়া ঘেঁচুর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে পড়িল প্রায় দু'হপ্তা পরে। বেচারা নির্বান্ধব পুরীতে ঢেলাকুচার তরকারি খাইয়া কত কষ্টই না পাইতেছে এবং অসহায় ভাবে আমার পথ চাহিয়া আছে! অনুতপ্ত মনে সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দাদারে গেলাম। ঘেঁচুর কপাল ভাল; দু-একজনের সঙ্গে কথা কহিয়াই খবর পাইলাম, একটি ভদ্রলোকের বাসায় একটি ঘর শীঘ্রই খালি হইবার সম্ভাবনা আছে—যে বৈতনিক অতিথিটি ঘর দখল করিয়া আছেন তিনি নাকি শীঘ্রই বদুলি হইয়া চলিয়া যাইবেন। দ্রুত গিয়া ভদ্রলোককে ধরিলাম। সনির্বন্ধ অনুরোধ বিফল হইল না। বৈতনিক

অতিথিটির চলিয়া যাইতে এখনও হপ্তা-দুই দেরি আছে, কিন্তু তিনি বিদায় হইলেই ঘেঁচু তাঁহার স্থান অধিকার করিবে, এ ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল।

ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম; ভাবিলাম ঘেঁচুকে সুখবরটা দিয়া যাই, সে আশায় বুক বাঁধিয়া এই কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে।

ঘেঁচুর চৌলে পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। তাহার কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখি সে মেঝেয় বিছানা পাতিয়া বসিয়া পরম মনোযোগের সহিত একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'বটুকদা, আপনি ব'লে গিছলেন, এই দেখুন মারাঠী প্রথম ভাগ আরম্ভ করেছি। বাপ্, এর নাম কি ভাষা, স্রেফ্ পাথর আর ইটপাটকেল। হুঃ উচ্চারণ করতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা; যখন ধরেছি, হয় এস্পার নয় ওস্পার।'

হাসিয়া বলিলাম—'বেশ বেশ! কিন্তু শিখছিস কার কাছে? শুধু বই থেকে তো শেখা যায় না।'

ঘেঁচু বলিল—'সে জোগাড় হয়েছে। ৩৭ নম্বর ঘরে থাকে—বেঙ্কটরাও ব'লে একজন মারাঠী। বেশ ভদ্রলোক, আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড় হবে; একটু আধটু হিঃ হিংরিজি বলতে পারে—সে-ই শেখাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের **translation** পড়েছে কিনা, বাঙালীর ওপর ভারি ভক্তি।'

রবীন্দ্রনাথ, আর কিছু না হোক, বাঙালীর জন্য ঐটুকু করিয়া গিয়াছেন; বিদেশে তাঁহার স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিলে খাতির পাওয়া যায়।

যা হোক, ঘেঁচুকে বাসার খবর দিয়া তাহার মাছের-ঝোল ভাত সম্ভোগের আসন্ন সম্ভাবনার আশ্বাস জানাইলাম। সে আহ্লাদে এতই তোৎলা হইয়া গেল যে তাহার একটা কথাও বোঝা গেল না। অতঃপর সে-রাত্রে বাড়ি ফিরিলাম।

দু'হপ্তা পরে দাদারের ভদ্রলোকটি জানাইলেন যে, বাসা খালি হইয়াছে, এখন ঘেঁচু ইচ্ছা করিলেই তাহা দখল করিতে পারে। আবার ঘেঁচুর কাছে গেলাম। তাহাকে তাহার নূতন বাসায় অধিষ্ঠিত করিয়া তবে আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব।

সন্ধ্যার পর বাতি জ্বলিয়াছিল। ঘেঁচুর দ্বারের কাছে পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ঘরের মধ্যে বেশ একটি ছোটখাট মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। মেঝেয় পাতা বিছানার উপর চা এবং এক থাল চিঁড়া চীনাবাদাম

ভাজা (এদেশের ভাষায় 'ভাজিয়া') ; তাহাই ঘিরিয়া বসিয়াছে ঘেঁচু এবং একটি মহারাষ্ট্র-মিথুন। পুরুষটি বেঁটে, নিরেট ধরনের চেহারা, বুদ্ধিমানের মত মুখ ; নারীটি কুঙ্কুমচিহ্নিতললাট, আঁটসাঁট আঠারো হাত শাড়ি পরা একটি স্নিগ্ধ কমকান্তি যুবতী। চা পান, 'ভাজিয়া' ভক্ষণ ও হাস্যকৌতুকের ফাঁকে ফাঁকে ভাষা-শিক্ষা চলিতেছে। আর একটি হাফপ্যাণ্ট ও হাতকাটা গেঞ্জি পরিহিত দুই বছরের বালক আপন মনে ঘরময় দাপাইয়া বেড়াইতেছে।

আমাকে দেখিতে পাইয়া ঘেঁচু একটু সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর বন্ধুদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

'এই যে আসুন বটুকদা! ইনি হলেন গিয়ে বেঙ্কটরাও পাটিল, যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলুম। আর ইনি হচ্ছেন ওঁর স্ত্রী হংসাবাই। আর ঐ যে দেখছেন ছোট্ট মানুষটি, উনি হচ্চেন এঁদের ছেলে।'

নবপরিচিতদের সহিত নমস্কার বিনিময় করিয়া বিছানার একপাশে বসিলাম। যুবকটি একটু গম্ভীর অল্পভাষী, যুবতীটি সপ্রতিভ মৃদুহাসিনী। মারাঠী মেয়েদের মধ্যে ঘোমটা বা পর্দা কোনকালেই নাই ; অনাত্মীয় পুরুষের সহিত সুষ্ঠু মেলামেশার কোনও বাধা নাই। দেখিলাম ঘেঁচু এই নবীন মারাঠী-দম্পতীর বেশ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

ঘেঁচু শিশুটির গতিবিধি স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'কী দুষ্ট যে ঐ ছেলেটা—যাকে বলে আস্ত ডাকাত, একেবারে আসল বর্গী। ওর নাম কি জানেন,—বিঠ্ঠল! যাকে আমাদের দেশে বিট্‌লে বলে তাই।' ঘেঁচু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর বলিলাম—'ঘেঁচু, তোমার নতুন বাসা খালি হয়েছে—কালকেই গিয়ে দখল নিতে পার।'

ঘেঁচু হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া তোৎলাইতে আরম্ভ করিল। তাহার তোৎলামি কতকটা শান্ত হইলে বুঝিলাম সে বলিতেছে—'আমি এইখানেই থাকি বটুকদা, এখানে মন বসে গেছে। এঁদের সঙ্গে ভ্‌ভাব হয়ে অবধি······ জানেন, আজকাল আমি এঁদের সঙ্গেই খ্‌খাবার ব্যবস্থা করেছি। এঁরা রুটি ভাত দুইই খান ; মাছ-মাংস অবিশ্যি হয় না, কিন্তু ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। হংসাবৌদি যে কী সুন্দর রাঁধেন তা আর কী বলব। বড্ড ভাল লোক এঁরা। আমি আর কোথাও যাব না বটুকদা, মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিলুম—'

শিশু বর্গীটি ইতিমধ্যে ঘেঁচুর ট্রাঙ্কের উপর উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঘেঁচু তাহাকে ধমক দিয়া ডাকিল—'এই বিট্‌লে, এদিকে আয়—ইক্‌ড়ে ইক্‌ড়ে—'

বুঝিলাম, ঘেঁচুর ভাল বাসার আর প্রয়োজন নাই, সে ঐ বস্তুই আরও ঘনিষ্ঠ আকারে লাভ করিয়াছে।

অসমাপ্ত

কয়েক জন নবীন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল।

তিনি অর্ধমুদ্রিত নেত্রে গড়গড়ার নলে একটি দীর্ঘ টান দিলেন; কিন্তু ে পরিমাণ টান দিলেন, সে পরিমাণ ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন নল রাখি তিনি বলিলেন—

'আজকাল তোমাদের লেখায় 'প্রকৃতি' কথাটা খুব দেখতে পাই। পরম প্রকৃতি এই করলেন; প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এই হল, ইত্যাদি। প্রকৃি বলতে তোমরা কি বোঝো তা তোমরাই জানো; বোধ হয় ভগবানের না উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়, তাই প্রকৃতি নাম দিয়ে একটা নতুন দেবতা তৈি করে তার ঘাড়ে সব কিছু চাপিয়ে দিতে চাও। ভগবানের চেয়ে ইনি এক কাঠি বাড়া, কারণ, ভগবানের দয়া-মায়া আছে, ধর্মজ্ঞান আছে। তোমাদে এই প্রকৃতিকে দেখলে মনে হয়, ইনি একটি অতি আধুনিকা বিদুষী তরুণী— ফ্রয়েড পড়েছেন এবং কুসংস্কারের কোনও ধার ধারেন না। মানুষের ভাগ ইনি নির্দয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত করছেন, অথচ মানুষের ধর্ম বা নীতির কোন তোয়াক্কা রাখেন না।

এই অত্যন্ত চরিত্রহীন স্ত্রীলোকটির তোমরা নাম দিয়েছ—প্রকৃতি। এঁকে আমি বিশ্বসংসারে অনেক সন্ধান করেছি, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি। একট অন্ধ শক্তি আছে মানি, কিন্তু তার বুদ্ধি-সুদ্ধি আক্কেল-বিবেচনা কিছু নেই। পাগলা হাতীর মত তার স্বভাব, সে খালি ভাঙতে জানে, অপচয় করতে জানে। তার কাজের মধ্যে কোনও নিয়ম আছে কি না কেউ জানে না; যদি থাকে তাও তোমাদের ঐ মধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত—অর্থাৎ নিয়ম আছে বটে কিন্তু তার কোন মানে হয় না।

চাকর কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল, শরৎচন্দ্র নলে মৃদু মৃদু টান দিলেন।

সব চেয়ে পরিতাপের কথা, তোমাদের প্রকৃতি আর্টিস্ট নয়; কিম্বা তোমাদের মত আর্টিস্ট। তার সামঞ্জস্য-জ্ঞান নেই, পূর্বাপর জ্ঞান নেই, কোথায় গল্প আরম্ভ করতে হবে জানে না, কোথায় শেষ করতে হবে জানে না, নোংরামি করতে এতটুকু লজ্জা নেই, মহত্ত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই —ছন্নছাড়া নীরস একঘেয়ে কাহিনী ক্রমাগত বলেই চলেছে। একই কথা হাজার বার বলেও ক্লান্তি নেই। আবার কখনও একটা কথা আরম্ভ হতে না হতে ঝপাং করে শেষ করে ফেলছে। মূঢ়—বিবেকহীন—রসবুদ্ধিহীন—

একবার একটা গল্প বেশ জমিয়ে এনেছিল; ক্লাইম্যাক্সের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ ভণ্ডুল করে ফেললে।

গল্পটা বলি শোনো। গৃহদাহ পড়েছ তো, কতকটা সেই ধরনের; তফাৎ এই যে, এ গল্পটা বলেছিল তোমাদের প্রকৃতি—অর্থাৎ সত্য ঘটনা।

পানা-পুকুরের তলায় যেমন পাঁক, আর ওপরে শ্যাওলা, সমাজেরও তাই। পাঁক কুশ্রী হোক, তবু সে ফসল ফলাতে পারে; শ্যাওলার কোনও গুণ নেই। নিষ্ফলতার লঘুত্ব নিয়ে এরা শুধু জলের ওপর ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু তাই বলে এদের জীবনে তীব্রতার কিছুমাত্র অভাব নেই। বরঞ্চ কৃত্রিম উপায়ে এরা অনুভূতিকে এমন তীব্র করে তুলেছে যে, পঞ্চরংয়ের নেশাতেও এমন হয় না। সত্যিকার আনন্দ কাকে বলে তা এরা জানে না, তাই প্রবল উত্তেজনাকেই আনন্দ বলে ভুল করে; সত্যের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই, তাই স্বেচ্ছাচারকেই এরা পরম সত্য বলে ধরে নিয়েছে।

ভূমিকা শুনে তোমরা ভাবছ গল্পটা বুঝি ভারি লোমহর্ষণ গোছের একটা কিছু। মোটেই তা নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে চিরন্তন ত্রিভুজ, এও তাই—অর্থাৎ দুটি যুবক এবং একটি যুবতী। সেই সুরেশ, মহিম আর অচলা।

কিন্তু এদের চরিত্র একেবারে আলাদা! এ গল্পের অচলাটি সুন্দরী কুহকময়ী হ্লাদিনী—হৃদয় বলে তাঁর কিছু ছিল কি না তা তোমাদের প্রকৃতি দেবীই বলতে পারেন। ছিল ভোগ করবার অতৃপ্ত তৃষ্ণা আর ছিল ঠমক, মোহ, প্রগল্‌ভতা—পুরুষের মাথা খাওয়ার সমস্ত উপকরণই ছিল।

ওদিকে মহিম ছিল দুর্দান্ত একরোখা গোঁয়ার; যুদ্ধের মরসুমে সে টাকা করেছিল প্রচুর—ধনকুবের বললেও চলে। আর সুরেশ ছিল অত্যন্ত সুপুরুষ, ভয়ানক কুচুটে—কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে মধ্যবিত্ত। টাকার দিক্ দিয়ে মহিমের সঙ্গে যেমন তার তুলনা হত না, চেহারার দিক দিয়ে তেমনি তার সঙ্গে মহিমের তুলনা হত না। দু'জনে দু'জনকে হিংসে করত; বাইরে লৌকিক ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ভিতরে ভিতরে তাদের সম্পর্কটা ছিল সাপে-নেউলে।

এই তিন জনকে নিয়ে পানা-পুকুরের ওপর ত্রিভুজ রচনা হল। কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়। কিছুদিন অচলা এদের দুজনকে খেলালে, তার পর ঠিক করে নিলে কাকে তার বেশি দরকার। সে কালে কি ছিল জানি না, কিন্তু আজকালকার দিনে যদি কুবের আর কন্দর্প কোনও রাজকন্যের স্বয়ংবর-সভায় আসতেন, তাহলে কুবেরের গলাতেই মালা পড়ত, কন্দর্পকে তীর ধনুক গুটিয়ে পালাতে হত।

মহিমের সঙ্গেই অচলার বিয়ে হল। সুরেশ বেশ হাসিমুখে পরাজয় স্বীকার করে নিলে; কারণ সে বুঝেছিল, এ পরাজয় শেষ পরাজয় নয়, মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম চক্কর মাত্র। হয়তো সে অচলার চোখের চাউনি থেকে কোনও আভাস পেয়েছিল।

একটা কথা বলি। প্রেমিকেরা চোখের ভাষা বুঝতে পারে, এমনি একটা ধারণা আছে—একেবারে মিথ্যে ধারণা। প্রেমিকেরা কিচ্ছু বোঝে না। স্ত্রীজাতির চোখের ভাষা বুঝতে পারে শুধু লম্পট।

বিয়ের পরে একদিন মহিমের বাগানে চায়ের জলসা ছিল। জমজমাট জলসা, তার মাঝখানে সুরেশ বললে,—"মহিম, তুমি শুনে সুখী হবে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তবে নেহাৎ সিপাহী সেজে নয়; ঠিক করেছি পাইলট হয়ে যাব।"

একটু শ্লেষ করে মহিম বললে,—"তাই নাকি! এ দুর্মতি হল যে হঠাৎ?"

সুরেশ হেসে উত্তর দিলে,—"হঠাৎ আর কি, কিছুদিন থেকেই ভাবছি। এ যুদ্ধটা তো তোমার আমার মতন লোকের জন্যেই হয়েছে; অর্থাৎ আমার মত লোক যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর তোমার মত লোক টাকার পিরামিড তৈরি করবে।"

মহিমের মুখ গরম হয়ে উঠল, কিন্তু সে উত্তর দিতে পারলে না। সে ভারি একরোখা লোক কিন্তু মিষ্টভাবে কথা কাটাকাটিতে পটু নয়।

আকাশে একটা এরোপ্লেন উড়ছিল ; তার পানে অলস কটাক্ষপাত ক্বরে সুরেশ বললে,—"আমার পাইলটের লাইসেন্স আছে কিন্তু প্লেন নেই। তোমার প্লেনটা ধার দাও না—যুদ্ধ ক'রে আসি। যদি ফিরি প্লেন ফেরৎ পাবে ; আর যদি না ফিরি, তোমার এমন কিছু গায়ে লাগবে না। বরং নাম হবে।"

রাগে মহিম কিছুক্ষণ মুখ কালো করে বসে রইল, তারপর কড়া একগুঁয়ে স্বরে বলে উঠল—"তোমাকে প্লেন ধার দিতে পারি না, কারণ, আমি নিজেই যুদ্ধে যাব ঠিক করেছি।"

বলা বাহুল্য, দু'মিনিট আগেও যুদ্ধে যাবার কল্পনা তার মনের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না।

মাস দু'য়ের মধ্যে মহিম সব ঠিক-ঠাক করে এরোপ্লেনে চড়ে যুদ্ধে চলে গেল। যাবার সময় উইল করে গেল, সে যদি না ফেরে অচলা তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

সুরেশের কিন্তু যুদ্ধে যাওয়া হল না। বোধ করি, ধারে এরোপ্লেন পাওয়া গেল না বলেই তার যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জন দেওয়া ঘটে উঠল না।

বর্মার আকাশে তখন যুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া বাজছে ; বেঁটে বীরেরা হু-হু করে এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষেও গেল-গেল রব। যারা পালিয়ে আসছে তাদের মুখে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প।

মহিম ফ্রণ্টে যুদ্ধ করছে। তিন মাস কাটল। এ দিকে মহিমের বাড়িতে প্রায় প্রত্যহই উৎসব চলেছে ; গান-বাজনা নাচ নৈশ-ভোজন। স্বামীর কথা ভেবে-ভেবে অচলার মন ভেঙে না পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তো! সে দিকে সুরেশ খুবই দৃষ্টি রাখে; সর্বদাই সে অচলার সঙ্গে আছে। দুপুর রাত্রে যখন আর সব অতিথিরা চলে যায়, তখনও সুরেশ অচলাকে আগলে থাকে। যে দিন অতিথিদের শুভাগমন হয় না, সে দিন সুরেশ একাই অচলার চিত্তবিনোদন করে। ক্রমে লোকলজ্জার আড়াল-আবডালও আর কিছু থাকে না, তোমাদের প্রকৃতি দেবী ব্যাপারটাকে নিতান্ত নির্লজ্জ এবং শ্রীহীন করে তোলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহিম নিয়মিত চিঠি পায় ; বন্ধু-বান্ধবের চিঠি, অচলার চিঠি। বন্ধু-বান্ধবের চিঠিতে ক্রমে ক্রমে নানা রকম ইসারা-ইঙ্গিত দেখা দিতে লাগল। নিতান্ত ভালমানুষের মত তাঁরা অচলার জীবনযাত্রার যে বর্ণনা লিখে

পাঠান, তার ভিতর থেকে আসল বক্তব্যটা ফুটে ফুটে বেরোয়। মহিম গোঁয়ার বটে কিন্তু নির্বোধ নয়; সে বুঝতে পারে। অচলার চিঠিতে মামুলি শুভাকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগের বাঁধা গৎ ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকে না, তাও ক্রমশ এমন শিথিল হয়ে আসতে লাগল যে মনে হয়, ঐ মামুলি বাঁধি গৎ লিখতেও অচলার ক্লান্তিবোধ হয়। মহিমের কিছুই বুঝতে বাকি রইল না; সে মনে মনে গর্জাতে লাগল।

সে ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠাল, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হল না। যুদ্ধের অবস্থা সঙীন; এখন কেউ ছুটি পাবে না।

এই সময় মিত্রপক্ষের এক দল বিমান শত্রুর একটা ঘাঁটির বিরুদ্ধে অভিযান করল; মহিমকে যেতে হল সেই সঙ্গে। তুমুল আকাশ-যুদ্ধ হল। মিত্রপক্ষের কয়েকটা বিমান ফিরে এল, কিন্তু মহিম ফিরল না। তার জ্বলন্ত প্লেনখানা উল্কার মত যুদ্ধের আকাশে মিলিয়ে গেল।

মহিমের মৃত্যু-সংবাদ যখন কলকাতায় পৌঁছুল, তখন পানা-পুকুরের মাঝখানে ঢিল ফেলার মত বেশ একটা তরঙ্গ উঠল। কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়, আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অচলা কালো রঙের শোক-বেশ পরল কিছু দিনের জন্য; তার পর মহিমের উইল অনুসারে আদালতের অনুমতি নিয়ে তার সম্পত্তির খাস মালিক হয়ে বসল। সুরেশ এত দিন একটা আলাদা বাড়ি রেখেছিল, এখন খোলাখুলি এসে মহিমের বাড়িতে বাস করতে লাগল। যার টাকা আছে তাকে শাসন করে কে? দু'জনে মিলে এমন কাণ্ড আরম্ভ করে দিলে যা দেখে বোধ করি 'ভেলু'রও লজ্জা হয়।

মহিম কিন্তু মরেনি। তার আহত প্লেনখানা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে এসে আসামের জঙ্গলের মধ্যে ভেঙে পড়েছিল। মহিমের চোট লেগেছিল বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। তার পর সে কি করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আশী মাইল হাঁটা-পথ চলে শেষ পর্যন্ত রেলপথে কলকাতা এসে পৌঁছল, তার বিশদ বর্ণনা করতে গেলে শিশু-সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, সে কলকাতা ফিরে এল। সে যে মরেনি এ খবর সে মিলিটারি কর্তৃপক্ষকে জানাল না; তার বেঁচে থাকার খবর কেউ জানল না।

কলকাতায় এসে সে একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে ছদ্মনামে ঘর ভাড়া করে রইল।

সেই দিনই সে সংবাদপত্রে একটা খবর দেখল—মহিমের বিধবা রেজেষ্ট্রি

অফিসে সুরেশকে বিয়ে করেছে; আজ রাত্রে তার বাড়িতে এই উপলক্ষে ভোজ। শহরের গণ্যমান্য সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

মহিম ঠিক করল, আজ রাত্রে ভোজ যখন খুব জমে উঠবে, তখন সে গিয়ে দেখা দেবে।

ভেবে দেখো ব্যাপারটা। চরিত্রহীনা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর দু'মাস যেতে না যেতেই স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিয়ে করেছে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ স্বামী চলেছে প্রতিশোধ নিতে। গল্প জমাট হয়ে একেবারে চরম ক্লাইমেক্সের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পর কি হল বল দেখি?

কিছুই হল না।

মহিম সন্ধ্যার পর নিজের বাড়িতে যাবার জন্য যেই রাস্তায় পা দিয়েছে অমনি এক মিলিটারী লরি এসে তাকে চাপা দিলে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল; তার মুখখানা এমন ভাবে থেঁতো হয়ে গেল যে, তাকে সনাক্ত করবার আর কোনও উপায় রইল না।

ওদিকে অচলার বাড়ীতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভোজ চলল। গণ্যমান্য অতিথিরা আশী টাকা বোতলের মদ খেয়ে রাত্রি তিনটের সময় হর্ষধ্বনি করতে করতে বাড়ি ফিরলেন। কত বড় একটা ড্রামা শেষ মুহূর্তে এসে নষ্ট হয়ে গেল, তা তারা জানতেও পারলে না।

তাই বলছিলুম, তোমাদের প্রকৃতি সত্যিকার আর্টিস্ট নয়। ক্লাইমেক্স বোঝে না, poetic justice জানে না—কেবল নোংরামি আর বাজে কথা নিয়ে তার কারবার। সত্যি কি না তোমরাই বল।

শরৎচন্দ্র নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটা বিলম্বিত টান দিলেন; কিন্তু কলিকাটা গড়গড়ার মাথায় পুড়িয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, ধোঁয়া বাহির হইল না।

ভূতোর চন্দ্রবিন্দু

বিভূতি ওরফে ভূতোকে সকলেই গোঁয়ার বলিয়া জানিত। কিন্তু সে যখন বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিল তখন দেখা গেল বৌটি তাহার চেয়েও এক কাঠি বাড়া, অর্থাৎ একেবারে কাঠ গোঁয়ার। কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি হইতেও বেশি বিলম্ব হয় নাই।

ছোট শহর, সকলেই সকলকে চেনে। ভূতোকে সকলেই চিনিত এবং মনে মনে ভয় করিত। গ্যাঁটা-গোঁটা নিরেট চেহারা; কথাবার্তা বেশি বলিত না। টাকাকড়ি সম্বন্ধে তাহার হাত যেমন দরাজ ছিল, তেমনি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে মুখ ফুটিবার আগেই তাহার হাত ছুটিত। বাড়িতে তাহার এক সাবেক পিসী ছিলেন এবং বাজারে ছিল এক কাঠের গোলা; পিসী বাড়িতে ভাত রাঁধিতেন এবং গোলা হইতে সেই ভাতের সংস্থান হইত। কাঠ কিনিতে আসিয়া যে সব খদ্দের দরদস্তুর করিত তাহাদের প্রায়ই পিঠে চেলা কাঠ খাইয়া ফিরিতে হইত।

ভূতোর সম্পর্কে 'চন্দ্রবিন্দু' নামক একটি শব্দ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। একবার ফুটবল খেলিতে গিয়া ভূতো প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের পেটে হাঁটুর গুঁতা মারিয়া তাহাকে চন্দ্রবিন্দু করিয়া দিয়াছিল। নেহাৎ খেলা বলিয়াই ভূতোর হাতে দড়ি পড়ে নাই, কিন্তু তদবধি 'ভূতোর চন্দ্রবিন্দু' কথাটা শহরে প্রবচন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজের নামের সম্মুখে চন্দ্রবিন্দু বসিবার ভয়ে ভূতোকে সহজে কেহ ঘাঁটাইত না।

যাহোক, এই সব নানা কারণে ভূতো পাড়ার ছোকরা-দলের চাঁই হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ পাড়ার ছেলেরা থিয়েটার করিলে খরচের অধিকাংশ সে বহন করিত এবং কাহারও সহিত ঝগড়া হাতাহাতি করিবার প্রয়োজন হইলে সকলে মিলিয়া তাহাকে সম্মুখে আগাইয়া দিত। ভূতোর অবশ্য কিছুতেই আপত্তি ছিল না; বস্তুত মারামারির গন্ধ পাইলে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখাই দায় হইত।

ভূতোর বৌয়ের নাম বিবাহের আগে পর্যন্ত ছিল ক্ষান্ত, এখন হইয়াছে পুষ্পরাণী। তাহাকে তন্বী শ্যামা শিখর-দশনা বলা চলে না, কিন্তু স্বাস্থ্য ও যৌবনের গুণে দেখিতে ভালই বলা যায়। মুখখানি গোল, বড় বড় চোখ, গাল

দু'টি উঁচু উঁচু ; শরীরও গোলগাল বেঁটে খাটো, দেখিলে বেশ মজবুত বলিয়া বোঝা যায়। বৌকে ভূতোর বেশ পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে হঠাৎ দু'জনের মধ্যে কারখৎ হইয়া গেল। কারণ অতি সামান্য। রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া ভূতো হৃদয়ের উদারতা বশত প্রস্তাব করিয়াছিল বধূ খাটের ডান পাশে শয়ন করুক, কারণ ডান পাশের জানালা দিয়া বাতাস আসে। ক্ষান্ত কিন্তু ডান দিকে শুইতে দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করিয়াছিল। দু'জনেই গোঁয়ার ; ভূতো যতই জোর দিয়া হুকুম করিয়াছিল, ক্ষান্ত ততই মাথা নাড়িয়াছিল ; ফল কথা, ভূতোর উদারতা সে-দিন সার্থক হয় নাই, ক্ষান্ত শেষ পর্যন্ত বাঁ পাশেই শুইয়াছিল। বিপরীত দিকে মাথা করিয়া শুইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারিত, কিন্তু গোঁয়ার বলিয়া কেহই কথাটা ভাবিয়া দেখে নাই।

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভূতোর ইচ্ছা হইয়াছিল, গলা টিপিয়া বৌকে চন্দ্রবিন্দু করিয়া দেয় ; কিন্তু স্ত্রীজাতির গায়ে হাত তোলা অভ্যাস ছিল না বলিয়া তাহা পারে নাই, কেবল মনে মনে তর্জন গর্জন করিয়াছিল। সকালে উঠিয়াই সে পাশের ঘরে নিজের পৃথক্ শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং বৌয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পিসী সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় থাকিতেন না ; বিশেষত চন্দ্রবিন্দু হইবার ভয় তাঁহারও ছিল, তাই তিনি দেখিয়া-শুনিয়াও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। তাহার পর ছয়-সাত মাস কাটিয়াছে কিন্তু ভূতোর পারিবারিক পরিস্থিতি পূর্ববৎ আছে।

ক্ষান্তর মুখ দেখিয়া তাহার মনের কথা ধরা যায় না। সে কান্নাকাটি করে নাই, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই ; বরঞ্চ ভূতোর সংসারটি পিসীর হাত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। ভূতোর জীবনযাত্রা সেজন্য কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই। সে সকালবেলা চা খাইয়া গোলায় চলিয়া যাইত, দুপুর বেলা আসিয়া স্নানাহার করিয়া খানিক নিদ্রা দিত, তারপর আবার গোলায় যাইত। রাত্রে ফিরিয়া আহার করিয়া পুনরায় নিদ্রা দিত। ক্ষান্ত নামক একটি মানুষ যে বাড়িতে আছে তাহা সে লক্ষ্যই করিত না। ক্ষান্তও বিশেষ করিয়া নিজেকে ভূতোর লক্ষ্যবস্তু করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত না।

ভূতোর বিবাহ-ব্যাপারটা যে ভাল উৎরায় নাই, এ কথা তাহার দলের সকলেই অনুমান করিয়াছিল এবং মনে মনে খুশি হইয়াছিল। সকলের মনেই ভয় ছিল, বিবাহের পর বৌয়ের খপ্পরে পড়িয়া ভূতো দলাদলি ছাড়িয়া দিবে—এমন তো কতই দেখা যায়। পুরুষের বহির্মুখী মন দাম্পত্য জীবনের স্বাদ

পাইয়া অন্তর্মুখী হয়। কিন্তু দেখা গেল ভূতো নির্বিকার; বরং তাহার দাঙ্গা করিবার স্পৃহা আরও বাড়িয়া গেল। এক দিন সে এক খাদস্ত কাষ্ঠ-ক্রেতার মুখে ঘুষি মারিয়া তাহার দাঁত ভাঙিয়া দিল; কিন্তু ক্রেতার দাঁতেও বিষ ছিল, ভূতোর হাত কাটিয়া গিয়া বিপর্যয় ফুলিয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ, ফোমেণ্ট, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিলেন; কয়েক দিন ভূতোকে বাড়িতেই আবদ্ধ থাকিতে হইল। ক্ষান্ত তাহার যথারীতি পরিচর্যা করিল কিন্তু দু'জনের মধ্যে একটি কথারও বিনিময় হইল না।

এই ভাবে চলিতে লাগিল। ভূতো সারিয়া উঠিয়া আবার গুণ্ডামি আরম্ভ করিল। সে কদাচিৎ বাড়িতে থাকিলে দলের ছেলেরা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত। এক দিন দুপুর বেলা ভূতো ঘুমাইতেছিল, ছেলেরা একেবারে তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত।

—'ভূতোদা, দিন দিন অরাজক হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটা কিছু না করলে আর তো পাড়ার মান থাকে না।'

জানা গেল, মাণিক নামক দলের একটি ছেলে এক বিলাতী কুকুর ছানা পুষিয়াছিল। কুকুরছানাটিকে সে সযত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কারণ বাঁধিয়া না রাখিলে কুকুরের রোখ কমিয়া যায়। কিন্তু আজ সকালে কুকুর-শাবক দড়ি কাটিয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং মুক্তির আনন্দে একেবারে বস্তিপাড়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর বস্তিপাড়ার নৃশংস ছোঁড়ারা তাহাকে ধরিয়া ল্যাজ ও কান কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

মাণিক প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিল,—'এ কুকুরের কান কাটা নয় ভূতোদা, আমাদের পাড়ার কান কেটে নিয়েছে ওরা। এর জবাব তুমি যদি না দাও—'

কার্তিক বলিল,—'বস্তিপাড়ার ছোঁড়াগুলোর বড় বাড় বেড়েছে, ধরাকে সরা দেখছে। সে-দিন থিয়েটার করেছিল, লোকে একটু ভাল বলেছে কি না, অমনি আর মাটিতে পা পড়ছে না; যেন ভাল থিয়েটার আর কেউ করতে পারে না! তুমি যতক্ষণ ওদের একটাকে ধরে চন্দ্রবিন্দু না ক'রে দিচ্ছ ততক্ষণ ওরা ঢিট হবে না ভূতোদা।'

ভূতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'হুঁ।' এবং লংক্লথের পাঞ্জাবীটা গলাইয়া লইয়া দলবল সহ বাহির হইয়া গেল। ক্ষান্ত পাশের ঘর হইতে সমস্তই দেখিল, শুনিল, কিন্তু মুখ টিপিয়া রহিল। কেবল তাহার বড় বড় চক্ষু দুটি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার মনে জ্বলিতে থাকিল।

এবার ব্যাপার কিছু বেশি দূর গড়াইল। ভূতোর গোলাতেই সাধারণত দলের আড্ডা বসে, কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন সকালে ভূতোর বাড়িতে দল জমিয়াছিল; মহা উৎসাহে সকলে বিগত দিনের ঘটনা আলোচনা করিতেছিল ও চা খাইতেছিল; এমন সময় থানার সব্-ইন্সপেক্টর পরেশবাবু দেখা দিলেন। ছেলের দল তাঁহাকে দেখিয়া নিমেষ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরেশবাবু খুব খানিকটা উচ্চহাস্য করিলেন, তার পর উপবেশন করিয়া কহিলেন, 'বিভূতিবাবু, আপনার নামে অনেক কথা আমাদের কানে এসেছে কিন্তু উড়ো খবর বলে আমরা কান দিইনি। এবার কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ও-পাড়ার রতন থানায় নালা লেখাতে এসেছিল। আপনি কাল তাকে চড় মেরেছিলেন, ফলে সে আর কানে শুনতে পাচ্ছে না।'

ভূতো বলিল,—'বেশ তো, করুক না মামলা। চড় মারার জন্যে পাঁচ টাকা জরিমানা বৈ তো নয়।'

পরেশবাবু বলিলেন,—'রতন যদি সত্যিই কালা হয়ে যায় তাহলে দু'-বছর ম্যাদ পর্যন্ত অসম্ভব নয়।' তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—'যাহোক, আপনি দুষ্ট-বজ্জাত লোক নয়, তাই আপনাকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা আমি চেপে দেবার চেষ্টা করব, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলবেন। নাচাবার লোক দুনিয়ায় অনেক আছে; কিন্তু যে নাচে পায়ে খিল ধরে তারই।'

পরেশবাবুর উপদেশের ফলেই হোক অথবা উপলক্ষের অভাবেই হোক, অতঃপর কিছু দিন ভূতো শান্তশিষ্ট হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সরস্বতী-পূজা আগাইয়া আসিতেছিল; ভূতোর দল সরস্বতী পূজার সময় থিয়েটার করে, উদ্যোগ-আয়োজন পুরা দমে আরম্ভ হইয়াছিল। রাত্রে ভূতোর গোলায় একটা চালার নিচে মহলার আসর বসে। ভূতোর অবশ্য অভিনয় করিবার সখ নাই, কিন্তু সে অভিনেতাদের চা তামাকের ব্যবস্থা করিতে সারাক্ষণ সেইখানেই থাকে এবং প্রয়োজন হইলে গানের মহলার সঙ্গে একটু আধটু মন্দিরা বাজায়। আর্টের সঙ্গে ভূতোর সম্পর্ক ইহার বেশি নয়।

নির্দিষ্ট দিনে মহা ধুমধামের সহিত থিয়েটার হইল। অভিনয় কিন্তু শত্রুপক্ষ ছাড়া আর কাহাকেও বিশেষ আনন্দ দান করিতে পারিল না। দৈব দুর্বিপাকের উপর কাহারও হাত নাই; অভিনয়ের মাঝখানে সীনের দড়ি যদি হঠাৎ ছিঁড়িয়া যায়, হারমোনিয়মের মধ্যে ইঁদুর ঢোকে এবং কাটা সৈনিক স্টেজের মেঝের

উপর পিপীলিকার যৌথ আক্রমণে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া 'বাপ রে' বলিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে অভিনয় জমিবে কি করিয়া? শত্রুপক্ষ সদলবলে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রাণ ভরিয়া হাততালি দিল। ভূতোর দলের মনে আর সুখ রহিল না।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মফঃস্বলের শহরে এক রাত্রি থিয়েটার হইলে সাত দিন ধরিয়া তাহার প্রেতকৃত্য চলে। পরদিন দুপুর বেলা বস্তিপাড়ার কয়েকটা ব্যাদড়া ছেলে ভূতোর গোলার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া নানা প্রকার টিটকারি কাটিতে লাগিল। ভূতো গোলায় ছিল না, অভ্যাসমত বাড়ি গিয়াছিল, কিন্তু গতরাত্রের অভিনেতাদের মধ্যে কয়েক জন মচ্ছিভঙ্গ ভাবে সেখানে বসিয়া ছিল। বাছা বাছা বচনগুলি তাহাদের কানে যাইতে লাগিল। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত তাহাদের সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

কিন্তু ভূতো নাই, এই দুর্মুখ শিশুপালগুলাকে শায়েস্তা করিবে কে? কিছুক্ষণ অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া কাতিক তাহার অনুজ গণেশকে বলিল,—'গণশা, চুপি চুপি গিয়ে ভূতোদা'কে খবর দে তো। আজ সব মিঞাকে চন্দ্রবিন্দু করিয়ে তবে ছাড়ব—'

গণেশের বয়স কম, গায়ে জোরও আছে, সে বলিল,—'কিন্তু আমরাও তো পাঁচ জন আছি—ওদের ধরে আচ্ছা করে ঠুকে দিলেই তো হয়—'

কার্তিক চোখ পাকাইয়া বলিল,—'পাকামি করিস্‌নি গণশা। যার কর্ম তাকে সাজে। ঠুকে দেবার হলে আমরা এতক্ষণ দিতুম না! যা শীগগির ভূতোদা'কে খবর দে—আমরা ততক্ষণ ঘাপটি মেরে আছি। খবর দিয়েই তুই ফিরে আস্‌বি কিন্তু।'

ধমক খাইয়া গণেশ নিঃশব্দে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল; ওদিকে শিশুপালদের বাক্যবাণ তখন স্তরে স্তরে আরও শাণিত ও মর্মভেদী হইয়া উঠিয়াছে।

ভূতোর মনও আজ ভাল ছিল না। আহারাদির পর সে বিছানায় শুইয়া ছিল কিন্তু ঘুমায় নাই। এমন সময় গণেশ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া—'ভূতোদা, তুমি শীগগির এস, বস্তিপাড়ার চ্যাংড়ারা এসে গোলার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের গালাগাল দিচ্ছে—' বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল; তখন ভূতোর বুকের ধিকি-ধিকি আগুন একেবারে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এম্‌নি একটি

সুযোগেরই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে আজ দেখিয়া লইবে—বস্তিপাড়ায় চন্দ্রবিন্দুর পল্টন তৈয়ার করিবে!

তড়াক করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সে একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া লইল, তার পর দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষান্ত কখন অলক্ষিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দৃশ্যটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, ভূতো রাগ ভুলিয়া কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল; তার পর গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দ্বারের কাছে আসিল। স্বামী-স্ত্রীতে ফুলশয্যার পর প্রথম কথা হইল। ভূতো বলিল, 'পথ ছাড়।'

ক্ষান্তর মুখ কঠিন, ডাগর চোখ আরও বড় হইয়াছে; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'না, তুমি যেতে পাবে না।'

নারীজাতির এই অসহ্য স্পর্ধায় ভূতো স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে চাপা গর্জনে বলিল,—'সর বলছি!'

ক্ষান্ত চোয়াল শক্ত করিয়া বলিল,—'না, সরব না।'

ভূতোর আর সহ্য হইল না, সে রূঢ় ভাবে ক্ষান্তকে হাত দিয়া সরাইয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল। ক্ষান্তও ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে পরিবর্তে ভূতোকে সবলে এক ঠেলা দিল।

এই ঠেলার জন্য ভূতো যদি প্রস্তুত থাকিত তাহা হইলে সম্ভবত কিছুই হইত না কিন্তু সে ক্ষান্তর শরীরে এতখানি শক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না; অতর্কিত ঠেলায় বেসামাল ভাবে দু'পা পিছাইয়া গিয়া সে বেবাক ধরাশায়ী হইল। ক্ষান্ত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, তাহার আজ গোঁ চাপিয়াছে ভূতোকে কিছুতেই বাহিরে যাইতে দিবে না। তাই, ভূতো আবার ধড়মড় করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর মত তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

... ...

ওদিকে বস্তিপাড়ার দল দীর্ঘকাল একতরফা তাল ঠুকিয়া শেষে ক্লান্ত ভাবে চলিয়া গেল। গোলার মধ্যে কার্তিকের দল মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। গণেশ অনেকক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু ভূতোর দেখা নাই। শেষে আর বসিয়া থাকা নিরর্থক বুঝিয়া কার্তিক গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তিক্ত

স্বরে কহিল,—'দুত্তোর। ভূতোদা'রই যখন চাড় নেই তখন আমাদের কিসের গরজ। চল্ বাড়ি যাই।'

কার্তিক ভাইকে লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু বাকি তিন জন গেল না, তিন হাঁটু এক করিয়া বসিয়া রহিল। দীর্ঘকাল চিন্তার পর মাণিক বলিল,—'খবর পেয়েও ভূতোদা এলো না—এর মধ্যে কিছু ইয়ে আছে। জানা দরকার।—যাবি ভূতোদা'র বাড়ি?'

তিন জনে ভূতোর বাড়ি গেল। বাড়ি নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও নাই। ভূতোর ঘরের দরজা ভিতর হইতে চাপা রহিয়াছে। মাণিক ইতস্তত করিয়া দরজায় একটু চাপ দিল। দরজা একটু ফাঁক হইল।

সেই ফাঁক দিয়া তিন জনে দেখিল, ভূতো মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে এবং মাঝে মাঝে ঘাড় তুলিয়া বক্ষ-লীনা কান্তর মুখে চুম্বন করিতেছে।

লজ্জায় ধিক্কারে তিন জনে দরজা হইতে সরিয়া আসিল। তাহাদের বীর অধিনায়কের যে এমন শোচনীয় অধঃপাত হইবে তাহা তাহারা কল্পনা করিতেও পারে নাই। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে তাহারা ভাবিতে লাগিল,—ভূতো এত দিনে নিজেই চন্দ্রবিন্দু হইয়া গিয়াছে।

মুখোস

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই যে মুখে মুখোস পরিয়া ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই গূঢ় তত্ত্বটির প্রতি সাধারণের সতর্ক মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আমি আপাতত মাত্র চারিটি চরিত্র নমুনাস্বরূপ সর্বসমক্ষে হাজির করিতেছি, আশা করিতেছি এই চারিটি ভাত টিপিলেই হাঁড়ির খবর আর কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

অর্ধশতাব্দীকাল পৃথিবীতে বাস করা সত্ত্বেও নরেশবাবু শরীরটিকে দিব্য তাজা রাখিয়াছিলেন, চুলও যাহা পাকিয়াছিল তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তাঁহার সৌম্য সুদর্শন চেহারাখানি দেখিলে তাঁহাকে একটি পরম শুদ্ধাচারী ঋষি বলিয়া মনে হইত। অবশ্য গোঁফদাড়ির হাঙ্গামা ছিল না, তিনি প্রত্যহ সযত্নে ক্ষৌরকার্য করিতেন; সুচিক্কণ মুণ্ডিত মুখমণ্ডলে একটি স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক হাসি সর্বদাই ক্রীড়া করিত। চোখের চাহনীতে এমন একটি স্বপ্নাতুর সুদূর-

দুর্লভ আবেশ লাগিয়া থাকিত যে, মনে হইত তাঁহার প্রাণপুরুষ পৃথিবীর ধূলামাটি হইতে বহু ঊর্ধ্বে ত্রিগুণাতীত তুরীয়ানন্দে বিভোর হইয়া আছে। মোট কথা তাঁহাকে দেখিলে মানুষের মনে স্বতই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভ্রমের উদয় হইত।

নরেশবাবু বিবাহ করেন নাই। সারা জীবন বিদেশে থাকিয়া তিনি ব্যবসাদি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়াছেন; এখন বোধ করি 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ' এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য গুটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। নিরুদ্বেগ শান্তিতে জীবনের বাকি দিনগুলি উপভোগ করিবেন ইহাই ইচ্ছা।

বিদেশ হইতে নরেশবাবু একটি অনুচর সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহার নাম বাঘবং সিং—সংক্ষেপে বাঘা সিং। নামটি যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয় তাহা তাহার চেহারা দেখিলেই বুঝা যায়। বসন্তের গুটিচিহ্ন আঁকা হাঁড়ির মত একটা মুখ, তাহার মধ্যে ছোট ছোট ধৃষ্টতাভরা চক্ষু দুটি সর্বদা ঘুরিতেছে, যেন একটা ছুতা পাইলেই টুঁটি কামড়াইয়া ধরিবে। দেহখানা আড়ে-দীঘে প্রায় সমান। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো রঙের পাঞ্জাবী পরিয়া ও মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী চড়াইয়া সে যখন বুক চিতাইয়া পথ দিয়া হাঁটে, তখন সম্মুখের ভদ্র পথিক অপমানের ভয়ে সশঙ্কে পথ ছাড়িয়া দেয়। বাঘা সিং নরেশবাবুর পুরাতন ভৃত্য। সে কোনও কাজ করে না, কেবল বাড়ির সদর দরজার পাশে টুল পাতিয়া বসিয়া থাকে; তাহার অনুমতি না লইয়া তাহাকে ডিঙাইয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে এমন সাহস কাহারও নাই। সারাদিন টুলের উপর বসিয়া বাঘা সিং পান চিবায়, পানের গাঢ় রস তাহার কস্ বাহিয়া গড়াইতে থাকে; যেন সে কাঁচা মাংস চিবাইতেছে।

নরেশবাবুর বাড়িটি ছোট, ছিমছাম, দ্বিতল; পাশেই আর একটি ছোট বাড়ি আছে, সেটি একতলা। পুরানো বাড়ি, উপরে কোমর পর্যন্ত পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। এই বাড়িতে যিনি বাস করেন তাঁহার নাম দীননাথ। নিরীহ ভালমানুষ লোক, সামান্য কেরানিগিরি করেন। শীর্ণ কোলকুঁজো ধরনের চেহারা, মোটা চশমার ভিতর দিয়া যেভাবে পৃথিবীর দিকে তাকান তাহাতে মনে হয় তিনি পৃথিবীকে ভয় করিয়া চলেন। পৃথিবী তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহার করে নাই, অবজ্ঞাভরে তাঁহাকে চিরদিন পিছনেই ফেলিয়া রাখিয়াছে; তাই তিনিও শামুকের মত সসঙ্কোচে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছেন।

তাঁহার পরিবারে যে একটি মেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই এজন্যও তিনি মনে মনে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ সামান্য মাহিনা সত্ত্বেও তাঁহার ঘরে অনটন নাই। মেয়ের অবশ্য বিবাহ দিতে হইবে কিন্তু সেজন্য দীননাথ চিন্তিত নন; প্রভিডেন্ট ফণ্ডে যে টাকা জমিয়াছে তাহাতে মেয়ের বিবাহ দেওয়া চলিবে।

মেয়েটির নাম অমলা। বয়স সতেরো বছর; একবার তাহার উপর চোখ পড়িলে আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। নূতন যৌবনের দুর্নিবার বহির্মুখিতা পাকা ডালিমের মত তাহার সারা দেহে যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, চোখে মুখে চঞ্চল প্রগল্‌ভতা। অমলা নিজের রূপ-যৌবন সম্বন্ধে সম্ভবত অচেতন নয়; সে চোখ বাঁকাইয়া তাকায়, মুখ টিপিয়া হাসে, খোলা ছাদে দুপুর বেলা চুল এলো করিয়া চুল শুকায়। রাস্তায় একটু উঁচু শব্দ হইলে সে ছুটিয়া গিয়া ছাদের আলিসার উপর বুক পর্যন্ত ঝুঁকাইয়া নিচে রাস্তার পানে তাকাইয়া দেখে; তাহার গায়ের কাপড় সব সময় ঠিক থাকে না, অতি তুচ্ছ কারণে অসম্বৃত হইয়া পড়ে।

নরেশবাবু নিজের দ্বিতলের জানালা হইতে অমলাকে দেখিয়াছিলেন এবং মনে মনে একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন। মন্তব্যটি ঋষিজনোচিত কি না বলিতে পারি না, কারণ সেকালের মুনিঋষিরা নারীজাতি সম্বন্ধে মনে মনে কিরূপ মন্তব্য করিতেন তাহার কোনও নজির নাই। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ভাষায় উহা একেবারেই অচল। 'ছলনা' শব্দটা অসভ্য ইতরজনের মুখে মুখে অপভ্রষ্ট হইয়া বড়ই বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছে।

অমলাও নরেশবাবুকে দেখিয়াছিল। অমলা ছাদে উঠিলেই নরেশবাবু নিজের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেন; আকাশের পানে এমন মুগ্ধ ভাবে তাকাইয়া থাকিতেন যেন ঐ দুরবগাহ নীলিমার মধ্যে তাঁহার সাধনার পরম বস্তুকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মাঝে মাঝে চক্ষু নিচের দিকে নামিত, মুখের হাসিটি আরও মুগ্ধ-মধুর হইয়া উঠিত। অমলার মনে বোধ করি শ্রদ্ধার উদয় হইত; সে সঙ্কুচিতভাবে গায়ের কাপড় সামলাইয়া, চলনভঙ্গীকে অতিশয় মন্থর করিয়া, পিছনে দু'একটি চকিত দৃষ্টি হানিতে হানিতে নিচে নামিয়া যাইত।

দীননাথ এসবের কিছুই খবর রাখিতেন না। অফিস হইতে ফিরিতে তাঁহার সন্ধ্যা হইয়া যাইত; তাড়াতাড়ি একপেয়ালা চা ও কিছু জলখাবার

গলাধঃকরণ করিয়া তিনি বাহিরের ঘরের জানালার পাশে তক্তপোশে গিয়া বসিতেন, তাক হইতে একটি পেঙ্গুইনমার্কা ইংরেজী ডিটেকটিভ উপন্যাস পাড়িয়া লইয়া তক্তপোশের উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। অমলা আসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলে তিনি নির্বিচারে হুঁ দিয়া যাইতেন, কারণ কথাগুলি তাঁহার এক কান দিয়া প্রবেশ করিয়া সোজা অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যাইত, ক্ষণেকের জন্যও মস্তিষ্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইত না।

একদিন অমলা বলিল,—'বাবা, পাশের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে, তুমি দেখেছ?'

দীননাথ বলিলেন,—'হুঁ।'

অমলা বলিল,—'আমিও দেখেছি—বোধহয় খুব সাধু লোক। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন—'

'হুঁ।'

'ঝি বলছিল ওঁর বাড়ির দরজায় একটা দুষ্‌মনের মত লোক বসে থাকে, দেখলেই ভয় করে।'

'হুঁ হুঁ' বলিয়া দীননাথ বইয়ের পাতা উল্টাইলেন।

এমনি ভাবে কয়েক হপ্তা কাটিবার পর একদিন সকাল বেলা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে গিয়া অমলা দেখিল, একটি কাগজের মোড়ক ছাদে পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলিয়া দেখিল, ভিতরে একটি রাঙা টকটকে গোলাপফুল। অমলা চোখ বাঁকাইয়া জানালার দিকে তাকাইল; নরেশবাবু স্নিগ্ধ হাসি-হাসি মুখে আকাশের পানে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার গায়ে চাঁপা রঙের একটি সিল্কের কিমোনো সদ্যঃস্নাত তরুণ তাপসের অঙ্গে গৈরিক বসনের মত শোভা পাইতেছে।

ফুলটিকে অমলা পূজার নির্মাল্য বলিয়া মনে করিল কিনা কে জানে; সে নরেশবাবুর দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল, তারপর ফুলের দীর্ঘ আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সেটি খোঁপায় গুঁজিল। নরেশবাবু একবার চক্ষু নামাইলেন এবং মনে মনে একটি মন্তব্য করিলেন। লোহা গরম হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার মুখের হাসি আরও স্বর্গীয় সুষমাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

... ...

অফিসে বড়সাহেবের শাশুড়ী মারা গিয়াছিল, এই আনন্দময় উপলক্ষে অর্ধদিনের ছুটি পাইয়া দীননাথ দ্বিপ্রহরেই বাড়ি ফিরিলেন। পথে আসিতে

একটি ডাব কিনিয়া লইলেন। অমলা ডাব খাইতে চাহিয়াছিল, অমলা চিনি দিয়া ডাবের কচি শাঁস খাইতে ভালবাসে; ডাবের জলটা দীননাথ পান করেন।

বাড়ি আসিয়া দীননাথ ধড়াচূড়া ছাড়িলেন, তারপর দা লইয়া ডাব কাটিতে বসিলেন। অমলা গেলাস চামচে প্রভৃতি লইয়া কাছে বসিল। দু'জনের মুখেই হাসি। অমলা বলিল,—'খুব কচি ডাব, না বাবা?'

দীননাথ ডাবের মাথায় এক কোপ বসাইয়া বলিলেন,—'হুঁ। তুলতুলে শাঁস বেরুবে। আমাকে একটু দিস।' অমলা বলিল, 'আচ্ছা। তুমিও আমাকে একটু জল দিও।'

এই সময় সদর দরজার কড়া নড়িল। ঝিয়ের এখনও আসিবার সময় হয় নাই, তবু ঝি আসিয়াছে মনে করিয়া অমলা দ্বার খুলিতে গেল।

মিনিট খানেক পরে অমলা ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল; তাহার হাতে একটা দশ টাকার নোট ও গোলাপী রঙের একখানা চিঠি। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বাপের পাশে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল,—'ও বাবা, এ সব কী ত্যাখো!'

দীননাথ চিঠি পড়িলেন এবং নোট দেখিলেন; তারপর দা তুলিয়া লইয়া তীরবেগে বাহির হইলেন। বলা বাহুল্য, চিঠিখানি নরেশবাবুর লেখা এবং নোটখানিও তাঁহারই—বাঘা সিং লইয়া আসিয়াছিল।

নরেশবাবু দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া দীননাথের সদর দরজা লক্ষ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার বাঘা সিং উঠিপড়ি করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, পিছনে দা হস্তে দীননাথবাবু! বাঘা সিং বেশি দূর পলাইতে পারিল না, চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল; দীননাথ ডালকুত্তার মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন।

হৈ হৈ কাণ্ড; লোক জমিয়া গেল। দীননাথ বাঘা সিংয়ের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া এলোপাথাড়ি দা চালাইতেছেন। দুঃখের বিষয় তিনি ক্রোধান্ধ অবস্থায় দা'টি উল্টা করিয়া ধরিয়াছিলেন, ধারের দিকটা বাঘা সিংয়ের গায়ে পড়িতেছিল না। সে কিন্তু পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া চলিয়াছিল—'বাপ রে! জান্ গিয়া! পুলিশ! মার ডালা!—'

নরেশবাবু পাংশু মুখে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। কী দুর্দৈব! মেয়েটা তো রাজিই ছিল; কে জানিত মড়া-খেকো বাপ্‌টা ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরিয়াছে এবং তার এত বিক্রম।

ওদিকে অমলা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল, বালিশে মাথা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। এত নোংরা মানুষের মন! তাহার সতেরো বছরের নিষ্পাপ জীবনে এমন জঘন্য ব্যাপার কখনও ঘটে নাই। আজ এ কি হইল! মানুষের সঙ্গে চোখোচোখি হইলে সে না হাসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা কি মন্দ? তবে কেন লোকে তাহার সম্বন্ধে যা-তা ভাবিবে!

সেকালিনী

হলুদপুরের কবিরাজ শ্রীহরিহর শর্মার কন্যা শৈল আমাদের কাহিনীর নায়িকা। কিন্তু আজকাল গল্পের নায়িকাদের যে-সব অসমসাহসিক প্রগতিপূর্ণ কার্য করিতে দেখা যায় তাহার কিছুই সে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। শৈল নিতান্ত সেকালিনী।

হলুদপুর স্থানটির এক পা শহরে এক পা গ্রামে। তবে সামনের পা শহরের দিকে। গত কয়েক বছরে সে বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া নাগরিক সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, হলুদপুরে দুটি স্কুল পর্যন্ত হইয়াছে—একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের। তা'ছাড়া লাইব্রেরী আছে, নাট্য-সমিতি আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীহরিহর শর্মাও আছেন।

দু'বছর আগে পর্যন্ত হরিহর কবিরাজ হলুদপুরের একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন, সারা হলুদপুরের নাড়ী তাঁহার মুঠোর মধ্যে ছিল। মরিতে হইলে হলুদপুরের রোগী হরিহর কবিরাজের হাতে মরিত, বাঁচিতে হইলে তাঁহার হাতেই বাঁচিত। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, মেডিক্যাল কলেজের নূতন পাসকরা এক ডাক্তার তাঁহার পাশের বাড়িতে আসিয়া প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করিয়াছে।

হরিহর কবিরাজ একনিষ্ঠ সেকেলে মানুষ। সেকালের সহিত একালের ভেজাল দিয়া একটা বর্ণসঙ্কর জীবন-প্রণালী গঠন করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না; হলুদপুরের দ্রুত অগ্রগতি তিনি প্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রথমটা বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া শেষে নিজের গৃহেই সেকালত্বের একটি ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কন্যা শৈল স্কুলে পড়িতে যাইতে পায় নাই; দশ বছর বয়স

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘরের বাহির হওয়া বন্ধ হইয়াছিল। গৃহিণী হৈমবতী শেমিজ ব্লাউজ পরিতেন না। সংসারে সাবানের পাট ছিল না; প্রয়োজন হইলে মেয়েরা ক্ষার খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিবে। বেশি কথা কি, বাড়িতে পাথুরে কয়লা ঢুকিতে পাইত না, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কাঠ-কয়লা ও ঘুঁটের দ্বারা রন্ধনাদি কার্য-নির্বাহ হইত। রাত্রে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিত।

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে শৈল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে যে পরিপূর্ণরূপে সেকালিনী হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। গৃহস্থালীর সকল কর্মে সে নিপুণা হইয়াছিল, এমন কি কবিরাজ মহাশয়ের পাচনাদি রন্ধনেও তাহার যথেষ্ট পটুত্ব জন্মিয়াছিল; কিন্তু লেখাপড়ার দিক দিয়া ক অক্ষরটি পর্যন্ত কেহ তাহাকে শেখায় নাই। মাতা হৈমবতী শক্ত মেয়েমানুষ ছিলেন; স্বামীর কঠিন সেকালত্ব সম্বন্ধে মনে মনে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় ছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত স্বামীর ইচ্ছা পালন করিয়া চলিতেন। শৈল যখন বড় হইয়া উঠিল তখন তিনি সর্বদা তাহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন এবং রাত্রে তাহাকে লইয়া এক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শৈল শেমিজ বা ব্লাউজ পরিবার অনুমতি পাইল না। কেবল রাঙা-পাড় শাড়ি পরিয়াই সে যৌবনে উপনীত হইল।

শৈল মেয়েটি দেখিতে ছোটখাট এবং অত্যন্ত নরম; বস্তুত তাহাকে দেখিলে ঐ নরম শব্দটাই সর্বাগ্রে মনে আসে—সে সুন্দরী কি চলনসই তাহা লক্ষ্যের মধ্যেই আসে না। চোখের দৃষ্টি, মাথার চুল, লালপেড়ে শাড়িতে সযত্নে আবৃত দেহটি—সবই যেন নরম তুলতুল্ করিতেছে। স্বভাবটিও তাই; মুখের কথা মুখে মিলাইয়া যায়, নরম হাসিটি কিশলয়-পেলব অধরপ্রান্তে লাগিয়া থাকে। বয়স যদিও ষোল পূর্ণ হইতে চলিল তবু দেখিলে চৌদ্দ বছরেরটি বলিয়া মনে হয়।

তাহার সত্যকার চৌদ্দ বছর বয়স হইতে হরিহর তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কারণ, যতই সেকেলে হউন, আইন ভঙ্গ করায় তাঁহার আপত্তি ছিল। কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে সুপাত্র জোগাড় হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। হরিহর যে-ধরনের সুপাত্র চান, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের বাংলা দেশে সেরূপ পাত্র একান্ত বিরল। তিনি চান সংস্কৃত শিক্ষা-

প্রাপ্ত সুদর্শন অবস্থাপন্ন পাল্‌টি ঘরের ছেলে। কার্যকালে দেখা গেল, যদি বর মেলে তো ঘর মেলে না, ঘরবর মেলে তো কোষ্ঠী মেলে না। এইরূপে দেরি হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর একটি ব্যাপার ঘটিয়া হরিহরের মন হইতে কন্যাদায়ের চিন্তা কিছু দিনের জন্য লুপ্ত করিয়া দিল। কলেজে পাস করা ছোকরা ডাক্তার অজয় গাঙ্গুলী বাহির হইতে আসিয়া যখন তাঁহার পাশের বাড়িতেই ডাক্তারি আরম্ভ করিল তখন হরিহর এইরূপ ব্যবহারকে ব্যক্তিগত শত্রুতা বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু অজয় ছেলেটি অতিশয় বিনয়ী ও বাক্‌পটু। সে আসিয়া প্রথমেই তাঁহার সহিত দেখা করিল এবং এমনভাবে কথাবার্তা বলিল যেন সে হরিহরের অধীনেই আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। হরিহর মনে মনে একটু নরম হইলেও অনুরাগ-বিরাগ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ক্রমে যখন দেখা গেল, হলুদপুরের যে-সব লোক এতদিন তাঁহার উপরেই জীবনমরণের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল তাহারা অধিকাংশই এই নবীন ডাক্তারের দিকে ঝুঁকিয়াছে, তখন হরিহরের অন্তঃকরণ তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত পাচনের মতই তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু করিবার কিছু ছিল না, অগত্যা তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—'পাশের বাড়িতে বাইরের লোক এসেছে; দক্ষিণ দিকের জানালাগুলো যেন বন্ধ থাকে।'

ফলে বাড়ির দক্ষিণ দিকের তিনটি জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

দশ বছর বয়সে শৈলর জীবন যখন বাড়ির চারিটি ঘর ও পাঁচিল-ঘেরা উঠানের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতেই এই জানালাগুলিই ছিল বহির্জগতের সহিত তাহার প্রধান যোগসূত্র। জানালা দিয়া দক্ষিণের বাতাস আসে, খোলা মাঠের গন্ধ আসে, পাশের বাড়িটাও দেখা যায়; একটু তেরছাভাবে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে পথের লোক-চলাচল চোখে পড়ে। নির্জন দ্বিপ্রহরে জানালায় দাঁড়াইয়া শৈল ঘরের সহিত বাহিরের ক্ষণিক সংযোগ স্থাপন করিত। আকাশে লাল নীল রঙের ঘুড়ি উড়িতেছে, পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশে তাহাদের সুতাগুলি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে; রাস্তা দিয়া বিচালি-বোঝাই গোরুর গাড়ি নিশ্চিন্ত মন্থরতায় চলিয়া যাইতেছে; পাশের বাড়ির কার্নিসে একটা পায়রা গুমরিয়া গুমরিয়া কাহার উদ্দেশে অভিমান ব্যক্ত করিতেছে।—রাত্রে শয়নের পূর্বে সে শয়নঘরের জানালাটিতে গিয়া দাঁড়াইত। অন্ধকার ঘর, বাহির হইতে কিছু দেখা যায় না; শৈল

গায়ের কাপড় একটু আলগা করিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইত। বাহিরের অন্ধকার ঝিঁঝিপোকার ঝঙ্কারে পূর্ণ হইয়া থাকিত, গাছের পাতায় পাতায় জোনাকির পরী-আলো জ্বলিত আর নিভিত; দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিত—

কিন্তু জানালাগুলি যখন বন্ধ হইয়া গেল তখন শৈল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না, তাহার মুখের হাসিও ম্লান হইয়া গেল না। রাত্রে শয়নের পূর্বে সে কেবল একবার বন্ধ জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইত; পুরানো জানালার তক্তায় একটা চোখ উঠিয়া গিয়া একটি ফুটা হইয়াছিল, সেই ফুটায় চোখ দিয়া সে বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিত, তারপর বিছানায় গিয়া শয়ন করিত। মা কাজকর্ম শেষ করিয়া আসিয়া দেখিতেন শৈল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

সে যাহোক, হরিহর কবিরাজ প্রতিদ্বন্দ্বি-সঙ্ঘর্ষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া আবার যথারীতি কাজকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমনে তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষতি মারাত্মক নয়। বিশেষত দীর্ঘ একাধিপত্যের সময় তিনি যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আবার কন্যার জন্য পাত্রের সন্ধানে মন দিলেন। শৈলর বয়স তখন চতুর্দশী পার হইয়া পূর্ণিমায় পা দিয়াছে।

কয়েকমাস খোঁজাখুঁজির পর কাছেপিঠে হালুইপুর গ্রামে একটি পাত্র পাওয়া গেল। পাত্র ভালই অর্থাৎ হরিহর যাহা চান তাহার ষোল আনা না হোক চৌদ্দ আনা বটে। হরিহর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। মেয়ে দেখাদেখির কোনও কথা উঠিল না, কারণ দুই পক্ষই গোঁড়া—ঠিকুজি কোষ্ঠী যখন মিলিয়াছে তখন অন্য কিছু দেখিবার প্রয়োজন নাই। আশীর্বাদ-পর্বটাও বর যখন বিবাহ করিতে আসিবে তখনই সম্পন্ন হইবে।

আষাঢ়ের শেষের দিকে বিবাহের দিন। উ[illegible]জন সমস্তই প্রস্তুত, আত্মীয়-কুটুম্বেরা এখনও আসিয়া পৌঁছিতে আরম্ভ করেন নাই, এমন সময় বিবাহের ঠিক সাতদিন আগে একটি ব্যাপার ঘটিল। স্নান করিবার সময় শৈলর হাত পিছলাইয়া জলভরা ঘটি তাহার পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর পড়িল। আঙুলটা থেঁতো হইয়া নখ প্রায় উড়িয়া গেল। রক্তারক্তি কাণ্ড!

হরিহর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বিবাহের মাত্র সপ্তাহকাল বাকি, এই সময় মেয়েটা এমন কাণ্ড করিয়া বসিল! সাতদিনের মধ্যে ঘা

শুকাইবে বলিয়াও মনে হয় না। ক্ষতযুক্তা কন্যাকে তিনি পাত্রস্থ করিবেন কি করিয়া ?

হরিহর বরপক্ষকে দুর্ঘটনার কথা জানাইলেন এবং বিবাহ কিছুদিন পিছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। বরপক্ষ বিরক্ত হইলেন, হয়তো কন্যার সুলক্ষণ সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন। দুইপক্ষে একটু কথা-কাটাকাটি হইল, তারপর বরপক্ষ অপ্রসন্নভাবে জানাইলেন যে তেসরা শ্রাবণ একটি বিবাহের দিন আছে সেই দিনের মধ্যে যদি বিবাহ সম্ভব হয়, তবেই তাঁহারা বিবাহ দিবেন নচেৎ সম্বন্ধ ভাঙিয়া যাইবে ; যেখানেই হোক, শ্রাবণ মাসের মধ্যে পাত্রের বিবাহ দিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর।

হরিহর তেসরা তারিখের মধ্যে ঘা সারাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। 'বুড়ির গোপান' প্রভৃতি ডাকাতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ঘা সারিল না। পায়ের বুড়ো আঙুলের ঘা সারা সহজ কথা নয় ; বিশেষত মেয়েরা খালি পায়ে থাকে, চলিতে ফিরিতে পায়ে হোঁচট লাগে, আরোগ্যোন্মুখ ঘা আবার আউরাইয়া উঠে। তেসরা শ্রাবণ তো এমন অবস্থা হইল যে,শৈলকে শয্যা লইতে হইল। আঙুলের ঘা বারবার অতর্কিত আঘাত পাইয়া বিষাইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল।

শৈলর ঘা কিন্তু তবু সারে না, মাঝে মাঝে একটু উন্নতি হয়, আবার বাড়িয়া যায়। সারা শ্রাবণ মাসটাই এইভাবে কাটিল। হরিহর ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মেয়ে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। হৈমবতীর মায়ের-প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল, শেষে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন,—'ওগো, ঘা তো কিছুতেই সারছে না ; শেষে কি মেয়েটা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যাবে!—একবার ঐ ডাক্তার ছেলেটিকে খবর দিলে হয় না ?'

হরিহর অনেকক্ষণ মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর সংক্ষেপে বলিলেন—'বেশ, খবর পাঠাও।'

খবর পাইয়া অজয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল। হরিহর কোনও কথা না বলিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন ; শৈল দালানের মেঝেয় বসিয়া ছিল, নীরবে তাহার পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। অজয় শৈলর পায়ের বন্ধন খুলিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিল ; শৈল পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

এতটুকু আইবুড়ো মেয়েকে সম্ভ্রম দেখানো অজয়ের অভ্যাস নাই ; সে স্থানটি টিপিতে টিপিতে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি খুকি, লাগছে ?'

শৈলর মুখ একটু বিবর্ণ হইল ; একবার অধর দংশন করিয়া সে তেমনি পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

অজয় তখন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিল, তারপর তাহাতে টিঞ্চার আয়োডিন ঢালিতে ঢালিতে মুচকি হাসিয়া বলিল,—'এবার জ্বালা করছে তো ?'

শৈল এবারও মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। তাহার মুখখানি কিন্তু আরও একটু পাংশু দেখাইল।

মলম লাগাইয়া ভাল করিয়া পা ব্যাণ্ডেজ করিয়া অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল, হরিহরকে বলিল,—'তিন দিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলবেন, বোধহয় ততদিন শুকিয়ে যাবে। বেশি নড়াচড়া কিন্তু বারণ। খুকি, দৌড়োদৌড়ি কোরো না।'

এবার শৈলর মুখের বিবর্ণতা ভেদ করিয়া একটু অরুণাভা দেখা দিল। সে নীরবে একবার অজয়ের দিকে আয়ত দৃষ্টি হানিয়া আবার মাথা হেঁট করিল। অজয়ের হঠাৎ মনে হইল মেয়েটাকে সে যতটা খুকী মনে করিয়াছিল বোধহয় ততটা খুকী নয়। সে একটু অপ্রস্তুত হইল।

বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিহর ট্র্যাঙ্ক হইতে দুটি টাকা বাহির করিয়া অজয়কে দিতে গেলেন, অজয় হাত জোড় করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল,—'আমরা দুজনেই ডাক্তার। আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারি না।' দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিল—'একটা কথা এতদিন বলবার সাহস হয়নি, যদি অনুমতি দেন তো বলি।'

হরিহর ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিলেন, অজয় তখন বলিল,—'আমার মা অনেক দিন থেকে অম্বলে ভুগছেন। কিন্তু তিনি বিধবা মানুষ, ডাক্তারী ওষুধ খেতে চান না ; তা ছাড়া আমার ওষুধে কাজও কিছু হচ্ছে না। এখন আপনি যদি ব্যবস্থা করেন।'

হরিহরের মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গেল ; তিনি বুঝিলেন অজয় তাঁহাকে ঋণী করিয়া রাখিতে চায় না। বলিলেন,—'বেশ, আজ বিকেলে আমি তোমার বাড়ি যাব।'

বৈকালে অজয়ের মাকে পরীক্ষা করিয়া হরিহর ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন—

পাচন, গুলি ও অবলেহ। ঔষধ ব্যবহারের বিধি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—'এক হপ্তা এই চলুক, আশা করি দোষটা কেটে যাবে।'

তিন দিনের দিন শৈলর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখা গেল ঘা শুকাইয়া গিয়াছে। ওদিকে অজয়ের মা সপ্তাহকাল ঔষধ সেবন করিয়া দিব্য চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে দুই পরিবারের মধ্যে প্রথম স্বার্থ-সংঘাতের উষ্মা অনেকটা প্রশমিত হইল, হয়তো পরস্পরের প্রতি একটু শ্রদ্ধাও জন্মিল; কিন্তু উহা বেশিদূর অগ্রসর হইতে পাইল না। স্বার্থের ঠোকাঠুকি যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক, সেখানে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা হওয়া বড়ই কঠিন। হরিহর ও অজয়ের সম্পর্ক দেঁতো হাসি ও মিষ্ট কথার পর্যায়ে উঠিয়া আটকাইয়া রহিল।

এদিকে শ্রাবণ মাস ফুরাইয়া ভাদ্র মাস আরম্ভ হইয়াছে। শৈলর শরীরও সারিয়াছে। মাঝে আর দুটি মাস বাকি, অঘ্রান মাসে মেয়ের বিয়ে দিতেই হইবে। হরিহর আবার সবেগে তত্ত্ব-তল্লাস আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কার্তিক মাসের শেষে একটি পাত্র পাওয়া গেল, হরিহর আর বিলম্ব না করিয়া দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। পাত্রটি এবার অবশ্য তেমন মনের মত হইল না, হরিহর যাহা চান তাহার আট আনা মাত্র। কিন্তু উপায় কি। মেয়ের ষোল বছর বয়স পূর্ণ হইতে চলিল, আর বিলম্ব করা চলে না। আবার বাড়িতে বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইল।

বিবাহের সাত দিন আগে, দুপুরবেলা হরিহরের উঠানে প্রকাণ্ড উনানের উপর প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে কোনও একটি রসায়ন তৈয়ার হইতেছিল। এরূপ কবিরাজী ঔষধ নিত্যই বাড়িতে তৈয়ার হয়। শৈল একলা দাঁড়াইয়া হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল। বহু গাছগাছড়া ও গুড়ের মত একটি বস্তু একত্র সিদ্ধ হইয়া বেশ একটি স্বর্ণাভ গাঢ় পদার্থে পরিণত হইয়াছে, বড় বড় বুদ্বুদ উদ্গীর্ণ করিয়া টগ্-বগ্ করিয়া ফুটিতেছে।

উঠানে কেহ কোথাও নাই, শৈল একাকিনী দাঁড়াইয়া হাতা নাড়িতেছিল এবং মাঝে মাঝে এক হাতা তুলিয়া আবার হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতেছিল কতখানি গাঢ় হইয়াছে। শীতের রৌদ্র তেমন কড়া নয়, কিন্তু আগুনের আঁচে তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। আর, নরম ঠোঁটে একটুখানি গোপন মিষ্ট হাসি ক্রীড়া করিতেছিল।

এক হাতা ফুটন্ত পদার্থ তুলিয়া লইয়া শৈল সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাইল।

কেহ নাই ; মায়ের ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি এখন কাঁথা মুড়ি দিয়া একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। শৈল সুমিষ্ট হাসিতে হাসিতে নিজের বাঁ হাতের কব্জির উপর ফুটন্ত হাতা উপুড় করিয়া দিল।

একটা চাপা চীৎকার—! কিন্তু শৈল চীৎকার করে নাই, চীৎকার আসিল ঘরের ভিতর হইতে। হৈমবতী ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার আর্তোক্তিতে শৈলর বোধ হয় হাত কাঁপিয়া গিয়াছিল, সবটা পদার্থ তাহার কব্জিতে না পড়িয়া মাটিতে পড়িল।

আগুনখাকীর মত হৈমবতী আসিয়া মেয়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষুর সম্মুখে শৈল চক্ষু নত করিয়া রহিল। হৈমবতী যে সমস্তই দেখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; তিনি সহসা কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, বয়লারে বাষ্পাধিক্য ঘটিলে যেরূপ শব্দ করিয়া বাষ্প বাহির হয় তিনি সেইরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

তারপর তিনি সহসা শৈলর একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শৈলকে খাটে বসাইলেন, একটি তালের পাখা শক্ত করিয়া হাতে ধরিয়া বলিলেন,—'ইচ্ছে করে গায়ে ঘটি ফেলেছিলি। আবার হাত পুড়িয়েছিস। হারামজাদি, কি চাস তুই বল।'

শৈল উত্তর না দিয়া মায়ের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজিল; ক্রুদ্ধা হৈমবতী তাহার পিঠে পাখার এক ঘা বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর মাতা ও কন্যার মধ্যে কি হইল তাহা আমরা জানি না। আধঘণ্টা পরে হৈমবতী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং স্বামীর ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা হরিহর অজয়ের বাড়ি গেলেন। অজয় রোগী দেখিতে বাহির হইতেছিল, তাহাকে বলিলেন,—'তুমি একবার শৈলিকে দেখে যেও, সে আবার হাত পুড়িয়ে ফেলেছে।'

অজয় চলিয়া গেল। তখন হরিহর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মাতার সহিত কথা কহিলেন।

ইহার পর হলুদপুরের রোগীরা লক্ষ্য করিল, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসকের মধ্যে একটা আশ্চর্য রকমের রফা হইয়া গিয়াছে। অজয় রোগীকে বলে—'আপনার রোগ ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনি বরং কবিরাজ মশায়কে দেখান।' হরিহর

নিজের রোগীকে বলেন,—'তোমার দেখছি চেরা-ফাঁড়ার ব্যাপার আছে; তুমি বাপু অজয়ের কাছে যাও।'

কথাটা এখনও প্রকাশ হয় নাই; কিন্তু অজয়ের সহিত শৈলর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী মাঘ মাসে বিবাহ। আশা করা যাইতেছে, এবার আর কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটিবে না, সেকালিনী মেয়ে শৈলর বিবাহ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইবে।

এপিঠ ওপিঠ

তরুণ আই-সি-এস্ সুখেন্দু গুপ্ত প্রেমে পড়িয়াছে; তাহার ইস্পাতের ফ্রেমে-আঁটা মজবুত হৃদয় নড়্‌বড়ে হইয়া গিয়াছে।

শুধু প্রেমে পড়িলে দুঃখ ছিল না; কিন্তু এই চিত্তবিকারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। বিলাতে থাকাকালীন সে ডুবিয়া ডুবিয়া কয়েক ঢোক জল খাইয়াছিল, সেই অনুতাপের জ্বালা আজ তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।

সুখেন্দু ছেলে খারাপ নয়। তবে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, অতিবড় সাধু ব্যক্তিরও মাঝে মাঝে পা পিছলাইয়া যায়। বিশেষত বিলাতের পথঘাট একটু বেশি পিছল; তাই সুখেন্দুর পদস্খলনকে আমাদের উদার-চক্ষে দেখিতে হইবে। আমাদের একটা বদ্অভ্যাস আছে, ঐ জাতীয় ত্রুটিকে আমরা একটু বড় করিয়া দেখি এবং ক্রমাগত সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতে থাকি। যাঁহারা বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু এ বিষয়ে ঢের বেশি সংস্কার-মুক্ত।

যাহোক্, সুখেন্দুর মনস্তাপ যে আন্তরিক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে সে গোটা হৃদয় লইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল। তারপর তিন বছর কাটিয়াছে; হৃদয় কোনও গোলমাল করে নাই। বাংলাদেশের এক মহকুমায় সগৌরবে রাজত্ব করিতে করিতে অন্য এক মহকুমায় বদলি হওয়া উপলক্ষে কিছুদিনের ছুটি পাইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। এখানে আসিয়াই তাহার হৃদয় হঠাৎ জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছে।

যুবতীটির নাম এণা; বাংলা সরকারের একজন মহামান্য অফিসারের

কন্যা। বয়স কুড়ি হইতে বাইশের মধ্যে—তন্বী, রূপসী, কুহকময়ী—এণা সত্যই অনন্যা। সে গভর্নরের পার্টিতে বল্‌নাচ নাচিতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোথাও প্রগল্‌ভতার ইসাধা পর্যন্ত নাই; কথায়-বার্তায় সে পরম নিপুণা, কিন্তু তাহার প্রকৃতিটি বড় মোলায়েম; সে ইংরেজিতে রসিকতা করিতে পারে, আবার বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী গাহিয়া চিত্তহরণ করিতেও জানে। দর্পণে সে যে-দেহটি দেখিতে পায় তাহা যৌবনের অকলঙ্ক লাবণ্যে ঝলমল, কিন্তু দর্পণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না সেই অন্তরটি কত নিবিড় রহস্যের জালে ছায়াময় হইয়া আছে তাহা কে অনুমান করিবে?

প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সুখেন্দু ঘাড় মুচড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর কোনও আশা ছিল না। ওদিকে অপর পক্ষও একেবারে অনাহত অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। সুখেন্দু অতি সুপুরুষ এবং অত্যন্ত স্মার্ট্‌; কোনও দিক দিয়াই তাহার যোগ্যতায় এতটুকু খুঁত ছিল না। তাই অন্তরের গহন বনে এণাও বিলক্ষণ ঘা খাইয়াছিল।

তারপর আলাপ যত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, দু'জনের মধ্যে আকর্ষণও তেমনি দুনিবার হইয়া উঠিল। মুখের কথা যখন সাধারণ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে, চোখের ভাষা তখন আকাঙ্ক্ষায় তৃষিত হইয়া উঠে। চোখের ভাষা নীরব হইলে কি হইবে, উহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। সুখেন্দু দেখিতে পায়, এণার নরম চোখ দুটি মিনতিভরা উৎকণ্ঠায় তাহার স্বীকারোক্তির প্রতীক্ষা করিয়া আছে; এণা দেখে, সুখেন্দুর ঠোঁটের কাছে কথাগুলি কাঁপিতেছে, কিন্তু তাহারা আবেগের বাঁধনহারা প্লাবনে বাহির হইয়া আসে না। লগ্নভ্রষ্ট হইয়া যায়। সুখেন্দু বিরসমুখে অন্য কথা পাড়ে।

এইভাবে কয়েকটা অন্তর্গূঢ় অগ্নিগর্ভ দিন কাটিয়া গেল, সুখেন্দুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল।

আর সময় নাই; দুদিন পরেই তাহাকে কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অথচ যে কথাটি বলিবার জন্য তাহার অন্তরাত্মা আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহা সে কিছুতেই বলিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয় মন্থন করিয়া অনুতাপের হলাহল বাহির হইয়াছে। যতবার সে বলিবার জন্য মুখ খুলিয়াছে ততবার বিবেক আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে নিজের কক্ষে উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারি করিতে করিতে সুখেন্দু ভাবিতেছিল, "কী করি! আমি জানি ও আমাকে চায়—কিন্তু—ওকে

ঠকাবো? না না, অনাঘ্রাত ফুলের মত ওর মন, অনাবিদ্ধ রত্নের মত ওর দেহ। আর আমি! না—কিছুতেই না।"

মন স্থির করিয়া সুখেন্দু চিঠি লিখিতে বসিল। মুখে যাহা ফুটি-ফুটি করিয়াও ফোটে না, কাগজে কলমে তাহা ভালই ফোটে।

"—আমি তোমাকে ভালবাসি।

"একথা জানতে তোমার বাকি নেই। আমিও তোমার চোখের নীরব বার্তা পেয়েছি, বুঝতে পেরেছি তোমার মন। কিন্তু তবু মুখ ফুটে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারিনি। আমার অপরাধী মন কুণ্ঠায় নীরব থেকেছে।

"তোমাকে আমি ঠকাতে পারব না। যা কোনও দিন কারুর কাছে স্বীকার করিনি, আজ তোমাকে জানাচ্ছি। বিলেতে যখন ছিলুম, তখন একেবারে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করতে পারিনি। কিন্তু তখন তো তোমাকে চিনতুম না। ভাবিও নি যে তোমার দেখা পাব।

"ক্ষমা করতে পারবে না কি? শুনেছি ভালবাসা সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে। যদি ক্ষমা করতে পারো, চিঠির জবাব দিও। যদি না পারো—বিদায়। আমার হৃদয় চিরদিন তোমারই থাকবে।"

চিঠি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া সুখেন্দু হোটেলেই বসিয়া রহিল; সেদিন আর কোথাও বাহির হইতে পারিল না।

পরদিন বিকালে চিঠির উত্তর আসিল।

"—তুমি এসো—শীগগির এসো। দু'দিন তোমাকে দেখিনি।

"তুমি তোমার মনের গোপন কথা বলতে পেরেছ—তাতে আমারও মনের রুদ্ধ কবাট আজ খুলে গেছে। আজ আর আমার লজ্জা নেই; নিজের মন দিয়ে বুঝেছি, ভালবাসা সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে।

"আমিও জীবনে একবার ভুল করেছি। কিন্তু আজ তা মনে হচ্ছে কোন্ জন্মান্তরের দুঃস্বপ্ন।

"তুমি লিখেছ তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমিও পারলুম কৈ? আর ক্ষমা! তুমি এসো—তখন ক্ষমার কথা হবে।"

* * * *

উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মেল ট্রেন রাত্রির অন্ধকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।

একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় সুখেন্দু নিজের বাঙ্কে শুইয়া একদৃষ্টে আলোর পানে তাকাইয়া আছে; নির্বাপিত পাইপটা ঠোঁটের কোণ হইতে ঝুলিতেছে।

গভীর রাত্রি; কামরায় আর কেহ নাই।

সুখেন্দু পাইপটা বালিশের তলায় রাখিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিল; তারপর যেন অন্ধকারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, "বাপ্! খুব বেঁচে গেছি!"

সন্দেহজনক ব্যাপার

মন্মথ নামক যুবককে প্রেমিক বলিব কিংবা কুচক্রী হত্যাকারী বলিব, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। সে পুঁটু ওরফে তমাললতা দেবীর প্রেমে পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; উপরন্তু পুঁটুর পিতামহ রামদয়ালবাবু যে মন্মথর হাতে পড়িয়াই প্রাণ হারাইয়াছিলেন তাহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। মোটিভ্ অর্থাৎ দুরভিসন্ধি যে তাহার পুরামাত্রায় ছিল তাহাও এখন প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পুঁটুর সহিত সে বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় পাঠক যদি পুলিসে খবর দেন তাহা হইলে অন্তত আমার দিক হইতে কোনও আপত্তি হইবে না।

মন্মথ যে আদর্শ বাঙালী যুবক নয় তাহার প্রমাণ,—সে কুড়ি বছর বয়স হইতে শেয়ার মার্কেটে বেচা-কেনা করিয়া টাকা উপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এবং পঁচিশ বৎসর হইতে না হইতেই স্বাবলম্বী, ফন্দিবাজ ও মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল; আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার অসাধ্য কাজ নাই। সুতরাং মধ্যমনারায়ণ-ঘটিত ব্যাপারটা তাহার স্বেচ্ছাকৃত কি না তাহা লইয়া কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আসামী পক্ষের উকিল হয়তো প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে যে মন্মথ ভ্রমক্রমে এই কার্য করিয়াছিল, কিন্তু আসামীর উকিলের কথা কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য তাহা আমরা সকলেই জানি।

যা হোক্, এখন মামলার হাল বয়ান করা দরকার।

রামদয়ালবাবুর বয়স হইয়াছিল পঁয়ষট্টি বৎসর এবং তাঁহার টাকা ছিল পঁয়ষট্টি লাখ। কথাটা অবিশ্বাস্য—তবু সত্য। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে, পুঁটু ব্যতীত আর সকল আত্মীয়-স্বজন পুত্র-পৌত্র মরিয়া গিয়াছিল। এই সকল পুত্র-পৌত্র যে তাঁহার সহিত বেইমানি করিবার উদ্দেশ্যেই মরিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া রামদয়াল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং উহাদের মজা দেখাইবার জন্যই প্রাণপণে শেয়ার মার্কেটে টাকা উড়াইতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। টাকা কিন্তু উড়িল না; ফলে গত পনের বছরের মধ্যে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা তাঁহার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত হইয়াছিল।

কিন্তু বাঙালী হইয়া এত টাকা রোজগার করিলে ভগবান তাহা সহ্য করিতে পারেন না; রামদয়ালকে আপাদমস্তক রোগে ধরিয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহার পায়ে ধরিয়াছিল বাত, এবং মস্তকে রক্তের চাপ বাড়িয়া মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তা ছাড়া চোখেও ছানি পড়িয়াছিল, ভাল দেখিতে পাইতেন না।

রামদয়াল সাবেক লোক, কবিরাজী চিকিৎসা করাইতেছিলেন। মস্তকের রক্ত-চাপ কমাইবার জন্য সুশীতল মধ্যমনারায়ণ তৈল সর্বদা মস্তকে মাখিতেন, পদদ্বয়ের বাত-বেদনা অপনোদনের জন্য মহাতেজস্কর মহামাস তৈল বিমর্দিত করাইতেন, এবং দুই চক্ষুতে ভেষজগুণাক্রান্ত কোনও বৃক্ষের রস দিয়া চক্ষু বন্ধনপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র সাজিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে গন্ধ-গোকুলের ন্যায় সুরভি নির্গত হইতে থাকিত।

একদা প্রাতঃকালে রামদয়াল নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া গড়্গড়া টানিতে-ছিলেন, এমন সময় মন্মথ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া সে কাজের কথা পাড়িল। ধৃতরাষ্ট্ররূপী রামদয়ালকে বলিল, "শুনেছি আপনার কাছে এক হাজার 'গিরি-গোবর্ধন' শেয়ার আছে। বেচে ফেলুন, আমি এক টাকা প্রিমিয়াম্ দিয়ে কিনে নিতে রাজি আছি।"

রামদয়াল বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু?"

"আমার নাম মন্মথ মজুমদার। যদি সৎপরামর্শ চান, এই বেলা গিরি-গোবর্ধন বেচে ফেলুন; নইলে আপনারই বুকে চেপে বসবে।"

রামদয়াল হাঁকিলেন, "পরশুরাম!"

ভিতর দিকের পর্দা সরাইয়া একটি তরুণীর মুখ দেখা গেল; পুঁটু বলিল, "কি বলছ দাদু? পরশুরাম কবিরাজের বাড়ি গেছে।"

রামদয়াল বলিলেন, "বেশ, তুমি এসো। এই বেয়াদব লোকটাকে কান ধরে বার করে দাও।"

পুঁটু ঘরে প্রবেশ করিল; মন্মথ ও পুঁটুর দৃষ্টিবিনিময় হইল। মন্মথ একটু হাসিল, পুঁটু একটু লাল হইল।

মন্মথ খাটো গলায় পুঁটুকে বলিল, "এই যে কান—ধরুন।"

পুঁটু লজ্জা পাইয়া চুপি চুপি বলিল, "দাদু রেগেছেন। এখনই ব্লাড্‌প্রেসার্ বেড়ে যাবে। আপনি যান।"

রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কান ধরেছ?"

পুঁটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "ধরেছি।"

রামদয়াল বলিলেন, "বেশ, এবার বার করে দাও। ফের যদি এ বাড়িতে মাথা গলায়, জুতো-পেটা করব।"

পুঁটু ও মন্মথ পাশাপাশি বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল। মন্মথর মুখ কৌতুকে চটুল, পুঁটুর গাল দুইটি লজ্জায় অরুণাভ।

বাহিরে আসিয়া মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি?"

পুঁটু বলিল, "পুঁ—মানে তমাললতা।"

মন্মথ বলিল, "আজ বিকেলবেলা আমি আস্‌ব। 'গিরি-গোবর্ধন' বিক্রি করে ফেলা যে একান্ত দরকার, এ কথা আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

অতঃপর পাদুকা-প্রহারের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া মন্মথ প্রত্যহ সকাল-বিকাল রামদয়ালের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই ভাবে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল। রামদয়াল চক্ষে ফেট্টা বাঁধিয়া মস্তকে ঠাণ্ডা তৈল ও পদদ্বয়ে গরম তৈল মালিশ করাইতে লাগিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবনে ও পুঁটুর অন্তর্লোকে যে গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা জানিতেও পারিলেন না।

একদিন মন্মথ পুঁটুকে বলিল, "পুঁটু, গিরি-গোবর্ধন শেয়ার আমার চাই; কারণ, তোমাকে বিয়ে করা আমার একান্ত প্রয়োজন।"

পুঁটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল, দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইল, তারপর বলিল, "দাদু তোমার নাম শুনলে জ্বলে যান।"

মন্মথ বলিল, "এর একটা বিহিত করা দরকার। তোমাকে বিয়ে করা এবং গিরি-গোবর্ধন শেয়ার হস্তগত করা আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

পুঁটু বলিল, "হনুমানপুরের রাজবাড়িতে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।"
মন্মথ বলিল, "হনুমানপুরকে কলা দেখাব। এসো, দুজনে ষড়যন্ত্র করি।"
তখন উভয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

পরশুরাম নামক ভৃত্য রামদয়ালবাবুর মস্তকে ও পদদ্বয়ে তৈল মালিশ করিত। সে হঠাৎ একমাসের ছুটি লইয়া রুগ্ণা স্ত্রীকে দেখিতে দেশে চলিয়া গেল। তাহার স্থানে যে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া গেল, তাহার নাম নসীরাম। নসীরামের অপর নাম মন্মথ।

নসীরাম অত্যন্ত মনোযোগসহকারে রামদয়ালকে তৈল মর্দন করিতে লাগিল। রামদয়াল সর্বদা চোখে ফেট্টা বাঁধিয়া থাকিতেন না; মাঝে মাঝে খুলিতেন। নসীরামের চেহারা দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। ছোকরা লেখাপড়াও কিছু কিছু জানে; তাহাকে দিয়া তিনি শেয়ার মার্কেটের রিপোর্ট পড়াইয়া শুনিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নসীরাম আসিয়া অবধি গিরি-গোবর্ধন শেয়ারের দাম দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে। মন্মথ মজুমদার নামক বেয়াদব ছোকরার কান ধরিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য তিনি অনুতাপ বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি একগুঁয়ে লোক, শেয়ার বিক্রির কথা মুখে উচ্চারণ করিলেন না।

ওদিকে হনুমানপুরের রাজবাড়িতে পুঁটুর বিবাহের কথা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ চিঠিপত্রের আদানপ্রদান একেবারে থামিয়া গেল। ইহার কারণ, রামদয়াল নসীরামকে চিঠি ডাকে ফেলিবার জন্য দিতেন, নসীরাম তৎক্ষণাৎ তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিত, এবং হনুমানপুর হইতে যে সব পত্র আসিত পুঁটু তাহা নির্বিকারচিত্তে আত্মসাৎ করিত।

কিন্তু তবু হনুমানপুরকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না। পঁয়ষট্টি লাখ টাকা রাজারাজড়ার পক্ষেও সামান্য নয়, বিশেষত যদি রাজার সমস্ত রাজত্ব মহাজনের কাছে বন্ধক থাকে।

একদিন হনুমানপুরের এক দূত উপস্থিত হইল। সে জানাইল যে, রামদয়ালের পত্রাদি না পাইয়া মর্মাহত রাজা স্বয়ং কলিকাতায় আসিতেছেন; কল্যই কথাবার্তা পাকা করিয়া ফেলিতে চান। পত্রাদির ব্যাপার শুনিয়া রামদয়াল নসীরামের উপর অতিশয় সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু সেইদিনই দ্বিপ্রহরে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেল।

পুঁটু রামদয়ালের বুকের উপর কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল, "দাদু, আমি—আমি হনুমানপুরে বিয়ে করব না।"

রামদয়াল বলিলেন, "কী!"

পুঁটু ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল, "আমি নসীরামকে বিয়ে করব।"

শুনিবামাত্র রামদয়ালের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। তিনি একটি হুংকার ছাড়িয়া ডাকিলেন, "নসীরাম!"

নসীরাম নিকটেই ছিল, বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম মন্মথ।"

রামদয়াল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

নসীরাম ছুটিয়া গিয়া শিশি হইতে রামদয়ালের মাথায় তৈল ঢালিতে আরম্ভ করিল। পুঁটু কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে অন্য শিশির তৈল মালিশ করিতে লাগিল।

কবিরাজ আসিয়া দেখিলেন, অবস্থা সাংঘাতিক। ঔষধ উল্টা-পাল্টা হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ পায়ে মধ্যমনারায়ণ ও মাথায় মহামাস মালিশ চলিতেছে।

এই সাংঘাতিক চিকিৎসা-বিভ্রাটের ফলে রামদয়াল সেই রাত্রেই পরলোক যাত্রা করিলেন।

* * * *

পরদিন হনুমানপুর উপস্থিত হইলে নসীরাম সবিনয়ে তাঁহাকে বলিল, "আপনি আসবেন শুনে রামদয়ালবাবু মারা গেছেন। এখন আপনি রাজত্বে ফিরে যেতে পারেন।"

শ্রাদ্ধ শেষ হইলে মন্মথ পুঁটুকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "পুঁটু, দুঃখ ক'রো না, ভগবান যা করেন ভালর জন্যে। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো আমাদের দুজনকেই খুন করতেন; কিংবা আমাকে খুন করে তোমাকে হনুমানপুরের সঙ্গে বিয়ে দিতেন। সেটা কি ভাল হ'ত? এদিকে দেখছ তো, গিরি-গোবর্ধনের শেয়ার চড়চড় করে উঠছে। এখন অশৌচটা কেটে গেলেই…"

মন্মথকে পুলিসে দেওয়া যাইতে পারে কি না আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। আর কিছু নয়, সে গিরি-গোবর্ধনের নাম করিয়া পঁয়ষট্টি লাখ টাকা মারিয়া দিবে ইহাই অসহ্য বোধ হইতেছে।

বৃন্ত বিষ্মানি

বৌভাতের ভোজ শেষ হইয়া বাড়ির লোকের খাওয়া-দাওয়া চুকিতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গেল। আজই আবার ফুলশয্যা।

ফাল্গুন মাস ;—অর্ধ-বিস্মৃত সুদূর জনশ্রুতির মত বাতাসে এখনো শীতের আমেজ লাগিয়া আছে। তে-তলার দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটাই নিখিলের শয়নকক্ষ—সেই ঘরেই আজ ফুলশয্যা হইবে। ঘরটি আগাগোড়া ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে। বিছানায় রাশি রাশি শাদা ফুল, মশারির চারিধারে ফুলের মালা লতার মত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে। ঘরে দুটি ইলেকট্রিক বাতি আছে—একটা শাদা, অন্যটাতে লাল বাল্‌ব। দুটিতেই ফুলের দুল দুলিতেছে।

শাদা আলোটা জ্বালিয়া নিখিল দক্ষিণের খোলা জানালার পাশে আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিল। চোখের সম্মুখে একটা খবরের কাগজ ধরা ছিল।—বাহির হইতে কেহ আসিয়া হঠাৎ দেখিলে মনে করিত সে বুঝি পড়ায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু যিনি রসিক, চব্বিশ বছর বয়সে একদা ফাগুনের রাতে যিনি নব-বধূর চরণ-ধ্বনির আশায় উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছেন, তিনি নিখিলের মনের অবস্থা বুঝিবেন। চক্ষুই কাগজে নিবদ্ধ, কিন্তু মন?—হায়, চব্বিশ বছরের মন!

অধিকন্তু, বধূটি নিখিলের সম্পূর্ণ অপরিচিতা নয়; চোখে-চোখে হাসিতে হাসিতে একটু আলাপ বহুপূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। তিন বছর আগে নিখিলের ছোট বোনের বিবাহের রাত্রে সে প্রথম ললিতাকে দেখিয়াছিল, সেই অবধি—

যে জিনিস তিন বছর ধরিয়া অহরহ কামনা করা যায়, পরিপূর্ণ প্রাপ্তির শুভলগ্ন যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, মুহূর্তগুলি ততই যেন অসহ্য বলিয়া মনে হয়। নিখিল কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া জানালার বাহিরে তাকাইল; দখিনা বাতাস ক্রমেই যেন উন্মদ হইয়া উঠিতেছে, আর যেন শান্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। একটা পাপিয়ার কণ্ঠ পর্দায় পর্দায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া রঙীন আতসবাজির মত ভাঙিয়া ঝরিয়া পড়িল। পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!

বারোটা বাজিল। দ্বারের বাহিরে ফিস্‌ফিস্ গলার আওয়াজ ও চুড়ি-চাবির

মৃদু শব্দ কানে যাইতেই নিখিল সচকিত ভাবে চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদ-পত্রে নিবদ্ধ করিল।

বড় বৌদিদি বধূর হাত ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন—'এই নাও ভাই তোমার জিনিস।'

নিখিল কাগজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বৌদিদি বয়সে তাহার জ্যেষ্ঠা; চিরদিনই নিখিল তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম করিয়া চলে। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বড় বৌদিদি হাসিয়া বধূর হাতটি নিখিলের হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিলেন,—'নাও। এবার আমি চললুম।—একটু সাবধানে কথাবার্তা কোয়ো কিন্তু। সবাই আড়ি পাতবার জন্যে ওৎ পেতে আছে।' বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে অনেকগুলি চাপা গলার ফিস্‌ফিস্ ও তর্জন শুনা গেল—'কেন তুমি বলে দিলে—' বৌদিদি বলিলেন,—'নে, আর ওদের জ্বালাতন করিস্ নি। অনেক রাত হয়ে গেছে; এখন যে-যার নিজের ঘরে গিয়ে ফুলশয্যে করগে যা।'

নিখিলের একটু দুর্ভাবনা হইল। বাড়িতে গুটি-চারেক নবীনা বৌদিদি আছেন, তাঁহারা রেয়াৎ করিবেন না; দুটি কনিষ্ঠা ভগিনী—না, তাহারাও আজ কোনো বাধা মানিবে না। তাছাড়া একটি পঁয়তাল্লিশ বছরের শিশু ভগিনীপতি আছেন, তিনি তো আগে হইতেই শাসাইয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু বধূর হাতটি নিখিলের মুঠির মধ্যে। ললিতা কম্প্রবক্ষে সন্নতনয়নে দাঁড়াইয়া আছে,—মাথার অনভ্যস্ত ঘোমটা খসিয়া পড়িতেছে। কপালে, ঠোঁটের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাহার টানাটানা চোখে কে সরু করিয়া কাজল পরাইয়া দিয়াছে। অপূর্ব হর্ষাবেশে নিখিলের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। এই নারীটি তাহার! সে ললিতার হাতে একটু টান দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—'ললিতা!'

ললিতার চোখ দুটি একবার স্বামীর মুখের পানে উঠিয়াই আবার নামিয়া পড়িল; ঠোঁট দুটি একটু নড়িল,—'আলো নিবিয়ে দাও।'

বধূর হাত ছাড়িয়া নিখিল উজ্জ্বল আলোটা নিবাইয়া লাল আলো জ্বালিয়া দিল। ঘরটি স্বপ্নময় হইয়া উঠিল। জানালা-পথে দখিনা বাতাস তখন আরো অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বধূর কাছে ফিরিয়া আসিতেই বধূ একটু হাসিয়া খাটের নিচে আঙুল

দেখাইয়া দিল। নিখিল প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া খাটের নিচে উঁকি মারিল। খাটের নিচে বধূর দুটা বড় বড় তোরঙ্গ ছিল, তাহাদের মাঝখানে একটি বড় পুঁটুলির মত বস্তু দেখিতে পাইল। টিপ করিয়া নিখিল পুঁটুলির গোলাকার স্থানটিতে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া ভগিনীপতি বাহির হইয়া আসিলেন। 'উঃ, শালা বোম্বাই চড় জমিয়েছে রে!' বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে দরজা খুলিয়া পলায়ন করিলেন।

ললিতা হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখে আঁচল দিল।

জামাইবাবুকে ঘরের বাহিরে খেদাইয়া দিয়া, দ্বারে খিল দিয়া নিখিল ঘরটা ভাল করিয়া তদারক করিল। ওয়ার্ডরোবের দরজা হঠাৎ খুলিয়া দেখিল ভিতরে কেহ আছে কিনা। আর কাহাকেও না পাইয়া সে নিশ্চিত হইয়া বলিল—'আর কেউ নেই।'

ললিতার হাত ধরিয়া শয্যার পাশে লইয়া গিয়া বসাইল। ললিতার পা চলে চলে চলে না। ঐ পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যাটি চিরজন্মের জন্য তাহার—আর এই লোকটি—জীবনে মরণে সেও তাহার। তবু পা চলে না—পায়ে পায়ে জড়াইয়া যায়। হায় ষোল বছরের যৌবন! হায় প্রথম-প্রণয়-ভীতি!

বধূর পাশে বসিয়া নিখিল চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল,—'শুভদৃষ্টির সময় অমন মুখ টিপে হেসেছিলে কেন বল তো?'

বাহিরের অশান্ত দখিনা বাতাসটা আর শাসন মানিল না—হু হু করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মশারি উড়াইয়া, আল্‌নার কাপড়-চোপড় ছত্রাকার করিয়া, বধূর বসনাঞ্চল এলোমেলো করিয়া খবরের কাগজের কয়েকটা পাতা সঙ্গে লইয়া আকস্মিক দুরন্ত বিপ্লবের মত উত্তরের জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল!—বসন্তের মাতাল বাতাস—নাহি লজ্জা নাহি ত্রাস—আকাশে ছড়ায় অট্টহাস—

পাগলা বাতাসটা চলিয়া গেল—গোলাপী ছায়াময় ঘরটি আবার নিস্তব্ধ হইল। আলোটা দোল্‌নার মত দুলিতে রহিল।

হাওয়ার এই বিঘ্নকারী উৎপাতে নিখিল মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। বধূকে জিজ্ঞাসা করিল,—'দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ করে দেব নাকি?'

ললিতা মাথা নাড়িল,—'না, থাক।'

নিখিল তখন ললিতার পাশে আরো একটু সরিয়া বসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—'ললিতা!'

ললিতা তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—'ছাড়ো।'

নিখিল ডান হাতে তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—'না, ছাড়বো না।'

এই সময় খুব নিকট হইতে ভারী গলায় কে বলিয়া উঠিল, 'খবরদার।'

চমকিয়া নিখিল ললিতাকে ছাড়িয়া দিল, ললিতাও জড়সড় হইয়া সরিয়া বসিল।

নিখিল আবার ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিল, খাটের তলাটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল—কিন্তু কেহ কোথাও নাই। তবে কে কথা কহিল? গলাটা ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিয়াছে—এ জামাইবাবু না হইয়া যায় না। কিম্বা হয়ত সেজ বৌদিদি—তিনি পরের গলা চমৎকার নকল করিতে পারেন। কিন্তু যিনিই হোন্—কোথায় তিনি? দুই জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—কিন্তু সেখানে কাহাকেও চোখে পড়িল না। দরজায় কান পাতিয়া শুনিল—কাহারো সাড়া-শব্দ নাই। ব্যর্থ হইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া ললিতার পাশে বসিল।

ঠং করিয়া সাড়ে বারোটা বাজিল।

নিখিল বলিল,—'বোধ হয় শোনবার ভুল—কিন্তু ঠিক মনে হল, কে যেন বললে—খবরদার। তুমি শুনেছিলে?'

ললিতা বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সেও 'খবরদার' শুনিয়াছিল—লজ্জায় লাল হইয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয় কেহ দেখিয়া ফেলিয়াছে।

নিখিল আবার তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল, বলিল,—'ও কিছু নয়।'

ললিতা তাহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া বসিয়া চাপা উৎকণ্ঠার স্বরে বলিল,—'না না, এক্ষুনি কে দেখতে পাবে।'

নিখিল উঠিয়া গিয়া উত্তরের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল—সে দিকে ছাদ, সুতরাং আড়ি পাতিবার সুবিধা বেশি। দক্ষিণ দিক ফাঁকা—সেদিক হইতে কোনো ভয় নাই—তাই সে জানালাটা খোলাই রহিল।

'এবার আর কোনো ভয় নেই' বলিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিখিল ললিতার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার একটি হাত তুলিয়া লইয়া আঙুলের ডগায় একটা চুম্বন করিল। ললিতা হাত কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু

পারিল না। নিখিল হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল,—'দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী মেয়েটির মত একটি—' বলিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল। ললিতার তপ্তনিশ্বাস তাহার অধরে লাগিল।

ঠিক এই সময় তেম্নি ভারী গলায়—'এই! ও কি হচ্চে?'

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া নিখিল চারিদিকে চাহিল। শব্দটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে তাহা উৎকর্ণ হইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু আর কোন শব্দ শুনা গেল না। নিখিলের মনে হইল শব্দটা যেন ঘরের ভিতর হইতেই আসিতেছে—অথচ ঘরের ভিতর কেহ নাই, সে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছে।

নিখিলের বড় রাগ হইল। বার বার বাধা! কথা যে-ই বলুক, সে নিশ্চয় তাহাদের কার্যকলাপ দেখিতে পাইতেছে—নচেৎ ঠিক ঐ সময়েই—

একটি মলক্কা বেতের লাঠি হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া নিখিল সন্তর্পণে দ্বার খুলিল—ইচ্ছাটা, সম্মুখে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই এক ঘা বসাইয়া দিবে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! সেখানে কেহই নাই। তবু নিখিল বাহির হইল—কে বজ্জাতি করিতেছে তাহাকে ধরিতেই হইবে; রসিক লোকটিকে আজ ভাল করিয়া জব্দ করা চাই।

পনের মিনিট বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া নিখিল হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। বাড়ি নিশুতি—ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ। চাকর দাসীরা পর্যন্ত সমস্ত-দিনের ক্লান্তির পর যে যেখানে পাইয়াছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৌদিদি প্রভৃতিরা বোধ করি প্রথমে খানিকক্ষণ নিখিলের ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া শেষে প্রবলতর আকর্ষণে স্ব স্ব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।

লাঠিটি ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়া নিখিল বলিল,—'নাঃ, কাউকে দেখতে পেলুম না, সবাই ঘুমিয়েছে।' সে আশ্চর্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল—কি এ! ভৌতিক ব্যাপার? ভেন্টিলোকুইজ্‌ম্?

ঘড়িতে একটা বাজিল।

তখন নিখিল আবার ললিতার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিল। তারপর, কি ভাবিয়া উঠিয়া গিয়া দক্ষিণের জানালাটাও বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ললিতা মৃদুকণ্ঠে বলিল,—'শুয়ে পড়লে হত না?'

নিখিল কিন্তু এখনি ঘুমাইতে রাজি নয়। বধূর সহিত নব পরিচয়ের রাত্রে, যখন সবেমাত্র পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে—তখন ঘুম!

নিখিল ললিতার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—'এখনি ঘুমুবে? আচ্ছা, আগে একটা চুমু দাও, তারপর বিছানায় শুয়ে গল্প করব।'

'আলো নিবিয়ে দাও।'

'না—আলো থাক। ললিতা—' বলিয়া ঠোঁটের কাছে ঠোঁট লইয়া গেল।

পুনরায় সেই গম্ভীর স্বর—'দাঁড়াও তো মজা দেখাচ্ছি।'

এবার নিখিলের মনটা সতর্ক ছিল। সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, তারপর উঠিয়া গিয়া সুইচ টিপিল।

বড় আলোর আকস্মিক তীব্র দীপ্তিতে ঘর ভরিয়া যাইতেই কার্নিসের উপর হইতে শব্দ হইল,—'রাধে কৃষ্ণ! রাধে কৃষ্ণ!'

কার্নিসের দিকে তাকাইয়া নিখিল হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ললিতাও সেদিকে একবার তাকাইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

একটা পাহাড়ী ময়না কার্নিসের উপর বসিয়া আছে এবং গম্ভীরভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিতেছে।

নিখিল হাসিতে হাসিতে গিয়া ললিতাকে বিছানা হইতে ধরিয়া তুলিল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বধূকে শক্ত করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পাখীটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল,—'হতভাগা পাখী! বোধ হয় সেই ঝড়ের সময় কারুর খাঁচা থেকে পালিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। দাঁড়াও ওকে শায়েস্তা করছি।'

এক ঘর আলো—তাহার মাঝখানে স্বামীর একি কাণ্ড! ললিতা তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল,—'ও কি করছ! ছেড়ে দাও—আলো নিবিয়ে দাও।'

নিখিল বলিল,—'না—ও বেটা পাখীকে আমি আজ দেখিয়ে দেব যে ওকে আমি গ্রাহ্য করি না। এ যে আমার নিজের স্ত্রী তা বেটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।' বলিয়া ললিতার ঠোঁটে চোখে কপালে চার পাঁচটা চুম্বন করিল। ললিতাও বিবশা হইয়া স্বামীর বুকের উপর চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

পাখীটা বলিল—'খবরদার! ও কি হচ্ছে! দাঁড়াও তো—'

নিখিল ললিতার নরম গলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অর্ধরুদ্ধ স্বরে বলিল,—'ললিতা, এবার তুমি একটা।'

ললিতার অবশ অঙ্গে একটু সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে বলিল,—'আলো নিবিয়ে দাও। ছুটোই।'

নিখিল বলিল,—'কিন্তু পাখীটা যে দেখতে পাবে না!'

'তা হোক।'

তখন যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেখান হইতে হাত বাড়াইয়াই নিখিল সুইচ টিপিয়া দিল। ঘর একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল।

'ললিতা!'

'কি?'

'আলো নিবিয়ে দিয়েছি।'

মিনিটখানেক পরে একটি ভারি মিষ্টি ছোট্ট শব্দ হইল।

পাখীটা অন্ধকারে তাহা শুনিতে পাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—'রাধেকৃষ্ণ!'

জটিল ব্যাপার

একটা জটা জুটিয়াছিল।

পরচুলার ব্যবসা করি না; সখের থিয়েটার করাও অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছি। তাই, আচম্বিতে যখন একটি পিঙ্গলবর্ণ জটার স্বত্বাধিকারী হইয়া পড়িলাম তখন ভাবনা হইল, এ অমূল্য নিধি লইয়া কি করিব।

কিন্তু কি করিয়া জটা লাভ করিলাম সে বিবরণ পাঠকের গোচর করা প্রয়োজন; নহিলে বলা-কহা নাই হঠাৎ জটা বাহির করিয়া বসিলে পাঠক স্বভাবতই আমাকে বাজীকর বলিয়া সন্দেহ করিবেন। এরূপ সন্দেহভাজন হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে উক্ত জটা মাথায় পরিয়া বিবাগী হইয়া যাওয়াও ভাল।

রবিবার প্রাতঃকালে বহির্দ্বারের সম্মুখে মোড়ায় বসিয়া রোদ পোহাইতেছিলাম। সাঁওতাল পরগনার মিঠে-কড়া ফাল্গুনী রৌদ্র মন্দ লাগিতেছিল না—এমন সময় এক গ্যাঁটা-গোঁটা সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—'বম্ মহাদেও। ভিখ্ লাও।'

বাবাজীর নাভি পর্য্যন্ত সর্পাকৃতি জটা দুলিতেছে, মুখ বিভূতিভূষিত। তবু ভক্তি হইল না, কহিলাম, 'কিছু হবে না।'

বাবাজী ঘৃণিত নেত্রে কহিলেন,—'কেঁও! তু ম্লেচ্ছ্ হ্যায়? সাধু-সন্ত নহি মান্‌তা?'

বাবাজীর বচন শুনিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, বলিলাম, 'নহি মান্‌তা।'

সাধুবাবা অট্টহাস্যে পাড়া সচকিত করিয়া বলিলেন, 'তু বাংগালী হ্যয়—বাংগালীলোগ ভ্রষ্ট্ হোতা হ্যায়!'

আর সহ্য হইল না; উঠিয়া সাধুবাবার জটা ধরিয়া মারিলাম এক টান।

কিছুক্ষণ দু-জনেই নির্বাক। তার পর বাবাজী জটাটি আমার হস্তে রাখিয়া মুণ্ডিত শীর্ষ লইয়া দ্রুত পলায়ন করিলেন। রাস্তায় কয়েক জন লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিল, বাবাজী কিন্তু কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না।

একজন পথচারী সংবাদ দিয়া গেল,—লোকটা দাগী চোর, সম্প্রতি জেল হইতে বাহির হইয়া ভেক লইয়াছে। সে যা হোক, কিন্তু এখন এই জটা লইয়া কি করিব? সংবাদদাতাকে সেটি উপহার দিতে চাহিলাম, সে লইতে সম্মত হইল না।

হঠাৎ একটা প্ল্যান মাথায় খেলিয়া গেল—গৃহিণীকে ভয় দেখাইতে হইবে।

বাহিরে প্রকাশ না করিলেও আধুনিকা বলিয়া প্রমীলার মনে বেশ একটু গর্ব আছে। গত তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে কখনও তাহাকে সেকেলে বলিবার সুযোগ পাই নাই। নিজেকে সে পুরুষের সমকক্ষ মনে করে, তাই তাহার লজ্জার বাড়াবাড়ি নাই; কোনও অবস্থাতেই লজ্জা বা ভয় পাওয়াকে সে নারীসুলভ লজ্জার ব্যতিক্রম মনে করে।

তার এই অসঙ্কোচ আত্মস্তরিতা মাঝে মাঝে আমার পৌরুষকে পীড়া দিয়াছে, একটা অস্পষ্ট সংশয় কদাচিৎ মনের কোণে উঁকি মারিয়াছে—

ভাবিলাম, আজ পরীক্ষা হোক প্রমীলার মনের ভাব কতটা খাঁটি, কতটা আত্মপ্রতারণা।

জটা লুকাইয়া রাখিয়া বাড়ির ভিতরটা একবার ঘুরিয়া আসিলাম। প্রমীলা বাড়ির পশ্চাদ্দিকের ঘরে বসিয়া আছে। তাহার হাতে একখানা চিঠি। নিশ্চয় জটা-ঘটিত গণ্ডগোল শুনিতে পায় নাই।

আমাকে দেখিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। মুখখানা গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু চাই?'

বলিলাম, 'না। কার চিঠি?'

'বাবার।'

'বাড়ির সব ভাল ?'

প্রমীলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। আমি ঘরময় একবার ঘুরিয়া বেড়াইয়া বলিলাম, 'আজ বিকেলে আমায় জংশনে যেতে হবে। রাত্রি এগারোটার গাড়িতে ফিরব।'

'বেশ।'

'রাত্রে একলাটি বাড়িতে থাকবে, ভয় করবে না তো ?'

'ভয় !' ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'আমার ভয় করে না।'

'ভাল।' ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম। হঠাৎ এত গাম্ভীর্য কেন ?

যা হোক, আজ রাত্রেই গাম্ভীর্যের পরীক্ষা হইবে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বন্ধুর গৃহে খানিকটা ছাই লইয়া মুখে মাখিয়া ফেলিলাম; তারপর আলখাল্লা ও জটা পরিধান করিয়া আয়নায় নিজেকে পরিদর্শন করিলাম।

বন্ধু সপ্রশংসভাবে বলিলেন, 'খাসা হয়েছে, কার সাধ্যি ধরে তুমি দাগাবাজ ভণ্ডসন্ন্যাসী নও। এক ছিলিম গাঁজা টেনে নিলে হত না ?'

'না, অভ্যাস নেই—' বলিয়া বাহির হইলাম।

নিজের বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দরজা বন্ধ। পিছনের পাঁচিল ডিঙাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

শয়নঘরে আলো জ্বলিতেছে। দরজার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, প্রমীলা আলোর সম্মুখে ইজি-চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টমনে পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে।

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম, 'হর হর মহাদেও !'

প্রমীলার হাত হইতে শেলাই পড়িয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চমকিত কণ্ঠে বলিল, 'কে ?'

আমি খ্যাক খ্যাক্ করিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'বম্ শঙ্কর ! জয় চামুণ্ডে !'

প্রমীলা বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভয় পাইয়া পলাইবার কোনও চেষ্টা করিল না। তারপর সশব্দে নিশ্বাস টানিয়া বুকের উপর হাত রাখিল। 'সুরেশদা, তুমি এ বেশে কেন ?'

ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলাম। সুরেশদা ! আমি পাকা সন্ন্যাসী, আমাকে সুরেশদা বলে কেন ?

প্রমীলা স্খলিতস্বরে বলিল, 'সুরেশদা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি।

কিন্তু তুমি কেন এলে ?—তোমাকে আমি বলেছিলুম আর আমার কাছে এস না, তবু তুমি এখানে এলে ?'

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সুরেশ প্রমীলার বাপের বাড়ির বন্ধু, বোধ হয় একটু সম্পর্কও আছে। লোকটাকে আমি গোড়া হইতে অপছন্দ করিতাম ; প্রমীলার সঙ্গে বড় বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা যে এত দূর—

ভাঙা গলায় বলিলাম, 'প্রমীলা—আমি—'

প্রমীলা দুই মুঠি শক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'না না, তুমি যাও সুরেশদা, ইহজন্মে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। আগেকার কথা ভুলে যাও। এখন আর আমি তোমার কাছে যেতে পারব না।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'প্রমীলা, এক দিনের জন্যেও কি তুমি আমাকে ভাল—'

'বাসতুম। এখনও বাসি। কিন্তু তুমি যাও সুরেশদা, দোহাই তোমার—এখনই বাড়ির মালিক এসে পড়বে—সর্বনাশ হবে।'

আমি তাহার কাছে ঘেঁষিয়া গেলাম কিন্তু সে সরিয়া গেল না, উত্তেজনা-অধীর স্বরে বলিল, 'যাবে না ? আমার গালে চুণকালি না মাখিয়ে তুমি যাবে না ? তোমার পায়ে পড়ি সুরেশদা, এখনই সে এসে পড়বে। তবু দাঁড়িয়ে রইলে ? আচ্ছা, এবার যাও—' সহসা সে আমার ভস্মলিপ্ত অধরে চুম্বন করিল—'এস !' আমার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি হতভম্বের মত চলিলাম।

খিড়কির দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রমীলা বলিল, 'আর কখনও এমন পাগলামি ক'রো না। যদি থাকতে না পার, চিঠি দিও—ও আমার চিঠি পড়ে না। কিন্তু এমন ভাবে আর কখনও আমার কাছে এস না। মনে রেখ, যত দূরেই থাকি আমি তোমারই, আর কারুর নয়।'

অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মনে হইল সে উচ্ছ্বসিত কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

নিজের খিড়কির দরজা দিয়া চুপি চুপি চোরের মত বাহির হইয়া গেলাম।

* * *

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল।

কিন্তু তবু, চিরদিন অন্ধের মত প্রতারিত হওয়ার চেয়ে এ ভাল।

প্রমীলার চুম্বন আমার অধরে পোড়া ঘায়ের মত জ্বলিতেছিল, তাহার কথাগুলা বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। 'ইহজন্মে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে—' কিরূপ সম্পর্কের ইঙ্গিত এই কথাগুলার মধ্যে রহিয়াছে ? 'বাসতুম—এখনও ভালবাসি'—আমার সঙ্গে তবে এই তিন বৎসর ধরিয়া কেবল অভিনয় চলিয়াছে! 'আমি তোমারই, আর কারুর নয়'—হুঁ, স্বামী শুধু বিলাসের সামগ্রী জোগাইবার যন্ত্র! উঃ! এই নারী! আধুনিকা শিক্ষিতা নারী!

বন্ধুর গৃহে ফিরিলে বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল ? বিদুষী বৌ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কি রকম অভ্যর্থনা করলে ?'

মুখের ছাই ধুইতে ধুইতে বলিলাম, 'ভাল।'

'দাঁতকপাটি লেগেছিল ?'

মনে মনে বলিলাম 'লেগেছিল, আমার।'

স্থির করিলাম, নাটুকে কাণ্ড ছোরাছুরি আমার জন্য নয়। প্রমীলা কতখানি ছলনা করিতে পারে আজ দেখিব ; তারপর তাহার সমস্ত প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিব। ভদ্রলোকে ইহার বেশি আর কি করিতে পারে ? ইহার পরও যদি প্রমীলা তাহার আধুনিক কাল্‌চারের দর্প লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তো পারুক। রোহিণী-গোবিন্দলালের থিয়েটারী অভিনয় করিয়া আমি নিজেকে কলঙ্কিত করিব না।

বাড়ি গিয়া দ্বারের কড়া নাড়িলাম। প্রমীলা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিলাম, তাহার মুখ প্রশান্ত, চোখের দৃষ্টিতে গোপন অপরাধের চিহ্নমাত্র নাই।

সে বলিল, 'এরই মধ্যে স্টেশন থেকে এলে কি করে ? এই তো পাঁচ মিনিট হল ট্রেন এল, আওয়াজ শুনতে পেলুম।'

জুতা জামা খুলিতে খুলিতে বলিলাম, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এলুম—তুমি একলা আছ।' প্রথমটা আমাকেও তো অভিনয় করিতে হইবে!

'কিছু খাবে নাকি ? দুধ মিষ্টি ঢাকা দিয়ে রেখেছি।'

'না—খেয়ে এসেছি।' টেবিলের উপর আলোটা বাড়াইয়া দিয়া চেয়ারে বসিলাম।

'শোবে না ? আলো বাড়িয়ে দিলে যে ?'

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার কণ্ঠস্বরে, মুখের ভঙ্গিমায়, দেহের সঞ্চালনে,

কোন একটা নির্দেশক চিহ্ন খুঁজিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য তাহার অভিনয়, চক্ষের পলকপাতে তাহার মনের কথা ধরা গেল না।—এমনি করিয়াই এত দিন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে! উঃ—

বলিলাম, 'আলো বাড়িয়ে দিলুম তোমার মুখ ভাল করে দেখব বলে।'

সে গ্রীবাভঙ্গী সহকারে হাসিয়া বলিল, 'কেন, আমার মুখ এই প্রথম দেখছ নাকি?'

বলিলাম, 'না। কিন্তু মুখ কি ইচ্ছে করলেই দেখা যায়! আমার মুখ তুমি দেখতে পেয়েছ?'

'পেয়েছি। এত রাত্রে আর হেঁয়ালি করতে হবে না—শুয়ে পড়।—আমি আসছি।'

পাশের ঘরে গিয়া অতি শীঘ্র বেশ পরিবর্তন করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। 'এখনও শোও নি? শীতও করে না বুঝি! আমি বাপু ছেলেমানুষ, আর দাঁড়াতে পারব না।' একটু হাসিল।

তার পর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'ওগো এস, শুয়ে পড়ি।'

এত ঘনিষ্ঠ, এত অন্তরঙ্গ এই কথা কয়টি যে আমার হঠাৎ ধোঁকা লাগিল—আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন নয় তো?

'প্রমীলা!'

শঙ্কিত চক্ষে চাহিয়া সে বলিল, 'কি গা?'

আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, 'না, কিছু নয়। শুয়ে পড়াই যাক, রাত হয়েছে।'

শয়ন করিবার পর কিয়ৎকাল দু-জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। পাশাপাশি শুইয়া দুইজন মানুষের মধ্যে কতখানি লুকোচুরি চলিতে পারে ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

হঠাৎ প্রমীলা বলিল, 'আজ সন্ধ্যের পর কানন বেড়াতে এসেছিল।'

'কানন?'

'হ্যাঁ গো—কানন। যাকে বিয়ের আগে এত ভালবাসতে—এখন মনেই পড়ছে না?'

গম্ভীরভাবে বলিলাম, 'ভালবাসতুম না, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু!'

'ঐ হল। সে দু-তিন দিন হল বাপের বাড়ি এসেছে; আজ এ বাড়িতে এসেছিল। তার সঙ্গে অনেক গল্প হল।'

'কি গল্প হল ?'

'তুমি কবে একবার কালিঝুলি মেখে ভূত সেজে রাত্রে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিলে, সেই গল্প বললে।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম, 'আর কি বললে ?'

'আরও অনেক গল্প। আচ্ছা, রাত দুপুরে সোমত্ত মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলে কেন বল তো ?'

'ভয় দেখাবার জন্যে।'

'আর কোন মতলব ছিল না ?'

মাথায় রাগ চড়িতেছিল। প্রমীলা আমার খুঁত ধরিতে চায় কোন স্পর্ধায় ? অথবা ইহাও ছলনার একটা অঙ্গ ?

গলার স্বরটা একটু উগ্র হইয়া গেল—'না। তবে তুমি অন্য কিছু ভাবতে পার বটে !'

'কেন ?'

আমি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম, 'প্রমীলা !'

'কি ?'

'তোমার সুরেশদা এখন কোথায় ?'

ক্ষীণস্বরে প্রমীলা বলিল, 'সুরেশদা !'

'হ্যাঁ—সুরেশদা—যাকে বিয়ের আগে এত ভালবাসতে—মনে পড়ছে না ?'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া প্রমীলা ধীরে ধীরে বলিল, 'পড়ছে। তাকে বিয়ের আগে ভালবাসতুম, এখনও বাসি।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার মুখের উপর একথা বলিতে বাধিল না ?

দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিলাম, 'তোমার এই সুরেশদা এখন কোথায় আছেন বলতে পার ?'

'পারি। তুমি শুনতে চাও ?'

'বল। তোমার মুখেই শুনি।'

প্রমীলা ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল, 'তিনি স্বর্গে।'

'স্বর্গে !—মানে ?'

প্রমীলা ভারী গলায় বলিল, 'আজ সকালে বাবার চিঠি পেয়েছি, সুরেশদা

মারা গেছেন। তুমি সুরেশদাকে পছন্দ করতে না, তাই তোমাকে বলি নি।' হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, 'সুরেশদা দেবতার মত লোক ছিলেন, আমাকে মা'র-পেটের-বোনের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন।'

মাথাটা পরিষ্কার হইতে একটু সময় লাগিল।

প্রমীলা আমার গায়ে হাত রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'এবার ঘুমোও।' তারপর নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, 'আর কখনও এমন পাগলামি ক'রো না। মনে রেখ আমি তোমারই, আর কারুর নয়—'

গ্রন্থকার

প্রকাশকের জরুরী তাগিদে সেদিন ন'টা পঁচিশের লোকালে কলিকাতা [illegible]। আন্দাজ ছিল, সাড়ে দশটা বাজিতে বাজিতে হাওড়ায় পৌঁছিয়া কলিকাতার কাজ-কর্ম সারিয়া দেড়টার গাড়িতে আবার বাড়ি ফিরিব।

আমাদের স্টেশনে মাত্র আধ মিনিট গাড়ি দাঁড়ায়; তাই দেখিয়া-শুনিয়া একটা নির্জন কামরা খুঁজিয়া লওয়া সম্ভব হইল না, সম্মুখে যে ইণ্টার ক্লাস কাম্‌রাটা পাইলাম তাহাতেই উঠিয়া পড়িতে হইল। গাড়ি তখন আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুইখানি করিয়া সমান্তরাল বেঞ্চি লোহার গরাদ দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহাতে অনেকগুলা লোকাল্ প্যাসেঞ্জার একত্র হইয়া কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি না করে। আমি যে কুঠুরীতে ঢুকিয়াছিলাম তাহাতে গুটি চার-পাঁচ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। দুই পাশের অন্য খাঁচাগুলিতেও দু'চারজন করিয়া লোক ছিলেন। তাঁহাদের চেহারা দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে, ছাড়া পাইলেই তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবেন। যাহোক, সাবধানে একটু কোণ ঘেঁষিয়া বসিলাম।

আমার পাশে বসিয়া একটি প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক একাগ্রভাবে একখানা বই গিলিতেছিলেন। অন্য কোনও দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। বোধ হয় আবেগের প্রাবল্যেই তাঁহার কাঁচা-পাকা দেড়-ইঞ্চি-চওড়া গোঁফ নড়িয়া উঠিতেছিল, কোটরগত চক্ষু জল্‌জল্ করিতেছিল। ভারী চোয়াল চিবানোর

ভঙ্গীতে নাড়িয়া তিনি মাঝে মাঝে গলা দিয়া একপ্রকার শব্দ বাহির করিতে-ছিলেন—গর্‌র্‌ —র্‌—

কী এমন বই যাহা ভদ্রলোককে এত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে? জিরাফের মত গলা উঁচু করিয়া বইখানার নাম পড়িলাম—'নীল রক্ত'। বইখানা পরিচিত—লেখকের নাম প্রদ্যোত রায়। মাস কয়েক পূর্বে বইটি বাহির হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

পাশের খাঁচা হইতে এক ভদ্রলোক গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্যারীদা, অত মন দিয়ে কী পড়ছেন?'

পুস্তকপাঠ-নিরত ব্যক্তিই প্যারীদা। তিনি মুখ তুলিয়া সক্রোধে খ্যাঁক খ্যাঁক করিয়া হাসিলেন, বলিলেন,—'পদা ছোঁড়ার কেলেঙ্কারি দেখছি! কী ল্যাথাই লিখেছেন! মরি মরি! এই বই নিয়ে আবার তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে। বইখানা বিশে লাইব্রেরি থেকে এনেছিল। ভাবলুম, দেখি তো পদা কি লিখেছে। ছেলেবেলা থেকেই ছোঁড়াকে জানি—আমার শ্যালীর সম্পর্কে ভাসুরপো হয়।—তা, যে বিদ্যে ছরকুটেছেন সে আর কহতব্য নয়।'

সকলে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—'নাম কি বইখানার?'

প্যারীদা তাচ্ছিল্য-সূচক গলা-খাঁকারি দিয়া বলিলেন,—'নীল রক্ত। যেমন নাম, তেমনি বই। আরে, তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল; পদা আবার বই-লিখবে! মেনি-মুখো একটা ছোঁড়া, তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে—'

আর একজন বলিলেন,—'নীল রক্ত! বইখানার নাম শুনেছি বটে—সেদিন বোসেদের গুপে বলছিল বইখানা ভাল হয়েছে। গুপে বাংলা বইয়ের খবর-টবর রাখে। তা লেখককে আপনি চেনেন নাকি?'

প্যারীদা বলিলেন,—'বললুম না, আমার শ্যালীর ভাসুরপো।—বাঘ-আঁচড়ায় থাকে, চালচুলো কিছু নেই। রোগা সিড়িঙ্গে হাড়-বের-করা ছোঁড়া, মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নেই, কথা কইতে গেলে তিনবার হোঁচট খায়—সে আবার বই লিখবে! হেসে আর বাঁচিনে!'

গ্রন্থকার শব্দটার মধ্যে কি-একটা সম্মোহন আছে, বিশেষত কেহ যদি বলে আমি অমুক লেখককে চিনি, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, দেখিতে দেখিতে সে সকলের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠে। প্যারীদাও গাড়িসুদ্ধ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গালে একগাল পানদোক্তা পুরিয়া মৃদু-মন্দ রোমন্থন করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—'প্যারী, তুমি তো দেখছি ছোকরার ওপর বেজায় চটে গেছে। গল্পটা কী লিখেছে বল দেখি—আমরাও শুনি।'

প্যারীদা বলিলেন,—'লিখেছে আমার মুণ্ডু আর তার বাপের পিণ্ডি!'

"আহাহা, গল্পটা বলই না ছাই।"

'গল্প না ঘণ্টা—এক বুনিয়াদী জমিদার-বংশের ছেলের কেচ্ছা। আস্বা দেখে হাসি পায়! তোর বাপ তো হল গিয়ে সব্‌পোস্ট-অফিসের পোস্টমাস্টার—তুই জমিদারের ছেলে কখনও চোখে দেখেছিস যে তাদের কেচ্ছা লিখতে গেলি? এ'কেই বলে, পেটে ভাত নেই কপালে সিঁদুর।—আমি যদি ও গল্প লিখতুম তাহলেও বা কথা ছিল। নিজে ছা-পোষা বটে কিন্তু ত্রিশবছর ধরে দু'বেলা জমিদারের বৈঠকখানায় আড্ডা দিচ্ছি—তাদের নাড়ী থেকে হাঁড়ি পর্যন্ত সব খবর রাখি।—বলুন তো মশাই?' বলিয়া প্যারীদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরিলেন।

প্যারীদার কথা শুনিতে শুনিতে কেমন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম, জগৎটাই মায়াময় বোধ হইতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম,—'সে তো ঠিক কথা, কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু নয়—খাঁটি কথা। লেখার অভ্যেস নেই এই যা, নইলে এমন গল্প লিখতে পারতুম যে, পদার বাবাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত।'

পূর্বোক্ত পান-চর্বণ-রত ভদ্রলোক বলিলেন,—'কিন্তু গল্পটাই যে তুমি বলছ না হে!'

প্যারীদা বলিলেন,—'গল্পর কি আর মাথা-মুণ্ডু আছে! যত সব উদ্ভট ব্যাপার। শুনতে চাও তো বলছি।' বলিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আমার একবার সন্দেহ হইল, প্যারীদা গল্পটা সকলকে শুনাইবার জন্যই এতটা তাল ঠুকিতেছিলেন। যাহারা গল্প বলিতে জানে, শ্রোতার মনকে তৈয়ার করিয়া লইতেও তাহারা পটু! দেখিলাম, চলন্ত গাড়ির শব্দের ভিতর হইতে প্যারীদার গল্প শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আছে। প্যারীদার মুখের উপর একটা তৃপ্তির ভাব ক্ষণেকের জন্য খেলিয়া গেল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শেক্সপীয়রের মত এক একজন প্রতিভাবান লোক আছে, যাহারা পরের

গল্প আত্মসাৎ করিয়া তাহার চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। দেখিলাম প্যারীদারও সেই শ্রেণীর প্রতিভা। বইখানা কেমন হইয়াছে তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কিন্তু প্যারীদার বলার ভঙ্গীতে গল্প জমিয়া উঠিল। আমি তাঁহারই কথায় যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে গল্পটাকে উদ্ধৃত করিলাম।—

এক মস্ত জমিদার-বংশ; তিনশ' বছর ধরে চলে আস্‌ছে। তিন লক্ষ টাকা বছরে আয়, সাতমহল বাড়ি, এগারোটা হাতী, বাওয়ান্নটা ঘোড়া; লাঠি সঁড়কি বরকন্দাজ মশাল্‌চি হুঁকাবরদার—চারদিকে গিশ গিশ করছে। মোটের উপর, একটা রাজপাট বললেই হয়।

সেকালে জমিদারেরা ভীষণ দুর্দান্ত ছিল। ডাকাতি, গুমখুন, গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া—এমন কাজ নেই যা তারা করত না। তাদের এক বিধবা মেয়ের নাকি চরিত্র খারাপ হয়েছিল—জমিদার জানতে পেরে নিজের মেয়ে আর তার উপপতিকে ধরে এনে নিজের বৈঠকখানা ঘরের মেঝেয় পুঁতে আবার রাতারাতি মেঝে শান্ বাঁধিয়ে ফেলেছিল। তাদের অত্যাচার আর দাপটের কত কাহিনী যে প্রচলিত ছিল তার শেষ নেই। আশে-পাশের জমিদারেরা তাদের যমের মতন ভয় করত। শোনা যায়, সীমানার এক ঘাটোয়ালের সঙ্গে দখল নিয়ে তকরার হওয়াতে সেই ঘাটোয়ালকে তার বাড়ি থেকে লোপাট করে এনে অমাবস্যার রাত্রে মা কালীর সাম্‌নে বলি দিয়েছিল।

আজকাল অবশ্য সে সব আর নেই—তবে রাজপাট ঠিক বজায় আছে। বর্তমান জমিদারের একমাত্র ছেলে, তার নাম অহীন্দ্র। সেই হল গিয়ে এই গল্পের নায়ক। সে রীতিমত ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে, কলকাতায় প্রকাণ্ড বাসা করে থাকে। সে বড় ভাল ছেলে। বড় শান্ত প্রকৃতি তার—পূর্বপুরুষদের দুর্দান্ত স্বভাব একটুও পায় নি—সাত চড়ে মুখে রা নেই। চেহারাও চমৎকার—লেখাপড়াতেও ধারালো। এক কথায় যাকে বলে হীরের টুক্‌রো ছেলে।

এই ছেলে লেখাপড়া করতে করতে হঠাৎ এক ব্যারিস্টারের মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। সে ব্যারিস্টারের বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করলে। ব্যারিস্টারটির বাইরের ঠাট ঠিক আছে; কিন্তু ভেতরে একেবারে ভুয়ো—আকণ্ঠ দেনা। তাঁর মেয়ে মনীষা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে; সুন্দরী শিক্ষিতা

বটে কিন্তু ডেঁপো চালিয়াৎ নয়—শান্ত ধীর নম্র। সেও মনে মনে অহীন্দ্রকে ভালবেসে ফেললে।

কিন্তু প্রেমের পথ বড়ই কুটিল; এতবড় জমিদারের ছেলেও দেখলে তার প্রিয়তমাকে পাবার পথে দুস্তর বাধা। অর্থাৎ, মনীষার আর একটি উমেদার আছে। উমেদারটি আর কেউ নয়—ব্যারিস্টার সাহেবের পাওনাদার। লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, অবিবাহিত, বিলেত-ফেরৎ এবং টাকার ইঁআণ্ডিল। তার নামে মাঝে মাঝে কিছু কানাঘুষোও শোনা যেত—কিন্তু যার অত টাকা, তার নামে কুৎসা কে গ্রাহ্য করে?

ব্যারিস্টার সাহেবের চরিত্র অতি দুর্বল। তিনি মেয়েকে ভালবাসেন বটে কিন্তু পাওনাদারের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। তাই, ইচ্ছা থাকলেও অহীন্দ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছেন না। অহীন্দ্রও স্পষ্ট করে কোন কথা বলে না, কেবল আসে-যায়, গল্প করে, চা খায়—এই পর্যন্ত। তার মনের ভাব হয়ত কেউ কেউ বুঝতে পারে, কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করে না। এম্‌নি ভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

ছ'মাস পরে একদিন কথায় কথায় অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর মনের ভাব জানতে পারলে। তিনি মনীষাকে বিয়ে করতে চান না—বিয়েতে তাঁর ভারি অরুচি—তাঁর মতলব অন্য রকম। কিন্তু মনীষা ভালমানুষ হলেও ভারি শক্ত মেয়ে, সে ও-সবে রাজি নয়। ব্যারিস্টার সাহেব সবই বোঝেন কিন্তু পাওনাদারকে চটাবার সাহস তাঁর নেই—তিনি কেবল চোখ বুজে থাকেন। কিন্তু তবু পাওনাদার বাবু সুবিধা করে উঠতে পারছেন না।

এই ব্যাপার জানতে পেরেও অহীন্দ্র কোন কথা বললে না, চুপ করে রইল। সে এতই ভালমানুষ যে, পাওনাদার বাবু তার প্রতিদ্বন্দ্বী জেনেও সে কোন দিন তাঁর প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা দেখায় নি। দুজনের মধ্যে বেশ সদ্ভাবই ছিল। পাওনাদার বাবু অহীন্দ্রকে গোবেচারি ভ্যাড়াকান্ত মনে করে ভেতরে ভেতরে একটু কৃপার চক্ষেই দেখতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর অহীন্দ্র ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়িতে এসে দেখলে, মনীষা বাগানে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। অহীন্দ্র নিঃশব্দে বাগান থেকে ফিরে চলে এল।

পরদিন বিকেল বেলা অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করে বললে,—'আপনার সঙ্গে একটা ভারি গোপনীয় কথা আছে—কিছু টাকা ধার

চাই। কাজটা কিন্তু খুব চুপি চুপি সারতে হবে—বাবা না জানতে পারেন।'

বড়লোকের ছেলেদের টাকা ধার দেওয়াই পাওনাদার বাবুর ব্যবসা, তিনি খুশী হয়ে বললেন,—'বেশ তো! আজ রাত্রি দশটার সময় আপনি আমার বাড়িতে যাবেন। কেউ থাকবে না—চাকর-বাকরদেরও সরিয়ে দেব।'

রাত্রি দশটার সময় অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর বাড়িতে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হল; দেখলে, গৃহস্বামী ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই। তখন দু'জনে টাকার কথা আরম্ভ হল।

অহীন্দ্র বিশ হাজার টাকা ধার চায়। কিন্তু সুদের হার নিয়ে একটু কষাকষি চলতে লাগল। অহীন্দ্র বললে সে শতকরা দশ টাকার বেশি সুদ দিতে পারবে না। পাওনাদার বাবু বললেন তিনি শতকরা পনের টাকার কম সুদ নেন না। তার কারণ, যারা তাঁর কাছে ধার নেয় তাদের নাম কখনও জানাজানি হয় না—গোপন থাকে। অহীন্দ্র তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলে। তখন তিনি লোহার আলমারি খুলে অন্যান্য তমস্ুক বার করে দেখালেন যে সকলেই শতকরা পনের টাকা হারে সুদ দিয়েছে।

এই সময় টেব্‌লের ওপর আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। তারপর অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি হল কেউ জানে না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অহীন্দ্র যথারীতি ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ি গিয়ে শুনলে যে, পাওনাদার বাবু হঠাৎ মারা গেছেন। কিসে মারা গেছেন কেউ বলতে পারলে না। তবে তাঁর চরিত্র ভাল ছিল না, তাই অনেকেই অনুমান করলে যে, এর মধ্যে স্ত্রীলোকঘটিত কোন ব্যাপার আছে।

এই ঘটনার সাতদিন পরে ব্যারিস্টার সাহেব বুক্‌-পোস্টে একটা কাগজের তাড়া পেলেন। খুলে দেখলেন, কোন অজ্ঞাত লোক তাঁর তমস্সুকখানি পাঠিয়ে দিয়েছে।

অতঃপর জমিদারের সুবোধ শান্ত ছেলের সঙ্গে ঋণমুক্ত ব্যারিস্টারের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। প্রেমিক প্রেমিকার মিলন হল।

প্যারীদা বলিলেন,—'শুনলে তো গল্প?'

সকলে চুপ করিয়া রহিল। ট্রেন এতক্ষণ প্রত্যেক স্টেশনে থামিতে থামিতে প্রায় গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বেলুড়ে গাড়ি ধরিতেই, একটি

পুরাদস্তুর তরুণ আমাদের কামরায় প্রবেশ করিয়া রুমালে সন্তর্পণে গদি ঝাড়িয়া উপবেশন করিল এবং চওড়া কালো ফিতার প্রান্তে বাঁধা প্যাঁশ-নে চশমার ভিতর দিয়া আমাদের সকলের দিকে একবার অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করিল।

গাড়ি আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

'নীল রক্ত' বইখানা প্যারীদা-র হাতেই ছিল; তরুণ এতক্ষণে সেটার নাম দেখিতে পাইয়া মুরুব্বিয়ানা চালে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'কেমন পড়লেন বইখানা? ওটা আমার লেখা।'

আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া তরুণের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। প্যারীদা কিয়ৎকালের জন্য একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন, তারপর গর্জন করিয়া উঠিলেন,—'তোমার লেখা? কে হে তুমি ছোকরা? এ বই পদার লেখা—আমার শ্যালীর ভাসুরপো পদা।'

তরুণ অবিচলিত ভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল,—'আপনার শ্যালীর ভাসুর থাকতে পারে এবং সেই ভাসুরের পদা নামক ছেলে থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু বইখানা আমার লেখা। আমার নাম—প্রদ্যোত রায়।'

গাড়িসুদ্ধ লোক এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। যাহারা দূরের খাঁচায় ছিল তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়া একদৃষ্টে তরুণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তরুণ বলিল,—'পদা-নামধারী কোন ব্যক্তির বই লেখা সম্ভব নয়।—দেখি বইখানা।' বলিয়া তরুণ হাত বাড়াইল।

প্যারীদা-র মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি এখনি বইখানি জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু লাইব্রেরিকে দেড় টাকা গুনাগার দিতে হইবে এই ভয়েই বোধ হয় তাহা করিলেন না। তরুণ বইখানা লইয়া কয়েক পাতা উল্টাইয়া বলিল,—'শুনুন, মুখস্থ বলছি—১০৯ পৃষ্ঠায় আছে—"সভ্যতা ও ধর্মভয় মানুষের গায়ে ক্ষীণতম পালিশ মাত্র; জীবনের অবিশ্রাম ঘর্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়া ভিতরের প্রকৃত মনুষ্যমূর্তি কখনও কখনও বাহির হইয়া পড়ে। তখন সেই আদিম সভ্যতালেশবর্জিত নখদন্তায়ুধ মনুষ্যমূর্তি দেখিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। বুঝিতে পারি না যে, আমাদের সকলের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর মূর্তি লুক্কায়িত আছে—প্রয়োজন হইলেই সে ছদ্মবেশ ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে। অনেকের জীবনেই সে প্রয়োজন আসে না—কিন্তু যাহার আসে,—"